জনাব আবদুল জলিল তরফদার
শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

ইলিশমারির চর
বাংলার চালচিত্র
মাটির কাছাকাছি
মুখের মেলা
বিদ্রোহী বাসিন্দা
ঝিনুকের নৌকো
রূপের আগুন
মাতালের হাট
বদর বাউল
রাতপাখির ডাক
কনকচূড়া
জনপদজীবন
পল্লীর পদাবলী

একরালে পুথি সাহিত্যের প্রভাব ছিল খুবই। স্বাধীনতার আগে আমরা ছোটবেলায় দেখতাম গাঁয়ের মানুষরা ক্ষেত-খামারের কাজ সেরে সন্ধ্যার পর দলিজে বসে একসঙ্গে অনেকে পুথি পড়া শুনছে। তখন করোমচা বা রেড়ির তেলে প্রদীপ জ্বালা উঠে গিয়ে এসেছে কেরোসিন, হ্যারিকেন—মাটির কালো চুড়ির জায়গায় এসেছে কাঁচের রেশমী চুড়ি—চা খাওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে।

মৌলবী চেহারার কোনো একজন লোক, যে বাংলা পড়তে পারে সে-ই পুথি পড়ত সাপ খেলানো বিশেষ এক সুরে। আর লোকজন বুঁদ হয়ে তা শুনত।

হিন্দুদের মধ্যে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করা হত তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও কাসাসল আম্বিয়া, হাতেমতাই, খয়রল হাসার, ইউসুফ জুলেখা, জইগুন বিবির কেচ্ছা, গোলসানে রুম, সোনাভান ইত্যাদি পুথি পড়া হত। তখনকার বৃহৎ কাহিনীগুলিকে কবিতায় ছন্দবদ্ধ করে প্রকাশ করার রীতি ছিল। মানুষ তা থেকে সাহিত্য পিপাসার অমৃত আহরণ করত। হাতেমতাই অতি বিখ্যাত অলৌকিক কাব্য-কাহিনী। কাসাসল আম্বিয়া অর্থাৎ নবীকাহিনী—এতেও অলৌকিকতার প্রভাব যথেষ্ট, যেমন মহাভারত বা রামায়ণেও আছে।

একরালে মানুষ সাধারণ জীবনের বাইরে বৃহৎ কিছু ঘটার আকাঙ্ক্ষা করত, আধিভৌতিক উপায়ে তা যদি ঘটেও তাতে তাদের আপত্তি ছিল না। দেবতা, বা পয়গম্বর-পীরগণ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনতার পর বিজ্ঞান এবং সাম্যবাদ প্রচারের ফলে আধুনিক শিক্ষিত মানুষরা পুথি সাহিত্যের উদ্ভট আজগুবি কাহিনীকে পরিহাস করতে আরম্ভ করেন। ওহাবী আন্দোলনের পর থেকে সরাসরি কোরআন, হাদিসের দিকে তাকিয়ে উপকথা, কল্পিত কাহিনী বা কাব্যকে বর্জন করার নীতি গ্রহণ করেন মৌলবী মওলানাগণ। এবং দিন দিন দ্রব্যমূল্য ঊর্দ্ধগতি হওয়ার ফলে মানুষ হন্যে হয়ে অর্থ সংগ্রহের জন্যে কল-কারখানায়, অফিসে-আদালতে ছুটতে থাকে। অবসর কোথায় তখন বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুথি পড়ার ?

মহাকাব্য রচনা তো উঠেই গেল—রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন অনেক কিছু রচনা করলেও ঠিক মহাকাব্য যাকে বলে তা লেখেন নি—গোরা উপন্যাসের কাহিনীর সমাপ্তি যদিও চরম চমকপ্রদ মহাকাব্যধর্মী -(ফেরদৌসীর শাহানামায় এরকমটা আছে) বঙ্কিমচন্দ্রও গদ্যভাষায় দুর্গেশনন্দিনীতে কাব্য করেছেন কিন্তু শরৎচন্দ্র থেকে একাল পর্যন্ত যা কিছু কাহিনী লেখা হয়েছে তার সবই প্রায় গদ্যে

—যাকে বলা হয়েছে উপন্যাস। রাজা-বাদশা, উজির-সেনাপতি, জমিদার নায়েব, সৈয়দ-কাজীর কাহিনী ক্রমে নেমে এসেছে মাটির মানুষদের কাছে।

কিন্তু মাটির মানুষদের মধ্যে তেমন জোরালো কাহিনী কই—যে কাহিনী যুগযুগান্ত পার হয়ে যায়—বেঁচে থাকে মানুষের মধ্যে ?

আজো মহাভারতের কাহিনী, আরব্য উপন্যাসের গল্প, ঈসপ্‌স ফেবল্‌স বা পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী অমর হয়ে আছে। ঠাকুরমার ঝুলিও কম মানুষ পড়ে না।

আর আধুনিক্ উপন্যাসের সার্থকতার মধ্যে সাধারণ জীবনের চিত্র যদি বৃহত্তর কোনো ভাবনাকে স্পর্শ করতে না পারে তবে তা বোধহয় ব্যর্থ হতে বাধ্য—এই ব্যর্থতার হতাশায় নাকি পাঠক-সাধারণ এখন বাংলা উপন্যাস পাঠে হতোদ্যম।

'দেশ আলোড়নকারী' প্রতিনিয়ত অনেক উপন্যাস প্রকাশিত হলেও অল্প দিনেই মানুষের স্মৃতি থেকে তা উবে যাচ্ছে। এক ফসল ফলিয়েই নোনা জমির মতো তা পড়ে থাকে। লেখক এবং প্রকাশক দুজনেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ! ··

এই রকম সময়ে হঠাৎ এলো 'জরুরী অবস্থা'। গরিব মেহনতি জনতার চরম দুর্দশার কথা আমি আর যাতে না লিখি সে বিষয়ে সতর্ক করা হল। কিন্তু জীবিকার দায়ে যখন কলম চালাতেই হয় তখন এই জরুরী অবস্থায় জন্ম নিল 'অলৌকিক প্রেমকথা'।

পুথি সাহিত্য বিশেষ করে হাতেমতাই, গোলসানে রুম ইত্যাদি পুথি এককালে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই ধরনের কাহিনীধর্মী গ্রন্থ লিখলে কেমন হয় ? এই ভাবনাকে রূপায়িত করতে গিয়েই জন্ম নিয়েছে অলৌকিক প্রেমকথা।

বাংলা সাহিত্যে অনেক সম্পদ আছে—সাহিত্য হল সাগরের মতো—তাতে হাজার হাজার নৌকো ভাসে—কারো সঙ্গে কারো ধাক্কা লাগার কথা নয়—'অলৌকিক প্রেমকথা' তেমনি একটা নৌকো—তবে ময়ূরপঙ্খী নৌকো—হয়তো তা রুপো দিয়ে বাঁধানো—যাত্রীরা যদি তাতে আনন্দের সঙ্গে পাড়ি জমাতে পারেন সেটাই আমার উপরি পাওনা।

আধুনিক উপন্যাসে কাহিনীর যে অভাব আছে 'অলৌকিক প্রেমকথা'য় তা আমরা দূর করতে চেষ্টা করেছি। আর গদ্যে, পুথি-সাহিত্যের ধরনে, উপন্যাস রচনা করা যায় কিনা তারও প্রয়াস পেয়েছি।

যেহেতু মুসলমান চরিত্র বা পরিবেশ-পরিজন নিয়ে এই উপন্যাস তাই অনেক আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দ এসে গেছে, সাহিত্যের বাস্তবতার বিচারে তা বর্জন করাও যায় না।

অভিযোগ আছে যে বাংলা সাহিত্যে মূলত হিন্দুপ্রভাব বেশি, জনসংখ্যার অনুপাতে উভয় বাংলায় মুসলমানই বেশি, তবে কেন সাহিত্যে মুসলিমচরিত্র এতখানি বর্জন করা হল? একজন হিন্দুর সঙ্গে জীবনে যখন অনেক মুসলমান সংশ্লিষ্ট তখন সাহিত্যে তারা উপেক্ষিত বা অবাঞ্ছিত কেন? তা যদি হয় বাস্তবতার বিচারে তা কি একপেশে নয়?

আদৌ মুসলমানদের নিয়ে লেখা হয়নি এমন কথা বলছি না—তবে যা লেখা হয়েছে সেসব সার্থক হয়েছে খুব কমই। দীনবন্ধু মিত্রের তোরাপ এ প্রসঙ্গে বলা যায় প্রায় নিখুঁত চরিত্র। আর সবে প্রয়োগের গণ্ডগোল প্রচুর। বাঙালী মুসলিম পরিবারের কথাবার্তায় আরবী-উর্দু-ফার্সী শব্দের মিশ্রণ আছে—তাছাড়া প্রয়োগেও বৈচিত্র্য আছে। জনৈক হিন্দু বাঙালী সাহিত্যিক মুসলমানদের নিয়ে অতি চমৎকার একটি উপন্যাস লিখেছেন জেনে আগ্রহভরে যখন তা পড়েছি, দেখেছি তাতে ঘরোয়া চিত্র আছে বেশ কিন্তু ঐ একই দোষ—প্রয়োগের প্রচুর ভুল। সেই ভুল আমাকে শোধন করে দেবার অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু লোম বাছতে বাছতে যদি কম্বল ফাঁকা হয়ে যায় তো সে কাজ করে লাভ কি?

'অলৌকিক প্রেমকথা' 'দৈনিক পয়গাম' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সেজন্য পত্রিকা-সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল তরফদার সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ।

পরিশেষে গ্রন্থখানি পাঠকদের হাতে তুলে দেবার জন্য পূর্ণ প্রকাশনের মালিক শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও প্রুফ রিডার বন্ধুবর শ্রীরঞ্জন বেরার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম।

আবদুল জব্বার

এমন লাল দেবদারু বন কেউ তো কখনো দেখেনি। সরসীর জল একদম সবুজ। সাদা আর কালো রঙের সারস ঘুরে বেড়াচ্ছে হলুদ রঙের শরখাড়ি বনের পাশে। দেবদারু গাছগুলো সমান সমান ব্যবধানে যেন সাজিয়ে গুছিয়ে বসানো। তেল-চকচকে পাতায় রোদ ঝলমল করছে। মাটিতে বালি, কোথাও ঘাস। হাড়ভাঙা গাছের মতো মোচার আকারের লম্বা সাদা সাদা ফুল ঝুলছে একেবারে ঘোর নীলবর্ণের ছোট ছোট পাতাঅলা শিশুগাছের মতো কি একটা গাছে।

যুবরাজ ফরিদ ফুলের সুগন্ধে মোহিত হয়ে গাছের ছায়ায় দাঁড় করালে তাঁর ঘোড়াটাকে। হ্রেষাধ্বনি করল ঘোড়াটা। পাখিরা উড়ে গেল ফরফর করে ডানার শব্দ তুলে।

কথা বলতে লাগল ফরিদ, 'কোথায় এলাম রে রুখ্? পিপাসায় তো প্রাণ যায়! সাগরে এতো পানি কিন্তু এমন লবণাক্ত যে মুখে দেবার উপায় নেই। ক্ষুধায় আমি ক্লান্ত। আর কোথায় যাব! কতদূর যাব! একটা মানুষের দেখা নেই। মানুষ যে মানুষের এত বন্ধু কে জানত! রুখ, তুই তো জানোয়ার, কথা বলতে পারিস না, ক্ষুধা পেলে ঘাস ছিঁড়ে খাবি কিন্তু আমি তো অজানা বুনো ফল বিষাক্ত ভেবে কিছুই খেতে পারছি না।...'

রুখ আবার হ্রেষাধ্বনি করল।

হঠাৎ মোচার মতো সাদা একটা ফুল যেন খসে পড়ল যুবরাজের সামনে। দেখল সে, ফুল নয় সেটা, তোতাপাখি। পাখিটা বলতে লাগল, 'এখানে কেন এলে? এটা সেই দুনিয়া বিখ্যাত দরবেশের মায়াকানন।'

হাসল ফরিদ। পাখিটিকে আদাব জানাল। বলল, 'সত্যি ই

'নাহয় তাই হল। কিন্তু তুমি কে জানতে পারি কি?'

'আমি পীরের দাসী।'

'তার মানে রক্ষিতা।'

'জবান তোমার খসে যাবে।'

'তোমার জিভটা কেটে নিতে পারি জানো।'

'জানি, তুমি কুলাঙ্গার।'

'তবে রে…'মেয়েটির মাথায় তলোয়ারের উল্টোদিকে আঘাত করতে সে চিৎকার করে উঠল। তখন অনেক লোক হৈ হৈ করে মাঠের ওপার থেকে তেড়ে আসছে দেখে ফরিদ ঘোড়ায় উঠে কেটে পড়ে।

পথে পথে ঘুরে ঘুরে এক পল্লীতে আসার পর কয়েকজন ছোকরা তার বন্ধু হয়ে গেল। সোনার মোহর ভাঙিয়ে আনল বাজার থেকে। খেতে দিল। শুতে দিল। তার পর তিনচার দিনের মধ্যেই যখন টাকা ফুরিয়ে গেল তারা চক্রান্ত করে শিকারে নিয়ে গেল। বনের মধ্যে ঢুকে হরিণ আগলাবার নাম করে তারা সবাই ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গেল। কোথায় হরিণ কে জানে! কারো আর সাড়া পেল না! জঙ্গলের পথে ঘোড়া চালিয়ে চালিয়ে ঘুরে বেড়াল। বন্য জন্তুদের ডাকে সে ভয় পেল অন্ধকারে। সারারাত গাছের নিচে অন্ধকারে ঘোড়ার পিঠে বসে থেকেছে তলোয়ার হাতে নিয়ে। কোনোদিন সে আল্লার কাছে পরিত্রাণ চায় নি —সেদিন খুব কেঁদেছে। মায়ের কথা মনে হয়েছে। অভাগী মা তার বাঁদী হয়ে চিরকাল বাদশার হারেমে পড়ে থাকবে। আর তার জীবন যাবে এবার বাঘের হাতে!

হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল ফরিদের; কাছেই কে যেন হাততালি দিল না?

উঠে বসল সে। দেখল, সরসীর জলে সাদা একটা পানশি ভাসিয়ে চলেছে একটি মেয়ে। মাথায় তার লাল রুমাল। গায়ে কালো ছোট্ট কোর্তা। পরনে নীল ঘাগরা। সে তালি বাজিয়ে

ডাকছে। ডাকছে দূর সরসীর বুক থেকে। কিন্তু তালির শব্দটা আসছে কেন এত জোরে?

'এই—ই—ই—ই—কে তুমি? এদিকে এসো—আমাকে নিয়ে যাও।'

মেয়েটা গান গাইতে শুরু করল:

'সোনার সরসী জলে
সোনা রোদ ঝলমলে
কে যাবে এসো পারে...'

আশ্চর্য, মেয়েটির হাতে দাঁড় নেই, পানশিতে পাল নেই, অথচ ইচ্ছা মতো কেমন করে সে তীরের দিকে চলে এলো!

আর ফরিদ দেখল, সেই মেয়েটি, পীরচেঙ্গির হোজরায় যার মাথায় সে আঘাত করেছিল!

মাথাটা গোলমাল হয়ে যায়নি তো তার? মাতাল হয়ে কোথাও পড়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছে না তো সে?

মেয়েটি গান থামিয়ে বলল, 'চিনতে পার আমাকে? আমি পীরচেঙ্গির মেয়ে। বাদশা আমাদের এখানে এই মায়াকানন বানিয়ে দিয়েছেন। আপনি আমার মাথায় মেরেছিলেন কিন্তু আব্বা এসে হাত বুলিয়ে দিতেই সব ব্যথা ভাল হয়ে গেল। আপনার কোথাও ব্যথা থাকলে তাঁকে বলবেন, তিনি সারিয়ে দেবেন।'

'তিনি কোথায়? তাঁকে অপমান করার জন্যই তো আমি রাজবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছি।'

'জানি আমি।'

'তাহলে আমাকে আপনি নিয়ে চলুন তাঁর কাছে, তিনি যদি সত্যই পীর হন তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবেন।'

মেয়েটি ইঙ্গিত করতেই ফরিদ তার পানশিতে উঠে বসল।

সাদা পনিরের পাহাড়ের ভেতরের সুরম্য হর্মতলে আনার পর ফরিদ দেখল সেই মূর্তি—আলকাতরা মাখা, গায়ে তুলো, মাথায় গাধার টুপী কিন্তু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

তিনি বললেন, 'এসো বাবা, আমাকে চিনতে পারছ তো? আমি সেই অধমাধম চেঙ্গি মস্তান।'

'আমাকে আর লজ্জা দেবেন না হুজুর। আমি আপনাকে চিনতে পারি নি।'

হা হা করে হাসলেন পীরচেঙ্গি। সমস্ত হর্মতল কাঁপতে লাগল। এবং আশ্চর্য, হঠাৎ দেখা গেল পীরচেঙ্গির পোষাক পালটে গেছে। তাঁর পীরহান-পরা ভেলভেটের পোষাকে যেন জ্যোৎস্না ঝলমল করছে। আর ফরিদ নিজে একটা বাঁদর তৈরি হয়ে গেছে যখনই পীর-চেঙ্গি তার দিকে হাত তুলে কি যেন মন্ত্র আওড়ালেন।

পীরচেঙ্গি ইঙ্গিত করতে তাঁর মেয়েটি বাঁদররূপী ফরিদকে গলার দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

মন্ত্রবলে আদত একটা মানুষকে কেউ বাঁদর বানিয়ে দিতে পারে? এটাও কি বিশ্বাস্য?

বিশ্বাস্য নয়তো হলাম কি করে? ভাবতে লাগল ফরিদ। গলার দড়িটাতে টান পড়তেই হাত দিয়ে ধরে নেংচাতে নেংচাতে তিন পায়ে হাঁটতে লাগল সে। তারপর ঝুলতে থাকলে পেটে এক গুঁতো মারল পীরচেঙ্গির মেয়ে। বলল, 'চল্‌রে আমার বাঁদর, গোলাম হয়ে থাক চিরকাল। অবিশ্বাসীর এই শাস্তি।'

তারপর সরসীর জলে-ভাসা তরীটির উপরে এসে বসল দরবেশ-কন্যা। ফরিদও বসল গলুইয়ের এক মাথায়। কথা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু ভাষা প্রকাশ পেল না। শুধু কিচির মিচির শব্দ হল।

দরবেশ-কন্যা কাঠের পাটাতনের সঙ্গে লাগানো একটা চাকা ঘুরিয়ে দিতেই পানশিটার তলায় নীল জলের আন্দোলন হতে লাগল। পানশি চলতে লাগল। ফরিদ দেখল মায়াকাননে তার কালো ঘোড়াটি স্থির চোখে দাঁড়িয়ে আছে—তার গলায় তলোয়ার ঝুলছে। ঘোড়াটির জন্য অস্থির হল ফরিদের মন। তৃষ্ণার্ত সে। হ্রেষাধ্বনি করতে লাগল।

পীরজাদী বলল, 'তুমি অনেক কিছু দেখতে পাবে, তোমার স্মৃতি থাকবে, ক্ষুধা-কাম-নিদ্রা সবই তোমার অনুভূতি গোচর হবে। শুধু কথা বলতে পারবে না আর পালাবার চেষ্টা করলে কোনোদিনই মুক্তি পাবে না। আমার নাম নীলোফার—ডাক নাম নীলু। আয়, চলে আয়, আমার পা টিপে দে।'

ফরিদ এই প্রস্তাবে খুশী। কাছে আসতেই গলার দড়ি খুলে দিল

নীলু। দুটো আপেল আর চারটে কলা খেতে দিল। সরসী থেকে একপাত্র জল তুলে ফুঁ দিয়ে দিতেই তা মিষ্টি দুধ হয়ে গেল।

খেয়ে নিয়ে হরদম পা টিপতে লাগল ফরিদ। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নীলোফার রাজকন্যার মতো অর্ধনিমিলিত চোখে ঘুমোতে লাগল। রোদের বাতাবী রঙ ফিকে হয়ে আসছে। কোথায় গেল মায়াকানন কে জানে! এবার সবুজ অরণ্যানী সরসীর দু'দিকে। ক্রমে ক্রমে দিনের আলো নিভে আসছে।

নীলোফার ঘুমিয়ে পড়ল।

ফরিদ আশ্চর্য হয়ে দেখল, জ্যোৎস্নার মতো আলোকিত হচ্ছে যত দিনের আলো নিভে আসছে। পানশির চারদিকে বিচিত্র বাহারের বড় বড় রঙিন মাছ খেলা করছে। অন্ধকারে মাছগুলোর গা থেকে আলো ঝলমল করছে।

ফরিদ ভাবতে লাগল, এই অন্ধকার দরিয়ার কূল-কিনারা কোথায়? এবার তো ঝড় উঠল। প্রচণ্ড ঢেউ হচ্ছে। নৌকো থেকে পড়ে গেলেই ক্ষুদ্র শরীর বাঁদররূপী ফরিদকে মাছগুলোই টুপ করে গিলে নেবে!

নীলোফারের শরীরখানা স্নিগ্ধ নীল আলোর মতো জ্বলছে। ভয়ে ভয়ে তার শরীরের সংলগ্ন হয়ে থাকল সে। হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে দিয়ে ডাকল। কোনো হুঁস নেই নীলোফারের। হঠাৎ খেয়াল হল ফরিদের—নীলোফার চাকার মতো যন্ত্রটা ঘুরিয়েছিল বটে! সেটা সে হাত দিয়ে ঘোরাতে লাগল। তখন নৌকো বনবন করে চর্কির মতো ঘুরতে লাগল। তারপর হঠাৎ সমস্ত নৌকোটাই একটা ডিমের মতো হয়ে গেল। মনে হল সেটা নেমে যাচ্ছে কোনো পাতালপুরীর নিচের দিকে। যখন সেটাতে প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগল আবার যেমন নৌকো ছিল তেমনি হয়ে গেল। নীলোফারের চেতনা ফিরে এলো। ফরিদ দেখল, আর এক জগৎ! সামনে সবুজ মাঠ। দুধের মতো সাদা রাজপ্রাসাদ। অনেকগুলো পরীর মতো মেয়ে হঠাৎ রাজহংসীর মতো কোলাহল তুলে ছুটে

এলো। পরনে তাদের ময়ূরের পালকের মতো বিচিত্রবর্ণ কাপড়। তাদের একজন বলল, 'বাঃ! কি সুন্দর এই বাঁদরটা।' বলেই সে ফরিদকে কোলে তুলে নিল।

ফরিদ আদর পেয়ে মেয়েটির গলা ধরে হরদম চুমো খেতে থাকল তার মুখেতে। সবাই হাসতে লাগল বাঁদরের কীর্তিকলাপ দেখে।

'নামিয়ে দে ওটাকে। ও আসলে মানুষ। দিল্লীর রাজবাড়ির অবিশ্বাসী বাঁদীর পুত্র। অবশ্য বাদশার ঔরসজাত।' বলল নীলোফার, 'আমার মহামান্য পিতাকে অপমান করার জন্য ওকে মন্ত্রবলে বাঁদর করে রাখা হয়েছে।'

'প্রার্থনা করছি, এই বাঁদরটা আমাকে দাও পীরজাদী।' বলল হাসনু।

নীলোফার বলল, 'তুই হলি মিশরের রাজকন্যা। বেদুইন সর্দার তোকে যুদ্ধের সময় লুট করে নিয়ে আসে। মরুদ্যানের তাঁবুতে অত্যাচার করার সময় পরিত্রাণ চেয়ে আল্লার কাছে কাঁদাকাটা করতে আমার বাবা পীরচেঙ্গি তোকে উদ্ধার করে আনেন। তুই যদি সাধারণ মানবজীবনের দুঃখ পেতে চাস তাহলে এই বাঁদরটাকে নিতে পারিস।'

'কি হবে এই সুখ, এই বিলাস, আমি মানব-জীবনের দুঃখ-কষ্ট চাই। পীরচেঙ্গির স্বপ্নসুখের বন্দীত্ব আমি চাই না।'

'তাহলে তুই ওই বাঁদরকে নিয়ে যা তোর ডেরাতে। একচল্লিশ রাত তুই ওর সঙ্গে থাক।' বলল নীলোফার।

'তাহলে পীরজাদী আর একটু উদার হও, ওকে মানুষ করে দেবার মন্ত্র আমাকে দাও।'

নীলোফার বাঁদরকে শুধোলে, 'আর কখনো অবাধ্য হবে না?'

ফরিদ মাথা নেড়ে তার অসম্মতি জানাল। পায়ের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল নীলোফারের।

হাসনুকে তখন নীলোফার একপাত্র জল পড়ে হাতে দিল।

সে তা অতি যত্ন করে নিয়ে চলল প্রসাদের দিকে। ফরিদও চলল তার সঙ্গে সঙ্গে।

নির্জন এক প্রাসাদের মধ্যে এনে মন্ত্রপুতঃ জল ছিটিয়ে দিল বাঁদরের গায়ের ওপরে। আর আশ্চর্য, বাঁদরটা হঠাৎ মানুষ হয়ে গেল! যেমন আগে ছিল ফরিদ। অপরূপ সুন্দর এক রাজকুমার। কিন্তু সম্পূর্ণ নগ্ন!

চোখে হাত চাপা দিলে হাসনু। তার বুকের ওপর থেকে নীলাম্বরীটা টেনে টেনে খুলে নিয়ে নিজের শরীরে জড়াল ফরিদ।

তিন

ফরিদ তার মানবদেহ ফিরে পেয়ে যেমন খুশী হল তেমনি আবার শংকিত হলও। এই হাস্‌নু মেয়েটার সঙ্গে অবাধ প্রেমলীলা করলে পীরচেঙ্গির মেয়ে নীলোফার ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে আবার দুর্দশায় ফেলবে না তো? তাছাড়া একচল্লিশ দিন' অধিকার আছে মাত্র হাসনুর সঙ্গে মেলামেশা করবার। তারপর আবার কি বাঁদর বানিয়ে রাখবে?

এখান থেকে পালানো যায় না? এ কোন্ দেশ?

হাসনু চোখ তুলে তাকাল। কি দীঘল আর মায়াময় চোখ। রক্তিম ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

হাত ধরল তার ফরিদ। হাতখানা দেখল। কি অপূর্ব ত্বক, লাবণ্য যেন ঝরে পড়েছে। হাতখানা সে গালে ঠেকাল। বলল, 'তুমি আমার মুক্তিদাত্রী, ধন্যবাদ তোমাকে কিন্তু এ কোন দেশ, আমরা কোথায় আছি? সেইসব মেয়েগুলোই বা কোথায়?'

হাসনু ফরিদের হাত ধরে অন্য কামরার মধ্যে চলল। যেতে যেতে বলল, 'আমরা বন্দী। আসলে পীরচেঙ্গি একজন পৃথিবীর বিখ্যাত যাদুকর, পীর নন। তাঁর যাদুদণ্ড আছে। যে চামড়ার কিস্তি বা পানশিতে তুমি এসেছ সেটাও যাদুর জিনিস। পীরের ঝোলার ভেতরে অনেক রকমের অদ্ভুত সব জিনিস আছে। সাপের মাথার মানিক আছে। আজব আতস কাঁচ আছে, যা চোখে দিয়ে দেখলে সমস্ত কিছু দেখতে পাবে। সেই কাঁচে দেখা যায় সমস্ত মানুষ নগ্ন, বস্ত্রহীন! যাদুকর পীরচেঙ্গি গোটা পৃথিবী থেকে একচল্লিশটি কুমারী সুন্দরী নারী হরণ করে এনে এই মায়াদ্বীপের মধ্যে রেখেছেন। আল্লার কি অপূর্ব

অভিশম্পাৎ, তিনি নিজে কোনো নারীকে ভোগ করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত। অবশ্য তিনি তাই বলেন। আমাকে এনে তিনি কোলের ওপরে বসিয়ে রেখে শুধুই উত্তেজিত করেছিলেন আর ব্যর্থ পৌরুষে হাপুস নয়নে কেঁদেছিলেন। তাঁর সব ক্ষমতাই আছে শুধু আদি রিপু কামশক্তিটাই যা হারিয়ে গেছে। হয়তো বয়সের জন্য। —অথবা আল্লাই সব ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী—মানুষ তা পায় না।'

গোলাপ বাগানে আনল হাসনু। সেখানেব গাছের পাতা সব নীলবর্ণ। ছোট্ট একটা সাদা কুঠি। হাসনু বলল, 'এটা আমার ঘর। এখানে কেউ আসবে না। এই পালঙ্কের দোলনায়, ফুলের গন্ধে বিভোর হয়ে আমি ঘুমোই। আর দীর্ঘশ্বাস পড়ে বুক ভেঙে।'

ফরিদ পোষাক পরল। নরম দুগ্ধফেননিভ বিছানায় গড়াল। শাহাজাদী হাসনু খাবার নিয়ে এলো। পিরিচগুলোয় অপূর্ব নকশা। ঘিয়ে ভেজানো নরম লুচি। সন্দেশ, হালুয়া। পাত্র ভবা বেদানার রস।

'এসব কোথা থেকে পাও?'

'প্রতিদিন থবে থরে সাজানো থাকে। মাছ, মাংস, ডিম,—এক একদিন এক এক রকম। যাদুকরের পোষা জীন এসব নাকি এনে দেয় পৃথিবীর নানান দেশ থেকে।

'আচ্ছা, পীরচেঙ্গির সঙ্গে দেখা করা যায় না?"

'যায়। কেন?'

'আমি ক্ষমা চাইব। তাঁর শিষ্যত্ব করব, আমি তোমাকে সাদী করতে চাই।' ফরিদ বলতে যাচ্ছিল পীরচেঙ্গির যাদুদণ্ডটি আমার দরকার কিন্তু বলল না। আসলে হাসনু কি বা কে তা সে সঠিক জানে না, মায়াকুমারীও হতে পারে!

দোলনায় বসে মৃদু মৃদু দুলতে দুলতে হাসনু বলতে লাগল, 'আমার জন্য কষ্ট নেই, শুধু বেদুইন যুবক আজিমকে আমার মনে পড়ে। সে কি অপূর্ব দেখতে! বাঁশির মতো নাক, সুন্দর দীর্ঘ চোখ।

মাথায় কালো ঢেউ তোলা চুল। পাকা গমের মতো গায়ের রঙ। আমরা রাজ-পরিবারের লোকরা একবার শিকার করতে যাই মরুভূমি পার হয়ে একটা জঙ্গলের কাছকাছি। সেখানে আমরা কদিন ছিলাম। পাকা খেজুর, রুটি, হরিণের মাংসের কাবাব আর জঙ্গলের মধু খেতাম। একদিন হঠাৎ বাঁশির সুর শুনে মুগ্ধ হলাম। খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম খেজুরকুঞ্জের মধ্যে বসে একটি যুবক বাঁশি বাজাচ্ছে। সে আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাত ধরল এসে। কুর্নিশ করল, দেখাল তাদের কাফেলা। বলল, অনুমতি হলে আমি তোমাকে নিয়ে যাই, শাহাজাদী! আমি বললাম, তুমি কয়েকদিন থাকো। যেদিন আমাদের রাজপরিবার চলে আসবে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সে আমাকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করল। ঘোড়ায় করে তুলে নিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছোটাল। কিন্তু মাত্র দুদিন আগে আমার বাবার কাছে বৃদ্ধ দরবেশ বেশধারী যে লোকটি এসেছিলেন, তিনি হঠাৎ পথরোধ করলেন। তাঁকে তলোয়ার মারতেই তিনি হা হা করে হাসতে লাগলেন। হঠাৎ হঠাৎ মূর্তি পালটাতে লাগলেন। এখনি বামন। বিরাট চৈতন। আবার রাক্ষস। আর আমি ধুলোর ঝড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। হঠাৎ আবার দরবেশ নিজমূর্তি ধারণ করে অপূর্ব শান্ত গলায় বললেন, 'বাছা আজিম, তুমি ঘোড়ায় চড়ে দেশে ফিরে যাও। আমি এই শাহজাদীকে এর বাবার কাছে পৌঁছে দিই।' বলেই তিনি আমাকে নিয়ে পক্ষীরাজে চড়ে মহাশূন্যে ভাসলেন। কত নদনদী, পাহাড়-পর্বত, মেঘ নিচে ফেলে তিনি আমাকে এই মায়াদ্বীপের অট্টালিকার মধ্যে এনে রাখলেন। আজিম কোথায় গেল কে জানে!'

'শালা, আজব ব্যাপার! কোথায় দিল্লীর দরবার আর কোথায় আমি ভাল এক পাল্লায় পড়লাম। যাকগে, তুমিও আসলে মায়াবিনী কিনা আল্লা জানে! এই বেটা যাদুকরের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও।'

'সে চল্লিশ দিনের দিন হবে। একচল্লিশ দিন পরে তোমাকে পীরজাদী নিয়ে যাবে।'

'আবার বাঁদর বানাবে!'

হাসন্নু সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'কিন্তু তুমি ঠকবে। আমার চাইতেও সুন্দরী মেয়ে আছে। গ্রীক ইতালীয়, ইংরেজ, চীনা, কাশ্মীরী, রুশ কত জাতের কত রকম সুন্দরী মেয়ে আছে! বিয়ে করলে পরে মনে হবে, আহা, এই মেয়েটাকে পেলে ভাল হত। তার চাইতে প্রতিদিন এক একজনের কাছে থাকো আর যাকে তোমার সব চাইতে পছন্দ হবে তাকেই বিয়ে করো। কল্‌মা পড়ে বিয়ে করা তো সহজ ব্যাপার নয়। যেই তুমি বিয়ে করতে চাইবে অমনি পীরজাদীর হুকুমে বামন বেশধারী পা পর্যন্ত দাড়িঅলা আলখাল্লা-পরা মোল্লা এসে আরবী পড়তে থাকবে। আর বিয়ে হওয়া মাত্র আমার গায়ের রঙ সব কালো হয়ে যাবে।'

'কেন, কেন, কালো হবে কেন? এর আগে কি এমন কখনো হয়েছে?'

হাসল হাসন্নু। বলল, 'তার চাইতে থাকো তুমি সারারাত আমার কাছে। সারাদিন তুমি ঐ শ্বেত পাথরের পাহাড়ের শীতল গুহার ভেতরে প্রার্থনা করবে—তাহলে মুক্তি না হলেও বাঁদর হওয়া থেকে অব্যাহতি পাবে!'

'বিয়ে হলে কালো হবে কেন তাই বলো না তুমি!'

'বিয়ে হলে, শরীরের ক্ষয় হলেই লাবণ্য নষ্ট হয়। তার প্রতীক এটা অথবা পীরচেঙ্গির ঈর্ষাকাতর মনের অভিশম্পাৎ।'

ফরিদ আর হাসন্নু সারারাত একসঙ্গে এক বিছানায় রইল। যৌবনলীলার রঙ্গরসে তারা ডুবল ভাসল হরদম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ফরিদ দেখল যতবার সে হাসন্নুর সঙ্গে রমণলীলা করে ততবারই সে ক্রমাগত কালো হয়ে যাচ্ছে।

ভোরবেলায় দেখল, হাস্নু বিছানায় পড়ে আছে অচেতন অবস্থায়। কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে তার দেহ। ফরিদ ভয় পেল। আর তাকে জাগাল না। ধীরে ধীরে সে হাসনুর কুঠি ছেড়ে প্রাসাদের দিকে এলো। দেখল, ঘরে ঘরে সব নানান ধরণের মেয়ে—প্রত্যেকেই অঘোর নিদ্রায় অচেতন।

ফরিদ গোসল করল। ওজু করল। পোষাক পরল। তারপর একজনের ঘর থেকে তপ্ত খানা খেয়ে নিয়ে শ্বেত পাথরের পাহাড়ের গুহায় এসে প্রার্থনা করতে বসল। সারাদিন প্রার্থনার পর সন্ধ্যায় ফিরে এসে হাসনুর ঘরে ঢুকে দেখল হাসনুর গায়ে মাছি ভন ভন করছে। সে বোধহয় মৃত অথবা অজ্ঞান।

তখন ত্যাগ করল সে হাসনুর কক্ষ। আল্লার কাছে প্রার্থনা করল হাসনুর ভালর জন্য। তারপর সে গেল গ্রীক রমণীর ঘরে। সে তাকে সমাদর করে নিজের শয্যার 'পরে বসাল।

॥ চার ॥

গ্রীক মেয়েটির নাম বলল, এলিজা। মেয়েটির মাথার চুল সোনালী। নীল চোখ। গায়ের লোম স্বর্ণাভ।

এলিজা আদর করে কাছে বসাল। বলল, 'বন্ধু, তুমি কেন এখানে এলে—এটা যাদু-নগরী। আমরা অভিশপ্ত রমণী। রমণলীলা করলেই আমাদের দেহ কালিবর্ণ হয়ে যায়। মরার মতো পড়ে থাকি —গায়ে-মুখে মাছি ভন ভন করে।'

'তারপর তোমাদের মুক্তি হয় কেমন করে?'

'পীরজাদী বা যাদুকর পীরচেঙ্গি এসে মন্ত্র পড়ে যাদুদণ্ড ঠেকিয়ে আমাদের নতুন চেহারা, নব লাবণ্য ফিরিয়ে আনে। পীরজাদী আমাদের পিঠে তিনটে করে লাথি মেরে যায়।'

'আর আমার দশা কি হবে?'

'সেটা তো আমার বলার অধিকার নেই।' তখম ফরিদ তার কোলের ওপরে আদর করে টেনে শোয়াল এলিজাকে। তাকে চুম্বন করতে করতে বিহ্বল করে ফেলল। এলিজা খুব উত্তেজিত হল। তার শরীর উত্তপ্ত হল। কামনায় অধীর হয়ে পড়ল সে। যৌবনের পসরা মেলে আহ্বান করতে লাগল ফরিদকে।

ফরিদ বলল, 'তুমি তো জানো, এর পরিণতি খারাপ।'

'জানি!'

'তবুও?'

'হ্যাঁ। পারিনা সহ্য করতে। কি আছে আমাদের? আমরা সংসার পাবো না—স্বামী পাবো না। রাজবাড়ির এক কুমারী মেয়ের গর্ভে আমি জারজ সন্তান রূপে জন্মালে তুলোর প্যাডের মধ্যে পুরে নিয়ে আমাকে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়। ভাসতে ভাসতে

এসে আমি একটা গীর্জার বাগানের কোলে ঠেকি। একজন পাদ্রী আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেন। পাদ্রী জন বড় দয়ালু চরিত্রের লোক ছিলেন। আর্তের সেবা করতেন তিনি। একবার এক গলিত কুষ্ঠ রোগীর সেবা করার পর তাঁর শরীরে ঐ কঠিন রোগ সংক্রামিত হল। তাঁর দুরবস্থা দেখে আমি খুব কাঁদতাম। অন্য পাদ্রীরা এসে তাঁকে দেখে যেতেন। এক যুবক পাদ্রী আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সে নিজে হঠাৎ জানতে পারল আমাকে পাবার বাসনা তার মধ্যে জন্মেছে। সে রোজ আসত। বাগানের নিভৃতে সে আমাকে নিয়ে আসত হাত ধরে। ধর্মের কথা আর মজার মজার গল্প বলত। সে বলত, যদি শুদ্ধআত্মা হতে পার তাহলে জীবজন্তু পশুপ্রাণীদের ভাষাও তুমি বুঝতে পারবে। নাম তার এডমণ্ড। সে আমাকে একদিন এক পর্বত-গুহার মধ্যে বিচিত্র সব পাথর দেখাতে আনল। আর তার ধর্মীয় দীক্ষা ভুলে আমার সঙ্গে রমণলীলা করে ফেলল। এরপর দুজনেই আমরা গোপন প্রেমে লিপ্ত হতাম। পাদ্রীবাবা জনকে আমি আর তেমন দেখতাম না। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকতেন আর প্রভু যীশুর কাছে অঝোর নয়নে কান্নাকাটি করতেন। আমরা একদিন তাঁকে বললাম যে আমাদের অনুমতি দিলে সংসার-জীবন আরম্ভ করি। আর সমস্ত গোপন প্রেমের কথা আমরা তাঁকে অকপটে বললাম। তখন তিনি হাসলেন। বললেন মৃদুকণ্ঠে, 'বৎস, তোমার জন্মলগ্নের জন্য তুমি কামনা-বাসনায় এমন রিপু-পরায়ণা। তুমি জারজ সন্তান, অবশ্য তার জন্য তুমি দোষী নও। যা হোক, প্রভুর ইচ্ছায় তোমরা সুখী হও।' কিন্তু আমি জারজ সন্তান জানার পর আর এডমণ্ড বিয়ে করতে চাইল না। তার প্রেম আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলল। তাকে বললাম, যখন তোমার জন্য আমি পাগল তখন জন্ম-কুণ্ডলি পড়ে রক্ষণশীল গোঁড়াদের মতো তুমি নাক সিটকে থাকতে পার কেমন করে? আমার এই মদালস যৌবন কি তোমায় কোনোদিন তৃপ্তি দিতে পারে নি?'

সে বলল, 'সংসার যদি পাততেই হয় তবে সে সংসারে শান্তি চাই, তুমি জারজ বলে স্বভাবত মন্দ-রিপুর হতে বাধ্য এবং কুমারী বেলায় সতীত্ব দান করার জন্য চিরকাল আকাঙ্খাপরায়ণা হবে। অন্য পুরুষের আসক্তি তুমি কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না।' তার পায়ে ধরে অনুনয় করেছিলাম, তবু সে শুনল না। আমি শুনেছিলাম সে অন্য একটি মহিলার প্রণয়ে তখন ডুবেছে। সে সেই মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমি ফাদার জনকে দেখবার জন্য পথ থেকে নানান মানুষকে ডেকে আনতাম। কেননা ফাদার বলেছিলেন, 'আমার রোগমুক্তি হবে একজন তাপস ফকিরের হাতে, এরকম আমি স্বপ্নে দেখেছি।' তাই পথের ধারে আমি সারাক্ষণ বসে থাকতাম। একদিন সন্ধ্যায় দেখলাম এক দাড়িঅলা মুসলমান ফকির যাচ্ছেন। তাঁকে ডেকে এনে আহার্য দিলাম। ফাদারকে দেখালাম। ফকির বললেন, 'আমার নাম পীরচেঙ্গি। আমি রোগ ভাল করে দিতে পাবি কিন্তু শর্তসাপেক্ষ।'

'কি শর্ত ?'—পাদ্রীবাবা জানতে চাইলেন। শর্ত হল, 'তোমার এই কন্যারূপী এলিজাকে দান করতে হবে।'

ফাদার চুপ কবে বইলেন।

পীরচেঙ্গি বললেন, 'বেটা ধার্মিক বুড়ো বক! তোমার মনে পাপ ছিল। এই কন্যার নবযৌবন তোমার গোপন লোভের বস্তু হয়েছিল বলেই আল্লা তোমাকে এই কঠিন রোগে ফেলেছেন। এখন কন্যাসহ তুমি রোগমুক্ত হলে, তুমি ধর্মীয় জীবন ত্যাগ করে সংসার করতে চাইবে এবং এটাও ঠিক যে তুমি ফাদার হয়েও, এই রোগজীর্ণ শরীরেও এলিজার আকর্ষণের কামনায় ভুগছ। যেহেতু সে এই কামবিষ সংক্রামিত করেছে তোমার মনে। বলো, এটা ঠিক কিনা ?'

পাদ্রী ফাদার জন বললেন, 'মনের খবর আপনি পড়তে পারেন ফকির। আপনি ওকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যান যেথা ইচ্ছা। আর আমাকে রোগমুক্ত করে দিন।'

পীরচেঙ্গি তখন তাঁর ঝোলা থেকে সমুদ্রের একরকম দুগ্ধধবল শাঁখ বার করে সেটাকে একটু চাপ দিয়ে গুঁড়ো করে নিয়ে ফাদারের শরীরে মাখিয়ে দিতে বললেন। বললেন, 'খুব সাবধান, যদি কোনো-খানে এই ওষুধ না লাগে তবে সেখানে রোগের জীবাণু থেকে যাবে অতএব ওকে বসনমুক্ত করে সর্বশরীরে দাওয়াইটা লাগিয়ে দাও।' নিদারুণ লজ্জা পেয়ে বললাম, 'আমি একাজ করতে পারব না কেননা উনি আমার বাবার মতো।'

'বাবার মতো, আসল বাপ তো নয়? কোনো যুবতী যদি অন্য কোনো পুরুষ যুবককে ভাইফোঁটা দিয়ে সম্পর্ক পাতায়, নিরিবিলিতে তা কতখানি আশ্বাসজনক হবে বলতে পারো? যাহোক, আমিও হুকুম করছি, তুমি ওষুধ লাগাও। ওর জঘন্য দেহ তুমি দেখ, ওর অতীত দেহ-আকর্ষণ থেকে তুমি মুক্ত হও। আমি তোমাকে রাজপুত্র দান করব।'

'আমি তাই করলাম। পাদ্রীর শরীর দেখে আমার ঘৃণা হতে লাগল। তিনি রোগমুক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আমাকে বিদায় দেবার বেলায় খুব কাঁদতে লাগলেন। আমাকে আনার সময় ফকির গীর্জার ভেতর থেকে টগবগিয়ে হেঁটে-আসা একটি মাঝ-বয়সী রমণীকে দেখালেন। বললেন, 'উনি তোমার জন্মদাত্রী জননী।' আমি তখন ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। বললাম, 'তুমি আমার মা? আমাকে তুমি তুলোর প্যাডের মধ্যে করে ভাসিয়ে দিয়েছিলে?'

মা বললেন, 'এটা বোধহয় আরব্য উপন্যাসের গল্প। গল্পটা তোমার ভাল লেগেছে—তাই শোনাতে এসেছ; নতুবা তোমার পাগলা গারদে আশ্রয় নেওয়া উচিত।'

'তখন আমি তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিলাম। বললাম, পাপিষ্ঠা, তুমি আমায় কুক্ষেত্রে জন্মদানের জন্য দায়ী। চিরকাল কুমারী থেকে মজা লুটেছ তুমি আর পাপের ফল ভোগ করব আমরা?'

'তার চুল ধরে টানতে টানতে গীর্জার বাগানের বাইরে আনলাম। ফকির আমাদের ছাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে

এলেন এক সমুদ্রের কিনারে। জোরে তিনবার হাঁক মারতেই মহা-শূন্য থেকে আলোর মালার মতো কি একটা পড়ে গেল জলে। দেখলাম, সেটা নৌকো হয়ে গেছে। তাতে করে পীরচেঙ্গি আমাকে এখানে এনে রাখলেন।'

ফরিদ এলিজার সোনালী চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'কিন্তু এখান থেকে মুক্তি কি ভাবে হবে? বাদশা জাহাঙ্গীরের সিংহাসন যে আমার লাভ করা চাই। আমার মা গুলনার যে বাঁদী হয়ে নুরজাহানের হারেমে দিন কাটাচ্ছেন। আচ্ছা, বাগানের ঐ যেসব পাথর মূর্তি, ওগুলো কি?'

এলিজা বলল, 'ধ্যেৎ! এসো আমরা সুখভোগ করি।'

এলিজা পাগল হল। হাসনুর মতোই ব্যাপার ঘটল। সে বিবর্ণ হয়ে গেল। ভোরের বেলা দেখা গেল সে যেন মারা গেছে অথবা সংজ্ঞাহীন।

সকালে ফরিদ ঝর্ণার জলে স্নান করে গাছের ফল পেড়ে খেল। সারা দ্বীপ তন্ন তন্ন করে দেখল। সেই ফকির কোথায়? একচল্লিশ দিন পরে কি সে ঐ রকম পাথর হয়ে যাবে যারা বাগানের মধ্যে পড়ে আছে। যারা পীরচেঙ্গিকে অপমান করে, মান্য করে না, তাদের তিনি বোধহয় এই মায়াকাননে এনে নারী দিয়ে প্রলুব্ধ করার পর এই বকম পাথর করে দেন। কোনো মেয়েই কি সে কথা বলবে না। এলিজাও তো বলল না।



॥ পাঁচ ॥

শ্বেত পাথরের গুহার মধ্যে প্রার্থনা করতে বসে ফরিদ কেবলই অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগল : তাহলে কি একচল্লিশ দিন ধরে একচল্লিশটি রমণীকে প্রতি রাতে ভোগ করার পর তাদের পৈশাচিক পরিণতির জন্য বিচার চাইবে যাত্নকর-কন্যা নীলোফার? তাকে চিরকাল পাথর করে রাখবে মায়াকাননে? তাকে কি কোনো যাত্নমন্ত্র বলে অন্যান্য প্রতিটি রমণীর কাছে যেতেই হবে সন্ধ্যাবেলায়? না, আজ আর সে যাবে না। কিন্তু বসরার কিম্বা কাশ্মীরের যে অপরূপ লাবণ্যবতী কন্যা ত্নটিকে সে দেখে এসেছিল, তাদের দিকে চোখ পড়তেই তারা মদির বিহ্বল চোখে হেসেছিল, আর একটির রক্তিম, অন্যটির সবুজ ভেলভেট মোড়া পালঙ্কশয্যা দেখিয়েছিল ইসারায়। তাদের সে ভুলবে কেমন করে?

আল্লা নারীকে কী আকর্ষণীয় বস্তুই না করেছে পুরুষের কাছে। পীরচেঙ্গি আর যাই হোন, রূপ-যৌবন কাকে বলে তা ভাল করেই চেনেন, আর তিনি বোধহয় এমন বেরসিক নন যে এইসব স্নুন্দরীদের কাছে অস্নুন্দর কোনো যুবক আনবেন, কেননা মায়াকাননে যেসব পাথরের পুরুষমূর্তিগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারা কেউই অস্নুন্দর বা অভব্য দেখতে নয়। আচ্ছা, ওদের তো নেড়ে চেড়ে দেখা হয় নি, ওরা কথা বলতে পারে কিনা?

হঠাৎ গুহার মধ্যে আজানের ধ্বনি শোনা গেল। সারা পর্বত-গুহার অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই ধ্বনি ললিত বিলম্বিত লয়ে। কোথা থেকে হচ্ছে এই অপূর্ব আজান?

গুহার মধ্যে পরিষ্কার পথ। অস্বচ্ছ অদৃশ্য এক নীলাভ আলোর

জ্যোতি। মনোরম আবহাওয়া। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল ফরিদ। কিছুদূর যাবার পর দেখল পর্বতের ভেতরে বড় বড় ঘর আছে। ঘরের মধ্যে ঝাড়বাতি জ্বলছে। জানালার রেশমী পর্দার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে অজস্র সোনাদানা। অন্যসব ঘরে হীরে, মুক্তো, চুনী, পান্না, অয়সকান্তমণি, সূর্যকান্তমণি, আরো কত সব দামী দামী ধাতব পদার্থ। পৃথিবীর ধনভাণ্ডার এখানে। দোর খোলা পড়ে আছে। পর্দা ঠেলে ঢুকে গিয়ে যত ইচ্ছা নাও, কিন্তু নিয়ে যাবে কোথায় ? এই মায়াকানন থেকে উদ্ধার পাবে কি করে ?

থাক এসব, লোভ সামলাতে হবে, চলতে লাগল সে। দেওয়াল-গাত্রে পবিত্র কোরআনের বাণী! দামী দামী মরকত জহরতের অলঙ্করণে শোভিত বর্ণমালা পড়তে পড়তে চলল ফরিদ। একেবারে সূচনা থেকে গোটা পবিত্র কোরআন সাঙ্গ করা হয়েছে দেওয়াল-গাত্রে, সারাদিন পাঠ করার পর তার ক্লান্তি এলো। ক্ষুধায় কাতর হল সে। টলতে লাগল তার শরীর। কিন্তু আজানধ্বনি শুনলেই সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মগরেবের আজান হচ্ছে এখন।

কে আজান দেয়? কোথায় মসজিদ?

আজ সে নামাজ পড়বে, মন তার ভিজে গেছে দয়াময় আল্লার অপূর্ব বাণীর আধ্যাত্মিক রসে। ছুটে চলে যাবে সে মসজিদের খোঁজে? মোনাজাত করবে, হে আল্লা, আমার অপরাধ ক্ষমা করো, আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দাও। আমাকে এই মায়াকাননের রহস্য-জাল ভেদ করতে দাও।...

হঠাৎ মন তার ঠাট্টা করে বলল, কোথায় যাবে, এসেছ তো বেহেস্তে। তা বটে! কিন্তু সোনার মেয়েগুলোর চেহারা কালো হয় কেন? তাতে মাছি ভনভন করে কেন? পুরুষরা পাথর হয়ে যায় কেন? একি সাংসারিক জীবনের সংজ্ঞা? তাহলে কি নারীর মাতৃমূর্তির কোনো সম্মানমর্যাদা নেই? পিতৃরূপী পুরুষ কি পর্বত-প্রস্রবণ নয়?

যাহোক তাহোক, চোদ্দ সেপারা কোরআন শরীফ পাঠ করা

হয়েছে তার—এখন বাকি ষোল সেপারা। সারারাতেই শেষ করে ফেলবে সে। আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে, যেই না সে আবার পড়তে যাবে হঠাৎ সেই বসরার মেয়েটির কথা মনে পড়ল। তার চোখ ডাকছে, ঠোঁট হাসছে। পাকা বেদানার মতো রঙ তার গালের। সেই অপূর্ব হর্মতল, লোভনীয় শয্যা। জানালায় নীল নদী আর পনীর-মেঘের মতো এই শ্বেতপাথরের পর্বতদৃশ্য।

আর অপূর্ব সুন্দর পোলাও, কাবাব, খানাপিনা, খোসবাইয়ে দীল চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এখনি গেলেই সেই বসরা কুমারী গেলাশভরা ডালিম-রস নিয়ে ঠোঁটের কাছে ধরবে তোমার! মন বললে, ফরিদ, চলো সেখানে, যুবক বয়সে কি হবে আধ্যাত্মিক-রস পান করে?

জীবনের অঢেল সময় আছে।

বিবেক বলে উঠল, চোপ! যৌবন-শক্তি নিয়েই সফলতা অর্জন সম্ভব, বুড়ো থুত্থুরে জরদগব হয়ে গতিহীন বলেই আল্লার নাম নিয়ে পড়ে থাকতে তুমি বাধ্য—যখন তোমাকে কেউ চাইবে না—মাটিতে মুখ রগড়াবে, তখন কি তুমি ইষ্টলাভ করতে চাও?

রাত্রে শ্বেতপাথর ঠাণ্ডা হতে লাগল। পা কনকন করতে আরম্ভ করল ফরিদের। তবু সে অন্যমনস্ক না হয়ে কোরআন শরীফ পাঠ করে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে বাণীর অন্তর্নিহিত ভাবে-রসে ডুবল সে। ছোট ছোট সূরাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেতে লাগল। যখন ভোরের আজান ধ্বনিত হতে লাগল তখন শেষ সূরাটি পড়ছে:

'একশো চোদ্দ নম্বর সূরা। সূরা আন্-নাস—অর্থ হল মানুষ,
[দয়াময় ফলদাতা আল্লার নামে]

১ বলো: আমি শরণ নিই মানুষের পালয়িতার,

২ মানুষের প্রভুর,

৩ মানুষের উপাস্যের,

৪ গুপ্ত মন্ত্রণাদাতার অকল্যাণ থেকে,

৫—যে মানুষের মনের ভিতরে মন্ত্রণা দেয়—

৬ জিনের ও মানুষের।

ফরিদের হৃদয়ের মধ্যে সহসা যেন একটা আনন্দ উপলব্ধির রক্তোচ্ছ্বাস ঘটল: 'হে আল্লা, তোমাকে আমি পেয়েছি'—বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

তারপর যখন তার জ্ঞান হল, দেখল সে, একটি অপূর্ব সুন্দর মসৃণ রক্তের মতো টকটকে লাল রঙের মসজিদের মধ্যে একখানা গালিচার ওপরে শুয়ে আছে। চোখ চাইতেই একজন বিরাট দাড়িওয়ালা বেঁটে মুসলমান তাকে সালাম জানাবার পর সরবৎ পান করতে দিল।

ফরিদ বলল, 'তুমি তো মানুষ নও, তুমি কি জীন?'

'জী হুজুর, পীরচেঙ্গির গোলাম। এই মসজিদের মোয়াজ্জেন এবং খাদেম। আমার এই দীর্ঘ দাড়ি দিয়ে মসজিদ ঝাঁট দিই।'

'তোমার আজানের ধ্বনি আমার খুব ভাল লাগে।'

'বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ হুজুর!'

'পীরচেঙ্গি এখন কোথায়?'

'তিনি এই মসজিদের অভ্যন্তরে অনাহারে আজ তিনদিন হল প্রার্থনায় রত আছেন।'

'আমাকে তুমি দেখাবে?'

'আমি তাঁর পাহারাদার। তাঁর যাদুদণ্ড, আতসকাঁচ বা অন্যান্য জিনিসপত্র ছুঁতে পারি না, আমি অভিশপ্ত বন্দী জীন। পীরচেঙ্গি এখন ধ্যানস্থ; আমি তাঁর গোলাম। আপনি সমগ্র কোরআন শরীফ পাঠ করার পর এমন একটা শক্তি লাভ করেছেন যার বলে এই মসজিদে ঢুকতে পেরেছেন। যদি আপনি যাদুদণ্ড নেন তবে আপনাকে আমি হত্যা করতে পারব না। অনেক যুবরাজ এই মায়াকাননে এসে রমণীভোগে মত্ত হওয়ার পর পাথরে পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণ শাস্ত্র কোরআন শরীফ কেউই সাঙ্গ করতে পারে নি। আপনি আরো চোদ্দদিন অপেক্ষা করলে তবে প্রার্থনান্তে পীরচেঙ্গির দীক্ষা পাবেন। আপনাকে তিনি দীক্ষা দেবেন।'

সরবৎ খাবার পর সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত ক্ষুধা দূর হয়ে গেল

ফরিদের। ইসারা করল মসজিদ অভ্যন্তরে যাবার জন্য। লক্ষ্য করল কোরআন শরীফের বাণীগুলি যেন ক্রমে ক্রমে লাইন ধরে একে একে বেরিয়ে আসছে তার হৃদয়ের পর্দায়। আর সে অন্যমনস্ক ভাবেই তা পাঠ করে চলেছে।

স্বল্পালোকিত একটি দীপ জ্বলছে মসজিদের গুহার মধ্যে। দেখল, পীরচেঙ্গির মাথা মাটির মধ্যে পোঁতা! ধড়টা ওপরের দিকে তোলা। কেবলই ধ্বনিত হচ্ছে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা! লা ইলাহা ইল্লাল্লা...'

কি করবে' এখন কিছুই স্থির করতে পারল না ফরিদ। যে তলোয়ারটি পড়ে আছে তাই দিয়ে এক কোপ মেরে পীরচেঙ্গির মুণ্ড আর ধড়টা কি পৃথক করে দেবে? পারবে কি তা করতে? কিন্তু কেন করবে তা সে? ক্ষমতা পাবার লোভে? যে লোকটা এত মণি-মাণিক্য, হীরা, জহরত, সুন্দরী রমণী, মায়াকানন, মায়ানদী, আকাশ, পর্বত সব কিছুর অধিকারী, তাঁর এইসব অর্জন করার ক্ষমতা লাভ কেমন করে হল তা কি সে ধৈর্য ধরে জানবে না?

আর তলোয়ার মারার পর যদি তিনি না মরেন? যদি তিনি সত্যই একজন মরণজয়ী পীর হন? তার চাইতে ধৈর্য ধারণ করাই যুক্তিযুক্ত। শয়তানী-বুদ্ধি থেকেই জন্ম নেয় হঠকারিতা।

জীনটা বলল, 'আমার নাম জোজো!'

জোজোকে হুকুম করতে আবার মসজিদের ওপরে নিয়ে এলো।

চোদ্দদিন সে আবার কোরআন শরীফ পাঠ করতে লাগল। দেখল তার মনের দেওয়ালে সেসব চিরকালের জন্য যেন খোদিত হয়ে গেছে।

জোজো মাঝে মাঝে খাবার এনে দিয়ে যায়।

চোদ্দদিন পরে ঠিক মগরেবের আজানের পর পীরচেঙ্গি অপূর্ব সুন্দর বাদশাহী পোষাক পরে নিচে থেকে উঠে এলেন। এসে মাথায় হাত রাখলেন ফরিদের। বললেন, 'বৎস, তুমি এখন আমার শিষ্য হবার যোগ্য হয়েছ। তুমি আমার উত্তরাধিকারী। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এই যাদুদণ্ড এখন তোমার।'

॥ ছয় ॥

ফরিদ একবার যাদুদণ্ডটিতে ভয়ে ভয়ে হাত ছুঁইয়ে দেখল।

পীরচেঙ্গি একটি সোনার কুরশিতে বসলেন। কুরশিটি এনে দিল জোজো। কত বিচিত্র নক্শা আর দামী দামী পাথর বসানো তাতে।

একটি গাঢ় সবুজ কাঁচের চৌপায়া আনল। ধবধবে সাদা পিরিচে করে খাবার দেওয়া হল। খাঁটি ঘিয়ের মোরগ-পোলাও। খাসির মগজ ভাজা। গলদা চিংড়ির মালাইকারী। চাট্নি। অনেক রকম ভাজা-ভুজি। ফলার। দই, বাবড়ি, সন্দেশ; পাত্রভরা আঙুর-খেজুর-আপেল-বেদানা।

খানাপিনার সময় পীরচেঙ্গি বললেন, 'আমার বয়স এখন হাজার বছর পূর্ণ হল। পৃথিবীর কোনো জিনিসে আর আমার আশা-আকাঙ্খা নেই। আমি এবাব আল্লাব ইচ্ছায় পরলোকের বাসিন্দা হতে চাই। যারা আমাকে অপমান বা অবমাননা করেছিল তাদের আমি আমার মায়াকাননে এনে মায়াবিনী নারীদের দ্বারা মুগ্ধ করে তাদের লালসার, পাপের জন্য পাথর করে রেখেছি। তাদের মৃত্যু ঘটেনি, অসীম যন্ত্রণা পাচ্ছে তারা—তাদের মুক্তি দিতে চাই। আর মেয়েগুলোকেও আমি মুক্তি দেবো। তারা যেথা ইচ্ছা চলে যাবে!'

ফরিদ শুধোলে, 'আর এই মায়াকানন?'

'সাগরের পানিতে মিশে যাবে।'

'এত সোনাদানা?'

সবই ধূলিকণায় পরিণত হবে! কেননা এই পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণাই আল্লার সৃষ্টি আর তার মহা মূল্য আছে।'

'নীলোফার কোথায়, সে আপনার কে ?'

'সে আমার পালিতা কন্যা। সেও স্বয়ংসিদ্ধা মেয়ে। তাকে তুমি বিয়ে করতে পার।'

হঠাৎ নীলোফার এসে হাজির হল। অপরূপ লাবণ্যবতী সেই রমণী। পরনে রেশমের পোষাক। গায়ে লক্ষ টাকার জড়োয়া গহনা। কী অপূর্ব চোখ। যৌবন তার চেহারার প্রতিটি খাঁজে খাঁজে, ভাঁজে ভাঁজে ব্যক্ত হচ্ছে। চাঁপাকলির মতো আঙুল। সে হাসল। দুজনকেই অভিবাদন করল।

পীরচেঙ্গি বললেন, 'এসো মা নীলোফার। এবার তোমার জীবন উপভোগের দিন এসেছে। আমার ইন্তেকাল উপস্থিত।' পীরচেঙ্গি এবার ফরিদ আর নীলোফারের হাত ধরে একত্র করলেন।

হাতে হাত রেখে চোখে চোখে তাকিয়ে রইল ফরিদ আর নীলোফার।

যাদুদণ্ড স্পর্শ করে পবিত্র কোরআন থেকে আবৃত্তি করতে লাগলেন পীরচেঙ্গি। চারদিক থেকে বাজনা বাজতে শুরু করল। পীরচেঙ্গি বললেন, 'এই মায়াকাননের যত বন্দী প্রাণী আজ মুক্ত। তারা আনন্দ করুক। পান-ভোজন করুক। প্রাণের আকাঙ্খা মিটিয়ে তারা প্রেম-সম্ভাষণ করুক যে যাকে পছন্দ করে।'

সোনার সিংহাসনের দোলনায় দুলতে লাগল ফরিদ আর নীলোফার!

সেইসব রমণীরা এলো যারা এতদিন এই মায়াকাননে বন্দী ছিল। সেইসব পুরুষরা জাগ্রত হল যারা এতদিন পাথর হয়েছিল।

সবাই হাসতে লাগল, নাচতে লাগল। জলের ফোয়ারা ছুটতে লাগল। রঙ দিতে লাগল এ-ওর গায়ে।

বাজনা বাজতে লাগল।

পরীর মতো মেয়েরা বর-কনেকে ঘিরে ফুল আর রঙ ছিটোতে

লাগল। ফুলের তোড়া দিয়ে হাসনু মারল ফরিদকে। এলিজাও কটাক্ষ করল। তাদের চেহারা এখন নির্মল হয়ে গেছে। লাবণ্য যেন ঝরে পড়ছে।

সমস্ত বাগানের আলো আস্তে আস্তে নিভে এলো। নীলাভ মায়া জ্যোৎস্নায় ঢেকে গেল চারদিক।

জোড়া জোড়া যখন প্রেম-প্রণয়ে লিপ্ত কেউ কুঞ্জঝোপের পাশে, হ্রদের জলের ওপরের টুঙ্গিতে বা নৌকোয়, কেউ ফুলের দোলনায়—তখন সহসা একটা বিকট চিৎকার শোনা গেল!

'আঁ—আঁ—আঁ—আঁ...'

'কিসের এই চিৎকার? কার কণ্ঠস্বর?' শুধোলে ফরিদ।

নীলোফার সহসা আঁতস কাঁচ চোখে লাগাল। বলল, 'আজরাইল এসেছে, পিতাজীর মৃত্যুর সময় হয়েছে।'

'আজরাইলকে তুমি কি ঐ আতস কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছ?'

'না। একটা বিরাট দেহের সাদা অবয়ব মাত্র। পয়গম্বররা ভিন্ন ফেরেশতাদের কেউ চোখে দেখতে পায় না। যার মৃত্যু ঘটবে সেই শুধু দেখতে পাবে।'

আতস কাঁচ চোখে দিল ফরিদ। দেখল, দুগ্ধ ধবল একটি মূর্তি। ছায়ার মতো।

পীরচেঙ্গি বলছেন, 'এসো বন্ধু, আমার আত্মাকে নিয়ে যাও। আমাকে শান্তির সঙ্গে মৃত্যু দাও। আমি আল্লার জ্যোতিতে মিলিত হই।'

সবাই দেখল পীরচেঙ্গির মৃত দেহ পড়ে আছে।

ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গেল।

পীরচেঙ্গিকে নদীর তীরে সমাধিস্থ করা হল।

নীলোফার চোখের জল মুছে ফেলে প্রাসাদের মধ্যে এলো। ফরিদকে বলল, 'যে যা চায় তাকে তাই দিয়ে বন্দীদের মুক্তি দাও।'

ফরিদ সিংহাসনে বসল রাজবেশে। বিভিন্ন দেশের রাজকুমার

আর রাজকুমারীদের সে ডাকল। জোজো তাদের ডেকে আনল।

ফরিদ বলল, 'বন্ধু এবং বান্ধবিগণ, তোমরা পছন্দ মতো বরকনে হতে পারো। প্রত্যেকেই তোমরা সুন্দর সুন্দরী। এক হাজার করে সোনার মোহর নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেযার দম্পতি হিসাবে চলে যাও পৃথিবীর যে যেদিকে ইচ্ছা।'

দেখা গেল ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকের জন্য। সবাই এক একজন রমণীর হাত ধরল। তারা হাসতে লাগল লজ্জায়, খুশীতে।

ঘোড়ায় চড়ে মোহরের বস্তা নিয়ে একে একে চলে গেল।

শুধু পড়ে রইল জোজো একা।

সে বলল, 'আমি এই মসজিদে চিরকাল থাকব। আল্লার উপাসনা করব। পীরচেঙ্গির কবর চৌকি দোব আর জিয়ারত করব।'

মায়াকানন ভেঙে দিয়ে সাধারণ মানুষের বেশে ঝোলা কাঁধে নিয়ে পথে বের হল ফরিদ। কোমরে তার তলোয়ার ঝুলছে। সঙ্গে রইল নীলোফার।

দিল্লী নগরীতে পৌঁছে জনবহুল পথের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে যাবার সময় ফরিদ চোখে আতস-কাঁচ লাগিয়ে দেখতে লাগল মানুষদের। আশ্চর্য, রমণী পুরুষ সবাইকে একেবারে নগ্ন দেখা যাচ্ছে। আর বিকৃত চেহারা! কেউ গরুর মতো, কেউ বা ঘোড়া, গাধা, ছাগল! কে তাহলে মানুষ এদের মধ্যে?

একজন মৌলভীকে দেখল, অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ধড় তার জন্তুর।

সহসা মনে হল, নীলোফার তাহলে কি রকম?

দেখল তাকে। দেখতে পেল তার চেহারা শ্বেত ময়ূরের। চোখ দুটো লাল পলার। সেকথা নীলোফারকে জানাল ফরিদ। বলল, 'আমাকে তুমি দেখ, কেমন দেখায় ঠিক ঠিক জানাবে।'

নীলোফার হাসল। বলল, 'আমি দেখেছি অনেক আগেই। তোমার অর্ধেকটা ঘোড়া, ওপরটা মানুষ। পীরচেঙ্গির গোটাটাই ছিল মানুষের অবয়ব।'

'বাদশা জাহাঙ্গীর ?'

'পুরোটাই ঘোড়া।'

'বেগম নূরজাহান ?'

'তিনি হরিণী।'

'খুরম ?'

'লম্বালম্বী অর্ধেক শরীর তাঁর সাদা এবং কালো কিন্তু অবয়বটা মানুষের।'

সন্ধ্যার সময় একটা সরাইখানায় আশ্রয় নিল ফরিদ আর নীলোফার।

সরাইখানার মালিকের লাল দাড়ি। চোগা-চাপকান আর কিস্তির টুপিপরা বেশ বনেদী মোগলাই চেহারা। পটল দুটো চোখে সুরমা টানা। তিনি কুর্নিশের ভঙ্গি করে বললেন, 'অধীন বান্দার নাম সেরাফাত নিয়াজী। লোকে ইয়ারকি করে ডাকে 'খলিফা' বলে। আপনারা আমার মেহমান হয়ে যতদিন খুশী থাকুন। পোলাও রুটি, গোশ্‌ত, কাবাব, ফিরনি, সিমাই, হালুয়া—যা খুশী খান।'

'একখানা ঘরে কত লাগবে খলিফাজী ?'

বোরখার নেকাব তুলে নিয়াজীর দিকে তাকিয়ে হাসল নীলোফার, ফরিদের কথা শুনে।

'একদম পানির দামে ঘর পাবেন। মাত্র একটাকা প্রতিদিন।

'খানাপিনা সমেত ?'

'জী হ্যাঁ। তবে যে খানা বরাদ্দ থাকে তার বাইরে বাড়তি পছন্দ মতন নিতে গেলে আরো বাড়তি কিছু লাগবে।'

নিয়াজীর হাতে একটি সোনার মোহর গুঁজে দিতেই তিনি বুক-বুক খুশী। বললেন, 'কেয়াবাত! কেয়াবাত! মেহেরবানী আপনাদের। আসুন আসুন।'

ঘরের ভেতরটা দেখে তাজ্জব হল ফরিদ। দেওয়ালে, মেঝেয় চমৎকার কারুকাজ করা। মনে হল কোনো ধণাঢ্য ব্যক্তির প্রমোদভবন ছিল আগে।

অন্তত এ ঘরটাতে কাঠের যে আসবাব-পত্র আছে তা অতি মূল্য-বান বলা যায়। অভাব শুধু শয্যা-সামগ্রীর। সেসব বোধহয় সরাইখানার মেহমানরাই সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

ফরিদ বলল, 'খলিফাজী, ঘর তো বেশ পছন্দ কিন্তু বিছানা-পত্র কই?'

খলিফা হাসলেন। সলজ্জভাবে বললেন, 'সেটা তো হুজুর মেহমানরা নিজেরাই আনে। আপনাদের আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এক্ষুণি লোকজন পাঠাচ্ছি চাঁদনী-বাজারে।'

ফরিদ তার ঝোলা থেকে লাল শার্টিনের একটা থলি বার করে দিলে খলিফার হাতে। খলিফা তা ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু তা এনে নিজের গোপন কামরায় উল্টে দেখলেন সবই তামার পয়সা! মন বেজার হয়ে গেল তাঁর।

সেগুলো ফেরত নিয়ে গেলেন। বললেন, 'হুজুর, এগুলো তো সবই তামার পয়সা!'

'আরে ধ্যেৎ মিয়া!' তাড়া দিল ফরিদ, 'একটু সরবৎ-পানি কিছুই না দিয়ে আপনি শুধু টাকা-পয়সা গুছোবার ধান্দায় আছেন।'

নীলোফার বলল, 'কই দেখি তামার পয়সাগুলো—ওগুলো তো সোনারই ছিল! আমার বাপ তাঁর শেষ সম্বল তুলে দিয়েছেন তাঁর জামাইয়ের হাতে। কাজেই সোনা ছাড়া তামা হয় কি করে?'

পয়সাগুলো ঢেলে দিতে নীলোফার হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতেই তা সোনা হয়ে গেল। বলল, 'এইতো সব সোনা—সোনার মোহর!'

'তাইতো! বটেই তো!' বললেন নিয়াজী। হেঁট হয়ে পড়ে দেখতে লাগলেন। ঝোলায় তুলে নিলেন তাড়াতাড়ি। এতো সোনার মোহর নিয়ে যাচ্ছেন তিনি মাত্র দুখানা গালিচা, কম্বল, তাকিয়া, তোষক, গদি, মশারী ইত্যাদির জন্য। একটা কি দুটো মোহর ভাঙালেই সব হয়ে যাবে। খলিফা এবার বড়লোক হয়ে যাবেন!

খলিফা ছুটে গেলেন সরাইখানার পেছন দিকের লতাগুল্মে

আচ্ছাদিত তাঁর নিজের আস্তানাটার ভেতরে। ঘর বন্ধ করে মোমবাতি জ্বেলে রুগ্ন অসুস্থ কন্যার শয্যা-পাশে বসে বললেন, 'বেটি, এবার তোর রোগ সারিয়ে তুলব বাদশার খাস হেকিম শাহাদত মিয়াকে এনে। দৈনিক সাত মোহর তাঁর নজরানা। বেটি আসমা, চোখ খুলে দেখ, কি এনেছি।'

'কি এনেছ আব্বা?' ক্ষীণকণ্ঠে আসমা শুধোলে। 'এই থলি ভরা সোনার মোহর কোথায় পেলে?'

'নতুন এক মেহমান-দম্পতি এসেছে…

থলিটা উল্টে দেবার পর তাজ্জব কাণ্ড, দেখা গেল, আবার সেই তামার পয়সা।

'সে কি! তামার পয়সা! আমি যে নিজের চোখে দেখলাম… দেখ মা তুই ভাল করে! আমার নজর কি খারাপ হয়ে গেল?'

আসমা হাত দিয়ে দেখল। হাতে নিয়ে পরখ করল। বলল, 'এ তো খাঁটি তামা—তামা ছাড়া অন্য কিছু নয়।'

বৃদ্ধ নিয়াজী আবার ছুটে এলেন। এসে দেখলেন, দামী দামী লেপ তোষক গদি বালিশ ইত্যাদি পাতা হচ্ছে।

'এসব আপনারা এত তাড়াতাড়ি কোথায় পেলেন!'

নীলোফার বলল, 'ঝোলার মধ্যেই আমাদের ছিল, আগে খেয়াল করিনি।'

'ঝোলার মধ্যে ছিল!'

'হ্যাঁ চাচাজী!' বলল ফরিদ।

'আপনারা কি যাদু জানেন?'

'কেন বলুন তো?'

'তাই তো দেখছি। পয়সাগুলো আবার তামা হয়ে গেল কি করে?'

'আপনার নসীব চাচাজী। দেখি, ঢালুন আবার।'—বলল নীলোফার। পয়সাগুলো ঢালা হতে নীলোফার এবার হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতেই সব রুপো হয়ে গেল।

'সেকি, একবার তামা, একবার সোনা, একবার রুপো হয় কি করে!' বললেন নিয়াজী।

নীলোফার বলল, 'গুনাহগার বান্দা সোনা মুঠো করে ধরলে নাকি ধুলো হয়ে যায়, বালি হয়ে যায়। আপনি যেমন মানুষ তেমনি দাম পেলেন, নিয়ে যান, এই রুপো আর তামা হবে না; ধরুন, বিসমিল্লা বলে। আল্লার নামে আপনি আগে গ্রহণ করেন নি—তাই এই অবস্থা হয়েছিল।'

'বিসমিল্লা'—বলে নিয়াজী গ্রহণ করলেন থলিটা। বললেন, 'কিন্তু বিবিজান, বড় আশা করেছিলাম রুগ্ন মেয়েটার রোগ সারিয়ে তুলতে পারব—বাদশার খাস হেকিম শাহাদত মিয়াকে পাল্কি-চৌদলে করে এনে দেখিয়ে দৈনিক তাঁর সাত মোহর নজরানা দেবো কিন্তু নসীব বড় মন্দ!'

'যান, আসুন এখন, পরে দেখা যাবে।' বলে ফরিদ গোসল-খানায় চলে গেল।

রাতের খানা এসে হাজির হল তাদের।

খেয়েদেয়ে নরম মখমলের বিছানায় শুয়ে পড়ে নীলোফার ফরিদের গলা জড়িয়ে ধরে যখন অলৌকিক এক প্রেমকথা শোনাচ্ছিল হঠাৎ তারা শুনতে পেলে বেদনার্ত করুণ একটা কান্নার স্বর। কেঁপে কেঁপে চলেছে সেই ধ্বনি। প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে যেন পাথর-শিলা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে সেই স্বর!

'কে কাঁদে এমন করে?' শুধোলে ফরিদ।

নীলোফার বলল, 'বুঝতে পারছি না।' যাদুদণ্ডের ওপ
দিয়ে মন্ত্র পড়তেই একটা জীন এসে দাঁড়াল। সালাম জানা

ফরিদ শুধোলে, 'এমন করে এত রাত্রে কাঁদে কে?'

জীন উত্তর দিল না।

নীলোফার বুঝল জীন ফরিদের ঠিক বাধ্য নয়। সে তা
পড়ে আনে নি। তাই নিজেই শুধোলে ব্যাপারটা কি জ
জন্যে।

জীন বলল, 'এই সরাইখানার মালিকের মেয়ে আসমা রোগ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার সমস্ত শরীরে আগুনের দাহ। অসহ্য জ্বালা।'

'কি করলে ভাল হবে?'

'গোলেনূর আক্‌সাম ফুলের গন্ধ শোঁকালে ভাল হয়ে যাবে।'

'সে ফুল কোথায় পাওয়া যায়?'

'পৃথিবীর দক্ষিণমেরু পার হয়ে কোকাফ রাজ্য—সেখান থেকে বহুদূরে অন্য একটি নক্ষত্রে যেতে হবে—সেটা পরীদের রাজ্য। পরীরাজের যে পবিত্রাত্মা কুমারীকন্যা মারা যায় তার কবরে গোলেনূর আক্‌সাম ফুলের গাছ আছে। যে কোনো রোগ সেরে যায় সেই ফুলের গন্ধ শুঁকলে।'

'তুমি তা আনতে পারবে?'

'পারব কিন্তু তাহলে আমার শরীরের তাপ সব নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'সেই তাপ আবার ফিরে পাবে কেমন করে?'

'যদি একমাস ঐ যাদুদণ্ডকে আর জাগ্রত না করেন—আমি একটানা ঘুমোতে পারি।'

'তাজ্জব! আচ্ছা তাই হবে, তুমি চলে যাও।'

'না। দাঁড়াও।' চেঁচিয়ে উঠল ফরিদ। 'এ তুমি কি করলে নীলোফার? একমাস জীনকে না পেলে যদি আমরা বিপদে পড়ি এই দিল্লী শহরে? খুরম জানতে পারলে আমাকে নাক-কান কেটে থকে বার করে দেবে।'

তখন চলে গেছে।

গুটিতে হাত দিয়ে দেখল নীলোফার—সেটা একেবারে তো ঠাণ্ডা। বলল সে, 'ভয় কি, তোমাকে আমি আমার রণ করে লুকিয়ে রাখব। আমার হাতের আংটির মধ্যে আর ন আছে।'

ফার মেয়েকে আমি একবার দেখে আসব?' শুধোলে

'যাও।' বলে চোখ বন্ধ করল নীলোফার।

দোর টেনে দিয়ে আলো অন্ধকারে বেরিয়ে এলো ফরিদ।

কান্নার স্বর লক্ষ্য করে এগোতে লাগল সে।

আলো-আঁধারীর মধ্যে বার কয়েক ধাক্কা খেয়ে ক্রন্দনের স্বর শুনে ক্রমে আস্‌মার ঘরে এসে হাজির হল ফরিদ। মোমের আলো জ্বলছে ঘরে।

তাকে দেখতে পেল মেয়েটি। সে হাত তুলে কাতর ভাবে আহ্বান করল। বলল, 'বড্ড পিয়াস! এক কাত্‌রা পানি, আপনি যেই হোন...।'

ফরিদ কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে আসমার মুখে ধরল। শুধোল, 'কি হয়েছে তোমার?'

আস্‌মা বলল, 'আমার সারা শরীরে দহন-জ্বালা। দিনের বেলা কম থাকে, রাত্রে বাড়ে।'

'কেন এমন হল?'

'একজন ফকির আমাদের সরাইখানায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তার গায়ে ঘা ছিল। রক্ত-পুঁজ ঝরত। বিনা পয়সায় আহার চাইত। আমি তখন সরাইখানা চালাতাম। মা অনেককাল আগে মারা গেছিল। বাবাজী বিয়ে না করলেও এক বাঈজীর কাছে যেত। মাঝে মাঝে বাঈজীর সঙ্গে চলে যেত তাঁর গান-বাজনার জলসায়। সেবার দিন সাতেক লক্ষ্ণৌ শহরে গিয়ে রইল। আমি সরাইখানা চালাচ্ছিলাম। বুড়ো ঘা-অলা ফকিরকে সরাইখানা ছেড়ে চলে যেতে বললেও সে গেল না। কেবল হাসত সে। তার দাড়ি বেয়ে মুখের লাল-ঝোল ঝরে পড়ত। তাকে দেখে ঘেন্না হত। আমি একদিন তাকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিলাম। তার কাঁথা-কম্বল দূর করে ফেলে দিলাম। ঝাঁটা মারলাম পিঠের ওপরে। ফকিরটা ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর কাঁথা-কম্বলের একটা কোণা ধরে টানতে টানতে চলে গেল। সে চলে যাবার পর থেকেই আমার শরীরে দহন-জ্বালা শুরু হয়ে গেল। রাত্রে সেই জ্বালা বাড়তে

লাগল। বাবাজী এলে সব বৃত্তান্ত বললাম। ফকিরটাকে খুঁজতে লোক পাঠানো হল। কিন্তু গোটা দিল্লী শহরে সেই ফকিরের কোনো খোঁজ-পাত্তা পাওয়া গেল না।

ফরিদ বলল, 'ফকিরের বদ-দোয়া তোমাকে লেগেছে। কারু মনে আঘাত দিলে অভিশম্পাৎ এমনি ফলে যায়।'

'আল্লার কাছে, আর সেই ছদ্মবেশী ফকিরের কাছে আমি আমার দুষ্কর্মের জন্য মাফ চাইছি। আমি অনুশোচনায় আজ দু'বছর কাঁদছি অথচ মুক্তি পাচ্ছি না। বাবাজী কত হেকিম-কোবরেজ এনেছে। কত ওষুধ বেটে গায়ে মাখানো হল—কিছুতেই কিছু হয় না। বাবাজী এখন বলছে বাদশার খাস হেকিমকে আনলে তিনি নাকি ভাল করে দিতে পারেন। তিনি অনেক সোনার মোহর নেন।'

ফরিদ বলল, 'কেউ ভাল করতে পারবে না।'

'আপনি কেমন করে জানলেন?'

'আমি এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। তোমার কাছে ছদ্মবেশে যে ফকির এসেছিলেন তিনি আর কেউ নন, একজন পীর, নাম তাঁর পীরচেঙ্গি।'

'আশ্চর্য, আমি কি করে জানব! আমার যে রূপযৌবনের বড় অহঙ্কার ছিল, গরিব মানুষদের এন্‌কার করতাম। আমি দামী দামী পোষাক পরতাম। এখন সেসব পড়ে আছে। হায় আমার জীবন!'

'তোমার বাবাজী এখন কোথায়?'

'সন্ধ্যায় একটু এসেছিল, তারপর সারারাত কোথায় থাকে আমি জানি না। আচ্ছা, আপনি কে, কোথা থেকে এলেন?'

'আমি একজন সাধারণ মানুষ, ভাগ্যহত, বিতাড়িত, রাজপরিবারে বাড়তি জঞ্জাল হিসাবে জন্মেছিলাম। পথে পথে এখন ঘুরে বেড়াই। তোমাদের সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছি।'

'আপনি আমাকে কিছুক্ষণ পবিত্র কোরআন পাঠ করে শোনাতে পারেন?'

আসমার মাথায় হাত দিল ফরিদ। কোরআন শরীফ পাঠ করে শোনাতে লাগল সে। আসমা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি আর শোনা গেল না।

ফরিদ আবার ফিরে এলো।

দেখল নীলোফার তেমনি ঘুমোচ্ছে। তার পাশে শুয়ে পড়ে মুখ চুম্বন করতেই জেগে গেল। দুই বাহু দিয়ে নীলোফার তাকে জড়িয়ে ধরল। ফরিদ আসমার কথা সব জানাল। নীলোফার বলল, 'সব ব্যাপারই আমি জানি।'

'গোলেনূর আক্‌সাম ফুল নিয়ে জীনের ফিরতে কত সময় লাগবে নীলোফার?'

'আগামীকাল ঠিক মাঝরাতে ফিরতে পারে।'

'এত সময় লাগবে?'

'প্রতিপলে সেই জীন লক্ষ যোজন দূরে যেতে পারে, কোটি কোটি যোজন দূর কোকাফ অঞ্চল পার হয়ে অন্যগ্রহে সেই পরীর রাজ্য।'

'এই ঘুমোবে নাকি?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'তোমাকে দেখার আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে।'

নীলোফার তখন তার আংটি, আতসকাঁচ, যাদুদণ্ড সবকিছু ঝোলার মধ্যে পুরে মন্ত্র পড়ে তাদের মৃত করে রাখল খাটের তলায়। নিজের বেশবাস খুলে ফেলল। তার শরীর থেকে হীরন্ময় এক জ্যোৎস্না যেন ঝলমল করতে লাগল। পরিপূর্ণ যৌবন—একটি নারীদেহ—ভয়ঙ্কর তার আকর্ষণ।

শ্বেতশুভ্র স্তন দুটিতে মুখ রেখে কিছুক্ষণ আদর করল ফরিদ। নীল চোখ দুটিতে চুম্বন করল নীলোফারের। তার ওষ্ঠপুট লেহন করতে লাগল নীলোফার। চরম আনন্দের উত্তেজনায় দুজনে দীর্ঘ সময় প্রণয়সুখ ভোগ করার পর নীলোফার বলল, 'এই সুখ মনে থাকবে?'

ফরিদ বলল, 'চিরকাল। চিরদিন।'

'কিন্তু আমাদের যদি বিরহ হয় ?'

'তোমাকে হারালে তো আমি পথের ভিখারী হয়ে যাব।'

নীলোফার আর কিছু না বলে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

সরাইখানার খাদেমরা এসে দোর বন্ধ দেখে খাবার ফিরিয়ে আনল।

সন্ধ্যায় ঘুম ভাঙল নীলোফারের।

ফরিদ তখনো অচেতন।

সারাদিন তারা ঘুমিয়েছে ? কেন এমন হল ? এই অচৈতন্য এলো কেন ? সারা শরীরে ব্যথা। ফরিদকে জাগিয়ে তুলল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কেন এমন করে দেখছ আমাকে ?'

হাসল নীলোফার। বলল, 'না, কিছুই না।'

স্নান করে শুচিশুভ্র হয়ে দুজনে নাস্তাপানি করল।

সরাইখানার মালিক বললেন, 'আমার মেয়ে আস্‌মা আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চায়।'

ফরিদ বলল, 'এখন আমার সময় হবে না।'

'তার যে আবার জ্বালাটা শুরু হয়েছে। আপনি গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কোরআন শরীফ পাঠ করে শোনালে তার ঘুম আসে।'

'আমি সম্ভবত মাঝরাত্রে যাব।'

নীলোফার কিছুই বলল না।

যাদুদণ্ডের জীন এলো ঠিক মাঝরাত্রে। কালো কুচকুচে তার শরীর। গায়ে অসংখ্য লোম। চোখ দুটো আগুনের অঙ্গার যেন!

একটি শ্বেতশুভ্র পদ্মকুঁড়ির মতো ফুটোন্মুখ ফুল হাতে দিল সে নীলোফারের। ফরিদ ফুলটাকে দেখল। শুঁকতে যেতেই নীলোফার বারণ করল। বলল, 'খবরদার, অজ্ঞান হয়ে যাবে।'

'কেন ?'

'তোমার কোনো রোগ নেই।'

জীন হাসল। বলল, 'প্রয়োজন মিটলে এই ফুল আমাকে ফেরত দেবেন। আমি রেখে আসব সেই পরীকন্যার কবরের ওপরে।'

ফুলটাকে ফরিদের হাতে দিল নীলোফার। বলল, 'ফুলটা যতক্ষণ না ফেরত দিচ্ছ এই জীন মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার সামনে। ফুল নষ্ট করলে তোমার জীবন যাবে জীনের হাতে।'

ফরিদ ফুল হাতে নিয়ে চলে গেল আস্‌মার উদ্দেশে। হঠাৎ তার সন্দেহ হল, ফুলটা শুঁকলে কি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে যাবে? নাকি সে অমর হয়ে যাবে? আচ্ছা, জীনটার সঙ্গে কি কথাবার্তা বলছে এখন নীলোফার?

ফিরে এলো সে খুব গোপন পায়ে, দোরের ফাঁক দিয়ে দেখল এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। দেখেই তার মাথা গরম হয়ে গেল।

একি দৃশ্য! জীনের সঙ্গে শৃঙ্গার লীলায় মত্ত নীলোফার! নীলোফারের শরীর লেহন করছে জীনটা।

কেন, এর অর্থ কি?

ওর নিরুত্তাপ শরীরে কি তাপ ফিরিয়ে আনছে?

ফরিদ আর দেখতে চাইল না।

ফিরে গেল আস্‌মার কাছে। ফুলটা তার নাকে শুঁকিয়ে দিল বার বার তিনবার।

আস্‌মার শরীর থেকে জ্বালা চলে গেল! হঠাৎ যেন মায়ামন্ত্র বলে তার শরীরের পরিপূর্ণতা ফিরে আসতে লাগল। সে দেখতে লাগল তার শরীর। বলল, 'একি আশ্চর্য এই ফুলের ক্ষমতা! কি ফুল এটা? আমার তো সব রোগ সেরে গেল! দিন এই ফুলটা আমাকে। আর আপনাকেও চাই আমি।'

ফুল না দিয়ে দ্রুত চলে আসতে গেল ফরিদ। তার পিছু পিছু প্রায় বিবসনা হয়ে ছুটে আসতে লাগল আস্‌মা।

সরাইখানার মালিক মশাল হাতে নিয়ে বেরিয়ে দৃশ্য দেখেই মশালটা নিভিয়ে দিলেন।

ক্ষেপা পাগলের মতো হয়ে ফরিদের হাত থেকে ফুলটা কেড়ে

নেবার জন্যে লাফালাফি জড়াজড়ি করতে লাগল আসমা। দোর-গোড়ায় এসে ডাক দিল ফরিদ নীলোফারকে।

জীন এসে ফুলটা ছিনিয়ে নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল।

নীলোফার দেখল একটি অর্ধনগ্না অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ফরিদের পা জড়িয়ে ধরে বসে আছে। আস্মা এখন পরীকন্যা হয়ে গেছে। মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ফরিদ। নীলোফারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ঘৃণায়। তা'র চোখে অবজ্ঞা! সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আস্মাকে তার বাপ নিয়ে চলে গেল।

ফরিদ এসে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখল, নীলোফার নেই! তার যাদুদণ্ড, আতসকাঁচ, আংটি, ঝোলা সবই সে নিয়ে চলে গেছে!

আপনার কাছ থেকে অবিশ্বাস নিয়ে ফেরার পথে বাজার থেকে যে মাছ আমি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

হজরত তার মাথায় হাত দিলেন।

ফরিদের মনে হল তার কাহিনীও তেমনি অলৌকিক। দিল্লী নগরী থেকে তাকে বিতাড়ন করে দিলেন বাদশা জাহাঙ্গীর সে একজন দরবেশকে অপমান করেছিল বলে। তারপরের ঘটনা—কোথায় সেই মায়াকানন, নদীতে নীলোফার, রাত্রে তার জ্যোৎস্না-মূর্তি। তাকে বাঁদর করে রাখল। হাসনু মুক্তি দিলে, প্রেম করলে, কোথায় সেই মিশরকুমারী? এলিজাই বা কোথায়? সেই পাথর মূর্তি!... সবই কি যাদু! তার মাথাটা ঠিক আছো তো? বাদশা মাতাল হয়ে তার মা-জননী গুলনারের সঙ্গে প্রেম-প্রণয় করার পর সে বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায় নি তো?

কিছুই রেখে গেল না নীলোফার? তাকে এমন অসহায় করল কেন? তার দেহ লেহন করছিল সেবক জীন এটা দেখে ফেলার পর যে ঘৃণা তার মনে বাসা বেঁধেছিল তা কি টের পেয়েছিল নীলোফার? নাকি তার মন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে অন্য কিছুতে?

হঠাৎ দোরে আঘাত পড়ল। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ফরিদ, নীলোফার এলো নাকি!

দোর খোলার পর দেখলে, ধ্যেত্তেরি, খলিফা! লম্বা জোব্বা গায়ে! তিনি কুর্ণিশ করতে লাগলেন, 'হুজুর আপনি পীর, অধমের গুনাহ্-গাথা মাফ করুন। আমার মেয়ে আসমা এখন রোগমুক্ত। আপনি দয়া করুন তাকে। কী অপূর্ব রূপসী হয়েছে সে। বাদশার চোখ পড়লেই তাঁর হারেমে নিয়ে যাবেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি রাজদরবারে কিন্তু তাঁর মতনই সুন্দরী হয়েছে আমার মেয়ে।'

'বেশ তো, তাকে নিয়ে নীলাম খেলুন। লাখ টাকা উঠলেই বেচে দিন। মেয়ে তো ঘরে রাখবার সামগ্রী নয়। কোরবানীর [illegible] মতো তাকে বন্দি করবার মানত তো করাই থাকে বাপ-মায়ের।"

নিয়াজী বললেন, 'রাগ করবেন না । আপনি মানুষের কল্যাণ চান। আপনি পীর দস্তগীর। আমার মেয়ের রোগমুক্তির কথা জানাতে, দেখুন না, কত রোগীদের ভিড় জমছে সরাইখানার সামনে।'

চেঁচিয়ে উঠল ফরিদ, 'এসব আপনাদের কে বলতে বলেছে ? আমার এখন কোনো ক্ষমতা নেই। আমি একজন সাধারণ ফকির মাত্র।'

খলিফা পায়ের কাছে বসে পড়ল, 'অ.মাকে মিথ্যে ফাঁপরে ফেলবেন না হুজুর। আপনার রূপ-লাবণ্য দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনি সাধারণ ঘরের মানুষ নন।'

'বাজে বকবেন না, ভিখারী বা রোগীদের তাড়ান গিয়ে। নইলে আমি চলে যাব। আপনার মেয়ে রোগমুক্তির পর ক্ষেপা পাগলের মতো এমন ব্যবহার আরম্ভ করল যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমাকে ভুল বুঝে ঝগড়া করে আমার স্ত্রী কোথায় চলে গেলেন। একটা ঘোড়া থাকে তো এনে দিন, আমি তাকে খুঁজতে বের হব।'

'তাইতো, আপনার স্ত্রী তো নেই দেখছি। আমি মনে করেছিলাম গোসলখানায় গেছেন।'

'যান, ঘোড়া আনুন।'

খলিফা চলে গেলেন।

দোরের আসমানী রঙের মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম বহু বিচিত্র কল্কার নকসাঅলা পর্দা সরিয়ে রুপোর থালায় ক্ষীর, সন্দেশ-ফল-পানীয় সাজিয়ে নিয়ে অপরূপ লাবণ্যবতী অসামান্য সুন্দরী একটি রমণী ঘরে ঢুকল। তার ভুরুর ধনুক তুলে নীলাভ দীঘল চোখে তাকাল। দুধে ধোয়া চাঁপা কলির মতো তার আঙুল। তাতে বেদানার দানার মতো পাথর বসানো আংটি। মসৃণ নিখুঁত নাকের পাতায় রক্তের বিন্দুর মতো ছোট্ট নাকছাবি। দুহাতে কালো রঙের চুড়ি। কানে সোনার বালা। পায়ে কেয়ূর। কোমরে চন্দ্রহার। রেশমের পোষাক, অনিন্দ্যসুন্দরী এই হুরী যেন সবে-মাত্র আজ ভোরবেলায় ফোটা কাশ্মীরের গোলাপের মতো।

ফরিদ শুধোলে, 'কে তুমি ?'

'আমি আসমা !' লজ্জায় লাল হয়ে গেল যেন আসমা। ভীরু চোখে নিজের পায়ের দিকে তাকাল।

'এসো, কাছে এসো।' হাত বাড়াল ফরিদ।

চকিত চোখে ফরিদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুচকে হাসল আসমা। বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

হাতখানা ধরল ফরিদ। কী মায়াময় লাবণ্য। নরম মসৃণ ত্বক। সারা দেহে অপূর্ব এক সৌরভ আসমার। তাকে কাছে টানতে সে ডান হাত ঠেকিয়ে মৃদু একটু বাধা দিয়ে পাশের কামরার গোসল-খানার দিকে তাকাল।

ফরিদ ওর রক্তাভ ঠোঁট দুটিতে নিজের ঠোঁঠ ডুবিয়ে চুম্বন করার পর বললে, 'ও নেই, চলে গেছে।'

বুকের ওপরে ঢলে পড়ল আসমা। কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলল, 'কেন ?'

'জানি না।'

'আর আসবেন না ?'

'তাও জানি না।'

'সেই ফুল কোথায় ?'

'সেই মায়াবী-ফুল নিয়ে মায়াবিনী চলে গেছে।'

'আপনি আর যাবেন না ?'

'আমি এখন নিষ্কপর্দক, ভাগ্যহত, যদি দয়া করে একটু আশ্রয় দান করো আর বাদশার ছেলে ফরিদের কথা গোপন রাখো তাহলে এখানেই আমার স্বর্গ গড়ে তুলব তোমাকে নিয়ে।'

'থাকুন রাজকুমার, চিরকাল আমার এই বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থাকুন।—আপনি এখন নাস্তা করুন।'

ফরিদ উঠে কুর্শিতে বসে নাস্তাপানি খেতে খেতে তার জীবনের সব কথাই বলল। বিস্মিত হয়ে শুনল আসমা। সব শোনার পর বলল, 'আপনার সুরেলা কণ্ঠের ধ্বনি, সুললিত কোরআন পাঠ আর অতিব সুন্দর গঠন ভঙ্গিমা আমাকে মুগ্ধ করেছে।'

'কিন্তু এখন আমি কি করব, আমি যে অপদার্থ, বেকার।'

'কিছুই আপনাকে করতে হবে না, শুধু দয়া করে এই সরাই-খানায় থাকবেন আর...' হাসল আসমা। লজ্জায় আর কিছু বলতে পারল না।

ফরিদ যোগ দিল, 'আর তোমার সঙ্গে প্রেম-প্রণয় করব, এই তো?'

ফরিদের বুকের মধ্যে মুখ লুকোল আসমা।

তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল ফরিদ। কণ্ঠ তার বেদনার্ত হয়ে গেল। বললে, 'দুজনেই আমরা পীরচেঙ্গিকে অপমান করেছিলাম। দুজনেই অভিশপ্ত জীবন কাটিয়ে মুক্ত হয়েছি। সব অলৌকিকতা ভুলে গিয়ে এখন আমরা সাধারণ জীবন যাপন করতে পারি।'

আসমা হঠাৎ ফরিদের গণ্ডে একটা আদরের অধরস্পর্শ দিয়ে, তার পায়ে হাত দিয়ে চুমু খেয়েই ত্বরিত গতিতে বেরিয়ে গেল।

ফরিদ কিছুক্ষণ পরে পোষাক পরে নিয়ে যখন জানালার ধারে এসে দাঁড়াল দেখলে আসমা নিজের হাতে ভিখারীদের রুটি, হালুয়া আর পয়সা দিচ্ছে তার রোগমুক্তির জন্য খুশি হয়ে। চারটে খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে আনা বস্ত্র নামিয়ে খলিফা নিজের হাতেই দান করছেন ভিখারীদের।

সেই সময় দেখা গেল রাজপথ দিয়ে বর্ণাঢ্য পোষাক পরে রোশন চৌকির বাজনা বাজিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে বর চলেছে বিয়ে করতে। সঙ্গে অজস্র বরযাত্রী।

সরাইখানার পিছন দিয়ে বেরিয়ে আস্তাবল থেকে খলিফার ঘোড়াটাকে নিয়ে তাতে চড়ে বসে বরযাত্রী হয়ে চলল ফরিদ। খবর নিয়ে জানল ফরিদের ঠাকুরদাদা বাদশা আকবরের প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজলের নাতনীকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তাঁরই মন্ত্রী ফৈজীর নাতী। ফরিদ ভাবল, তাকে যদি চিনতে পারে কেউ? খুরম যদি

বিয়ে বাড়িতে আসে, গোঁফ-দাঁড়িতে অবশ্য ফরিদের তখনকার মুখোচ্ছবির সঙ্গে এখন মিল নেই।

বিয়ে বাড়িতে এসে ঘোড়া থেকে নামতেই ফরিদের সম্ভ্রান্ত বাদশাহী চেহারা দেখে তাকে সবাই 'আসুন আসুন' বলে আদর আপ্যায়ণ করে নিয়ে গিয়ে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসাল। মাথায় তার তাজ আর গলায় এক বরযাত্রীর-দেওয়া-বেলফুলের কুঁড়ির সাত লহরী মালা ও হাতের সলজ্জ রুমাল দেখে অন্তঃপুরের রমণীরা ভাবল ইনিই বর।

ফরিদ দেখল, আসল বর যে ব্যাটা, সে কদাকার।

ফরিদের আদর-আপ্যায়ণ দেখে কয়েকজন ছোকরা তার চারপাশে বসে গেল। নিজেদের গলার মালা ফরিদের গলায় পরিয়ে দিলে। ফরিদ সলজ্জ গম্ভীর, অবনত মস্তকে ঠিক বরের মতোই বসে রইল। আসল বর বোকা বনে গেল। খাবার দিতে এলেই ছেলেরা বলল, 'এদিকে, এদিকে। এখানে, বর আমাদের কাছে!'

কন্যাকর্তা গলঃবস্ত্র হয়ে বলল, 'দেখুন, দুজন বর কেন?'

একজন ছোকরা বলল, 'আপনি কি আসল কন্যার বাপ? তাহলে আসল বর চিনতে ভুল হয় কেন? বিয়ের সভায় তো নানান কিছু রঙ্গ-তামাসা হয়েই থাকে।'

'হয়েই থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েই থাকে।' ছোকরার দল বলে উঠল।

আসল বর ঝেড়ে-মেড়ে উঠল। তলোয়ার খুলে মাথার ওপরে ঘুরিয়ে বলে উঠল, 'আমি হলাম মন্ত্রী ফৈজীর নাতী, গোলাম বিন ফৈজী তাজকেরাতুল আল জাহান আল আসমান।'

ছোকরারা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে মারহাবা বলে উঠল।

কন্যাকর্তা বলে উঠল, 'তাহলে তো মুসকিল!' তার চোখ পড়ল ফরিদের দিকে। বর হিসাবে লোভনীয় হল ফরিদ। অন্দর-মহলের পর্দা সরিয়ে মেয়েরা ইসারা করে দেখাচ্ছে ফরিদকে।

আর একজন বুড়ো লোক এসে বললেন, 'এই রকম গণ্ডগোল না

করে দুজন বরের মধ্যে যুদ্ধ হোক, যে জিতবে সেই আমাদের কন্যাকে সাদী করে নিয়ে যাবে।'

সবাই সেকথা মেনে নিলে গোলাম বিন ফৈজী লাফ দিয়ে নেমে এলো বারান্দা থেকে নিচে, সে তলোয়ার খুলে ঘোরাতে লাগল।

ফরিদ বলল, 'আমি যুদ্ধে রাজি নই, আমি বরযাত্রী, বরের উচিত লম্ফঝম্ফ না করে চুপচাপ বসে যাওয়া।

ছোকরার দল চুপসে গেল। এ আবার কি হল? বর গোলাম এসে চুপচাপ বসে গেল।

কন্যাপক্ষের বৃদ্ধটি, কন্যার নানা অর্থাৎ দাদামশায়। তিনি ফরিদকে ডেকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। মেয়েরা চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়াল। কন্যাকে দেখানো হল। ফরিদ দেখলে, মেয়েটি সুন্দরী বটে কিন্তু নীলোফার বা আসমার কথা মনে পড়তে বলল, 'আমাকে মাফ করুন আপনারা, আমার স্ত্রী আছে।' বলে সে বেরিয়ে এলো। তার গলার মালা বরের গলায় পবিয়ে দিয়ে নেমে এসে ঘোড়ায় চড়ে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে গেল কেননা সে শুনেছিল, এই সাদী-বাসরে কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবরাজ খুবম আসছেন বলে সংবাদ এসে গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী বরের দিকে তার চোখ পড়বেই পড়বে, আর তখন হয়তো অপমানিত হবে।

নগরীর বাইরে এসে জনপদের মধ্য দিয়ে ঘোড়াকে খুব হালকা চালে চলতে দিল সে। পরিচিতদের সে এড়িয়ে চলতে চাইল।

পাহাড়ী উপত্যকায় ঢল নেমেছে এখানের ভূমিতে।

কাছের নদী থেকে কলসী কাঁখে কয়েকটি মেয়ে তাদের ফসলের ক্ষেতে জল এনে ঢালছে। লাল শালুর পক্কড় মাথায় কজন পুরুষ কোদাল চালিয়ে কাজ করছে ক্ষেতে।

মেয়েরা সবাই যুবরাজ ফরিদকে দেখল। হাসাহাসি করতে লাগল। পাহাড়ী উপত্যকার কোল ঘেঁষে যাবার সময় একটি জলবাহী সুন্দরী কৃষক কুমারীর মদমত্ত যৌবনের উচ্ছ্বাস দেখে অবাক

হল ফরিদ। ঘোড়াটার পেটে পা মেরে ইসারা করতেই সে চি হিহি করে উঠল, মেয়েরা ভয় পেলে বোধ হয়। গলিপথের একপাশে পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কাছে গিয়ে ঘোড়া সমেত মেয়েটিকে পাহাড়ের সঙ্গে চেপে ধরল ফরিদ। মেয়েটি চেঁচাতে যেতেই তলোয়ার খুলে ভয় দেখাল সে।

ঘোড়াটা তার কলসীর জল খাবার জন্য মুখ ঘষতে লাগল।

ফরিদ নেমে পড়ল। ঘুরে এসে মেয়েটির হাত ধরল। বলল, 'কি নাম ?'

'রূপা।'

'হিন্দু ?'

'হ্যাঁ।'

'এতবড় মেয়ে, বিয়ে হয়নি কেন গো ? কেমন করে যৌবনের জ্বালা সয়ে থাকো তুমি, আমাকে তোমার পছন্দ হয় ?'

রূপা লজ্জা পেয়ে হাসল। তার কোমর থেকে জলের কলসীটা নামিয়ে নিয়ে এক টুকরো পাথর মেরে ওপরটা ভেঙে দিতেই তৃষ্ণার্ত ঘোড়াটি জলটুকু শুষে নিল।

রূপার ঠোঁট একটু কাঁপল বটে কিন্তু সে মুগ্ধ অথবা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ঘোড়ায় উঠল ফরিদ, শুধোলে, 'কলসীর খেসারত দিতে হবে নাকি ?'

রূপা হঠাৎ দৃঢ় হল যেন। বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

ফরিদ জামার পকেটে হাত গলিয়ে দেখল একটি কপর্দকও নেই। বোকার মত হাসল সে।

রূপা পথরোধ করল, মেয়েরা সবাই তখন এসে পড়েছে।

রূপা তাদের বলল, 'এই পুরুষ আমার কলসী ভেঙে দিয়েছে, একে অবরোধ কর সবাই, বাবার কাছে ধরে নিয়ে চল।'

একজন মস্করা করল, 'শুধু কলসী ভেঙেছে, আর কিছু করেনি তো ?'

বোকা সাজল ফরিদ, বলল, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, ঘোড়াটা তেষ্টায় কলসী ভেঙে ফেলেছে।'

'চালাকি,নেবে পড়ো, নেবে পড়ো, ঘোড়ার পা ভেঙে দোব গাঁইতি মেরে, চোলি দিয়ে বাঁধ ছুটো হাতে, টেনে নিয়ে চল বাবার কাছে।'

অগত্যা, ব্যাপার দেখা যাক, ভাবল ফরিদ। তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে হাতে চোলি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেল এক বুড়ো চাষীর কাছে।

বুড়ো শুধোলে, 'কে বটে তুমি?'

আমি একজন সাধারণ লোক, কাজকামের ধান্ধায় পথে পথে, নগর থেকে নগরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

চাষীটি বলল, 'তোমার গায়ের রঙ তো সেকথা বলে না।'

'কি রকম! কাঁটাবনে হঠাৎ কি কোনো ফুলগাছ জন্মায় না?'

'তাহলে নিশ্চয়ই অসাধারণ তুমি। আমরা গরিব লোক। কলসী ভেঙেছ তার গুনোগারী দিয়ে দাও, নচেৎ মাটির কলসী জুড়ে দাও।'

'আমার কাছে তো একটিও পয়সা নেই। আর পোড়া মাটির কলসী ভাঙলে কি জোড়া যায়?'

'বসো তুমি এই পাথরে। এই একুশটা মেয়ে আমার। আমি সৎ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের তেমন আর কেউ মান্যি করে না বলে আমি ভূমিকর্ষণ করে খাদ্য সংগ্রহ করছি। আর মুসলমানরা অহেতুক অত্যাচার করে বলে এই দূর উপত্যকায় ডেরা বেঁধে বাস করছি। শুনেছি, বাদশা জাহাঙ্গীর নাকি মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকেন, রানী নূরজাহানই তাঁর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। জানো তো বাবা, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট। দে তোরা, কলসীটা দে। ভাঙা কলসীটা জোড়া দিতে পারি কিনা দেখি।

ভাঙা কলসীর টুকরো ছুটো জোড়া লাগিয়ে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতেই ফরিদ আশ্চর্য হয়ে দেখল—তা জুড়ে গেছে। অন্য কলসীর জল ঢেলে দিতে দেখা গেল আদৌ জল বেরুচ্ছে না। শুধোলে সে, 'কেমন করে এটা সম্ভব?'

'তোমার কাটা ধড় আমি জোড়া দিতে পারি, আমি সৎ ব্রাহ্মণ, মন্ত্র বা বাণীতে অগ্নি বা প্রাণ আছে।'

ফরিদ নতজানু হয়ে সেই বৃদ্ধের পদযুগলে হাত দিয়ে চুম্বন করল। মেয়েরা সবাই হেসে উঠল।

ফরিদ বলল, 'সময় হলে আমি আপনার কাছে আসব আবার। এখন যাবার অনুমতি দিন। ঋণ রইল আপনার কাছে।'

যাবার অনুমতি দিলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। রক্তবর্ণের একটি কন্দমূল তাকে খেতে দিলেন। অপূর্ব সুস্বাদু আর সৌরভ ভরা।

রূপা বলল, 'আবার আসবেন কিন্তু।'

ফরিদ ঘাড় ফিরিয়ে হেসে অনুমতি নিয়ে ঘোড়া চালিয়ে অনেক দূর চলে এলো। সারাদিনের পর একটি টিলার তলায় তালকুঞ্জের মধ্যে বসল। ঘুম পেল তার। জিন খুলে নিয়ে বিছিয়ে শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙল তার মাঝরাতে। দেখল, চারদিকে অন্ধকার। ঘোড়াটার পাত্তা নেই। টিলাব ওপরে আগুন জ্বলছে! কে যেন কিছু রান্না করছে একটা কুঁড়ে ঘরের চালায় বসে। ধীরে ধীরে সেখানে গেল সে। দেখল একটি হাবসী মেয়ে। ভীষণ কালো, বিরাট চেহারা। প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল বোধহয় রাক্ষসী। বুকে কোনো বস্ত্র নেই। স্তনগুলো বড় বড় লাউ যেন। কোমরে একটা ঘাগরা। ঘোড়ার মুণ্ডুটা পড়ে আছে পাশে। বিরাট একটা দেগ হাঁড়িতে টগবগ করে মাংস রান্না হচ্ছে। গড়ে গড়ে একুশটা ছেলে শুয়ে পড়ে আছে চালা ঘরের দাবাটাতে।

মেয়েটি তাকে দেখতে পেয়ে ইসারা করে কাছে ডাকল। বলল, 'বারেক বাবা ঘোড়াটাকে এনেছিলে! সাতদিন অনাহারে আছে আমার একুশটা ছেলে। খিদেয় কাঁদবে বলে মেরে ফেলে রেখেছি। এখন মাংস রান্না হল, ওদের ডেকে তুলি।'

ফরিদ সবিস্ময়ে এই ভৌতিক ব্যাপার দেখতে লাগল। মেরে রাখা ছেলেগুলোকে টেনে তুলল মেয়েটি। প্রত্যেকের মুখে ফুঁ দিতেই

তারা বেঁচে গেল। সবাই সেই হাঁড়িতে বসে খেতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি বড় আরবী ঘোড়ার মাংস সমস্ত খেয়ে তারা শেষ করল। আবার তারা গিয়ে যে যার শুয়ে পড়ল।

ফরিদ হাবসী মেয়েটিকে শুধোল, 'আপনি কে সত্যি করে বলুন, দোহাই আল্লার।'

হাবসী মেয়ে বলল, 'আমি আসলে একজন খোজা। নাম আমার বান্নু মোস্তাকিন, বাদসার হারেমে চৌকি দিই। সাতদিন বাদে আমার ছুটি হলে এই ছেলেদের এসে খাওয়াই আমি।'

'আপনি খোজা মোস্তাকিন? হ্যাঁ হ্যাঁ, চোখ দুটো সেই রকমই বটে কিন্তু তাহলে এই নারী বেশ?'

নকল স্তন দুটো খুলে ফেলল হাবসী।

'এবার চিনতে পারছি'—বলল ফরিদ।

'ফরিদ তোমার কাছে গোপন কথা বলি, আমি খোজা নই, আসলে একজন পুরুষ আর এইসব হারেমের অবৈধ সন্তানগুলো অবশ্য আমারই। এরা জানে আমি ওদের মা।'

ফরিদ হঠাৎ এক টান মেরে খোজার ঘাগরাটার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিলে, দেখলে সত্যিই সে পুরুষ! এবং জবরদস্ত পুরুষ।

তাহলে?

হা হা হা করে হাসতে লাগল হাবসী বান্নু মোস্তাকিন। ঘোড়ার মুণ্ডুটাকে আছাড় মারতেই সেটা জ্যান্ত ঘোড়া হয়ে গেল।

'যাও, কোনো কথা কাউকে বলবে না।' বলল হাবসী।

ঘোড়ায় উঠে ফিরে আসতে আসতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দাউ দাউ করে সেই হাবসীর চালাঘরটি পুড়ে যাচ্ছে।

তার মাথাটা ঘুরতে লাগল।

ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলো নগরে, তখন ভোর বেলা। দেখল, আসমা তখনো খাবার নিয়ে তার জন্যে বসে আছে সমস্ত বিনিদ্র রজনী পার করে।

দশ।

সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল আস্‌মা। হাসল সে।

ফরিদ তাকে কোলে টেনে আদর করল একটু। চুমো খেল ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে। বলল 'সারারাত আমার জন্যে রাত জেগে বসে আছ সোনার পাখি, তুমি তো খুব কষ্ট সহিষ্ণু। যার বউ হবে তাকে বড় সুখী করতে পারবে।'

আস্‌মা বলল, 'যুববাজ, আপনি আমার যে দহণজ্বালা দূর করেছেন তার তুলনায় এই রাত জেগে অপেক্ষা করা অতি তুচ্ছ ব্যাপার।'

খেতে বসে ফরিদ বলল, 'আমাকে যুবরাজ বললে হয়তো আগে খুশীই হতাম কিন্তু বাদশার হারেমের খোজা-সর্দার বানু মোস্তাকিনের আসল পরিচয় পাবাব পর আজ থেকে আমি আমার সঠিক জন্ম রহস্যের কথা বলতে পারি না।'

আস্‌মা বলল, 'সত্যি, জন্মরহস্য অন্ধকারের ব্যাপার, কেউই আমরা সঠিক নয় যতক্ষণ না পিতার চেহারাব লক্ষণ সমৃদ্ধ হই। তবে এটা ঠিক যে আপনি বাদশা জাহাঙ্গীরের পুত্র। তাঁর চেহারার লক্ষণগুলি আপনার চেহারাতেও এসেছে। সে যাক, সারাদিন আর মাঝরাত পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, কি করলেন বলুন।'

সমস্ত ঘটনাই বলল ফরিদ।

যখন অন্ধকার কেটে গেছে, সকাল হয়েছে, হঠাৎ আবার অন্ধকার হয়ে এলো। ঝড় উঠল। বৃষ্টি নামল ঝমঝম করে। জানালার জাফ্‌রিগুলো বন্ধ করে দিল আস্‌মা।

তারপর কাছে এসে বসল ফরিদের। তার শরীরটা মখমলের চাদরে ঢাকা দিয়ে মাথাটাকে কোলে নিয়ে বসল। তার চাঁপাকলি আঙুল দিয়ে ফরিদের সুন্দর চুলগুলোতে বিলি কাটতে লাগল।

নীলোফারের কথা স্মরণ হল ফরিদের। মনে হল, সে হজ্জে গেছে। এক সময় সেকথা সে জানিয়েছিল। কিন্তু হজের তো এক-মাস বাকি এখনো।

আস্‌মা বলল, 'জানেন, আব্বা দশটা উট কোরবানী দেবে এ বছর আমার রোগমুক্তির জন্য।'

ফরিদ আসমার চুল আঙুলে জড়াতে জড়াতে শুধোলে, 'আর তোমার সাদির সময়?'

লজ্জা পেল আস্‌মা। বলল, 'সে আপনিই জানেন!'

'কী রকম?'

'আব্বা বলেছে আপনার সঙ্গে নাকি আমার…'

'বলো বলো, থামলে কেন?'

'জানি না, যান! আপনি ঘুমোন।' উঠে পালাতে গেল আস্‌মা।

ফরিদ তার সুগঠিত কোমল গুরু নিতম্ব আঁকড়ে ধরে কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে চেপে ধরল।

আস্‌মার ভয়ানক লজ্জা পেল। ওকে কাতুকুতু দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর বলল, 'আগে সাদি হবে তারপর প্রেম, জানেন দুষ্টু!'

বৃষ্টি থেমে গেল। আস্‌মা তার বাপের ডাকে চলে গেল।

ফরিদ উঠে পড়ে ঘরদোর সম্পূর্ণ এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

দুপুরে তার ঘুম ভাঙতে খলিফা এসে বললেন, 'আস্‌মা আপনাকে কোনো আগন্তুকের কথা বলেছে?'

'কই না তো? কে এসেছিল, আমাকে খুঁজেছে?'

'ছদ্মবেশে আমার সরাইখানায় কাল সন্ধ্যায় যিনি কয়েকজন ইয়ার বন্ধু এনে কাওয়ালী গানের আসর জমিয়েছিলেন তিনি নাকি স্বয়ং বাদশাজাদা খুরম!'

'খুরম?'

'হ্যাঁ। আমার চর নবী খাঁ তাই বলেছে।'

'আর কি খবর?'

'আস্‌মাকে বাদশাজাদার চোখে পড়েছে। কাছে ডেকে তিনি তার হাতে নিজের গলার বহুমূল্য মুক্তোর মালা দান করে গেছেন। আস্‌মা ওঁদের খানাপিনা পরিবেশন করেছিল।'

ফরিদ একটা গোলাপ নিয়ে শুঁকল শুধু। কোনো মন্তব্য করল না। সে এখন নিরুপায়। খুরম তাহলে কি খোঁজ পেয়েছে বিয়েবাড়ি যাবার পর? তারও যে অনেক চর-অনুচর আছে।

আস্‌মাকে চোখে পড়ে থাকলে খুরম নিশ্চয়ই এখানে আবার আসবে। আস্‌মা মুক্তোর মালার কথা চেপে গেল কেন?

সেই মাটির ভাঙা কলসী জোড়া দেওয়া সৎ ব্রাহ্মণ আর ভৌতিক ক্ষমতা সম্পন্ন হাবসী বান্নু মোস্তাকিনের কথা অবিশ্বাস করে তাকে পাগল ভাবে নি তো আস্‌মা? ভাবে নি তো লোকটার মাথায় ছিট্ আছে। নতুবা এসব আজগুবি ব্যাপার সে দেখতে পায় কেমন করে? কিন্তু না, আস্‌মা বোধহয় তা ভাবেনি কেননা তার রোগমুক্তিও হয়েছে একটি অলৌকিক উপায়ে। রোগটা হয়েছিলও অলৌকিকভাবে।

এখন নীলোফার নেই যে তার যাদুব বলে খুরমের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার রাস্তা বাতলাবে আর এই অসামান্য সুন্দরী আস্‌মা এমন করে সারা হৃদয় জুড়ে বসলই বা কেন তার?

না, এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে একমাসের মধ্যে মক্কায় চলে যাবে সে। হজরতের সমাধির তলায় পড়ে থাকবে সে মদিনায় গিয়ে। জীবনভরের কৃত পাপের বোঝা নামিয়ে দেবে সে তাঁর পায়ে। কত পাপ, কত অপরাধ করেছে সে। আগামী দু'একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়বে। কোনো মোহ নেই তার রাজ্যপাটের। সুবাদার, মনসবদার, কিছুই হতে চায় না সে।

ঘোড়া নিয়ে আবার আজ বেরুতে গেলে কুঞ্জের মধ্য থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলো আস্‌মা। শুধোলো, 'কোথায় যাবেন?'

'দেখি, তোমার জন্যে একটা মুক্তোর মালা আনতে পারি কিনা।'

আস্‌মা লজ্জায় মাথা হেঁট করল।

শাহাজাদা খুরমের অপূর্ব কান্তি আর ধনুক বাঁকা ভুরু এবং সুদর্শন নাক যেন মুহূর্তেই তার মানসপটে ভেসে উঠল।

কিন্তু ফরিদের বক্ষপট আরো সুদৃঢ়। তার কাছে সে আজীবন ঋণী। তার বাবা নিয়াজী বলেছেন, 'যতদূর জানি মা, খুরমই ভবিষ্যতে সম্রাট হবেন। ফরিদ বড় জোর কোনো প্রদেশের শাসনকর্তা হতে পারেন। খুরমের চোখে পড়লে, মনে ধরলে, তুমি পাটরানী হতে পারবে।'

আস্মা বলেছে, 'কিন্তু আব্বা, ফরিদ আমার রোগমুক্তি না ঘটালে শাহাজাদা খুরমের স্বপ্ন কোথায় থাকত বলো!'

নিয়াজী বললেন, 'তোমরা মহিলা, একটু ভাবালু, দয়াবতী কিন্তু জটিলতা আছে, রাজনীতি আছে, তবে তুমি যা ভাল বোঝ, করো!'

আস্মা ফরিদকে বলল, 'মতির মালার মোহ আমার নেই, তবু কোনো সম্ভ্রান্ত মানুষ যদি খুশী হয়েই দেন, আমি কি তা ফেরত দিতে পারি? আপনার একটি ফুলের মালার মর্যাদা তার চাইতেও অনেক বেশি।'

'মর্যাদা কিন্তু মূল্য তো নয়।'

'কেন আপনি দ্বিধা করছেন, আমি আপনারই।'

'দেখ আস্মা, আমাকে তুমি কৃপা করবে এমন আমি চাইনা তোমার পথ আগলে ঠিক আমি দাঁড়িয়ে নেই। তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমার মঙ্গল চাই। আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। চিরকাল আমি অন্ধকারে ঘুরে বেড়াব। বাদশাদের এমন ঝরা ফসল মাঠে-ঘাটে কত পড়ে থাকে। খুরমের আমি শত্রু নই, সে আমাকে শত্রু বানিয়েছে। আমি দিল্লীর সিংহাসন চাই না। খুরম জানে না, আমি যে পীরচেঙ্গীকে অপমান করেছিলাম তাঁর অভিশাপে বাঁদর হয়ে গিয়েছিলাম; তাঁর মেয়ের দয়ায় অভিশাপ মুক্ত হই। তারপর আধ্যাত্মিক এক দর্শন আমার লাভ হয়; পবিত্র কোরআনের সমস্ত সূরা, সমস্ত আয়াত আমার নয়নগোচর হতে থাকে এবং তা আমার মুখস্ত না হলেও যখনই পড়তে চেষ্টা করি সেসব বহু বিচিত্র

বর্ণে বর্ণমালার পর বর্ণমালা ধরে হৃদয়ের পর্দায় ভেসে উঠছে দেখতে পাই। থাক, এসব কথা, আমার গুরু পীরচেঙ্গি এখন সমাধিস্থ। তাঁর দয়ায় আমি তাঁর পালিতা কন্যা নীলোফারের পাণি গ্রহণ করেছি। নীলোফার আমার মাথার মণি। তাকে হারিয়ে আমি এখন মণিহারা ফণীর মতো। পীরচেঙ্গির কবর জিয়ারত করবার জন্য আমি বেরুচ্ছি। এখন বিপদে আমার একমাত্র আল্লা ভরসা। পরে যদি আর দেখা না হয় জানবে আমি মক্কা এবং মদিনার পথে রওনা হয়ে গেছি। হয়তো আল্লা আমাকে সেখানেই মিলিত করবেন নীলোফারের সঙ্গে।'

'না, আমি আপনার পথ চেয়ে থাকব, আপনি ফিরে আসুন পীরের মাজার জিয়ারত করার পর। মক্কায় হজে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমার রোগমুক্ত নবলব্ধ পরীকন্যার মতো রূপলাবণ্য আমি কেমন করে গোপন রাখব? প্রতিদিন শত শত মানুষের ভিড় হচ্ছে সরাইখানায়। সবাই আশ্রয় চায় এখানে। ঘর চায়! যদি আপনার অনুপস্থিতি দেখে আপনার থাকবার ঐ ঘরটি শাহাজাদা খুরম বিলাসকক্ষ হিসাবে চেয়ে বসেন আর অনেক টাকা সালামী দেন তখন ঠেকানো যাবে কি করে? এরমধ্যেই তিনি বলে গেছেন, এই সরাইখানাটি বড় মনোরম। ওদিকের কোণার ঐ ঘরটিতে কে থাকে? আমি বলেছি একজন ভাবুক কবি। তিনি চমৎকার লিপিকার। মহৎ মানুষ।'

'আচ্ছা, যাই আমি! সরাইখানার সামনে একটা কিসের কোলাহল শোনা যাচ্ছে যেন।'

আসমা ফরিদের হাতখানা ধরে চুমো খেয়ে ছেড়ে দিল সজল হাসিভরা চোখে।

ফরিদ বেরিয়ে গেল ঘোড়া টগবগিয়ে।

॥ এগারো ॥

আস্‌মা সরাইখানার সদোরে এসে দেখল চৌদল থেকে নামছেন শাহাজাদা খুরম। হাতে তাঁর ফুটন্ত গোলাপ। উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য পোষাক। মাথায় রক্তবর্ণ উষ্ণীষ। রুপোর নক্‌সা করা নাগরা জুতো পায়ে। মুখে হালকা কালো কুচকুচে গোঁফ-দাড়ি। রুপোর পেয়ালায় সোনার জল বুলোনোর মতো অপূর্ব লাবণ্যময় তাঁর গায়ের রঙ। চৌদলের বাহক ছাড়া পাইক বরকন্দাজ আছে জন পঁচিশ।

নিয়াজী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে কুর্নিশ করতে করতে এগিয়ে আনলেন শাহাজাদাকে।

'আইয়ে হুজুর জাঁহাপনা, বান্দার দোষত্রুটি মাফ করবেন! আপনিই আমাদের ভবিষ্যৎ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এই গরিব সরাই-খানা আপনার পদধূলিতে ধন্য হল।'

আস্‌মা এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানাল।

শাহাজাদা না হাত বাড়িয়ে তাঁর কড়ে আঙুলটি ধরতে দিলেন। আস্‌মা তা ধরে বাবার ইংগিত মতো ফরিদের কামরাটার দিকে এগুতে লাগল। তার সৌভাগ্য যে এখন ফরিদ অর্থাৎ ভাবুক কবি বা লিপিকর নেই।

শাহাজাদা খুরম আলীসান হয়ে বসলেন। ঘরটির অপরূপ কারুকার্য দেখলেন।

ফরিদের ব্যবহৃত সমস্ত কাপড়-চোপড় দ্রুতহাতে সরিয়ে ফেলা হল।

হঠাৎ শাহজাদা খুরম উঠে পড়লেন। পায়চারি করতে লাগলেন। দেয়ালগুলোয় টোকা মেরে মেরে দেখলেন। মেঝেয় পা মারলেন। সন্দেহজনক কিছু পেলেন না।

আসমা পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে আড়চোখে তাকিয়ে শুধু একবার হাসল।

বাদশাজাদা মৃদু স্বরে শুধোলেন, 'পিয়ারী, তোমার সেই কবি না লিপিকার, তার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। আমিও কিছু কিছু কবিতা লিখি।'

আসমা তটস্থ হল। বলল, 'মাত্র কিছুক্ষণ হল তিনি…

তির্যক দৃষ্টি তুললেন খুরম!

'না, মানে, তিনি হজে বেরিয়ে গেছেন…

'কখন—পিয়ারী, কিছু যেন গোপন করতে চাও? ডাকো তোমার আব্বাজানকে। এই, কে আছো…?'

একজন সিপাই ঢুকল। কোষ থেকে তরবারী টেনে তুলে কুর্নিশ জানাল।

খুরম বললেন, 'এখনি পাখি উড়ে গেছে। গায়ের গরম এখনো এখানে বর্তমান। শীগগির যাও দশজন, বন্দী করে আনা চাই।… না, এখানে নয়। অন্য কোথাও। গোপনে।'

নিয়াজী আর আসমা সরবতের সরঞ্জাম নিয়ে এলেন। ফলমূল, পানীয় এলো। নিয়াজীও সঙ্গে খেতে বসলেন। কেননা, খাদ্য আগে গ্রহণ না করলে কোন্ বিশ্বাসে শাহাজাদা খাবেন? সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দুর্ভাগ্য ঘুরে বেড়ায়, অনেক সময়।

কুকুর বিড়ালকেও খাইয়ে দেখা হয় তাতে কোনো বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা।

শাহাজাদা খুরম সামান্য মাত্র ক্ষীর এবং সন্দেশ গ্রহণ করলেন।

'আপনারা আলাপ করুন'—বলে নিয়াজী সরাইখানার গদিতে চলে গেলেন।

খুরম বললেন, 'পিয়ারী, তুমি খুব সুন্দরী!'

'হুজুর, মেহেরবান, শাহাজাদার নেকনজর।' সলজ্জভাবে বলল আসমা।

'তোমার মুখ চোখ কাশ্মীরী মেয়ের মতন।'

'আমার মা ছিলেন কাশ্মীরের মেয়ে।'

'বহু মূল্যের এইসব গালিচা, তাকিয়া, সুজনী, কম্বল—এসব কি সেই লিপিকারের ?'

'জী হ্যাঁ।'

'তাঁকে কি খুব সুন্দর দেখতে ?'

আসমার চোখের পাতা কাঁপল বার কতক। মৃদু হাসল একটু। বলল, 'সুদর্শন সন্দেহ নেই, তবে লিপিকারের স্ত্রী ছিলেন, যাদুকরী তিনি। হঠাৎ কোথায় চলে গেছেন। তিনি তাঁর যাদুমন্ত্রবলে জীনের সাহায্যে পরীর দেশ থেকে 'গোলেনূর আক্সাম' নামক ফুল এনে আমাকে শোঁকাবার পর আমার রোগমুক্তি ঘটেছে। আগে আমার সর্বশরীরে প্রচণ্ড দহনজ্বালা ছিল। সারারাত আমি চিৎকার করতাম। আমার কুৎসিত রূপও সেই ফুলের ঘ্রাণে অন্তর্হিত হয়ে এই লাবণ্য এনেছে।'

'তোমার যৌবন, গঠনভঙ্গিমা রূপ-লাবণ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে সুন্দরী। ভূ-ভারতে তোমার মতো আর কোনো রূপ-লাবণ্যবতী আছে বলে আমার জানা নেই। এসো, পিয়ারী, কাছে এসো'—খুরম সপ্রেমে দক্ষিণ হস্তটি বাড়ালেন আসমার দিকে।

আসমা একটু দ্বিধা করল প্রথমে। ফরিদের কথা তার মনে পড়ল। তবু রূপবান শাহাজাদার আহ্বান সে প্রত্যাখান করতে পারল না। কাছে এলো। খুরম বাহু বেড় দিয়ে তাকে ধরলেন। নিজের কোলের ওপর বসালেন। হাতের গোলাপটি আস্মার নাকের সামনে ধরলেন। ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে আলতো ঠোঁট দুটি দিয়ে চুম্বন করলেন আসমার পদ্মকোরক সদৃশ চক্ষু দুটিতে। বললেন, 'পিয়ারীআস্মা, তুমি আমার দীলরুবা হবে, প্রেমিক হবে ?'

'হুজুর মেহেরবান'—বলে ঠিক সেই সময় পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন নিয়াজী, দৃশ্য দেখে জিভ কেটে মাথা হেঁট করে চলে যেতে গেলেন।

খুরম ডাকলেন, 'আসুন নিয়াজী, আপনার কন্যা নিশ্চয়ই

ভাগ্যবতী হবে। কি খবর বলুন, মনে হচ্ছে আপনি খুব উদ্বিগ্ন, কিছু বলতে চান ?'

'জী হুজুর, আপনার সৈন্যরা নাকি নিহত হয়েছে, একজন আহত সৈনিক সরাইখানার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে একপাত্র পানি খাবার পরই তার দম ছুটে গেল, বলল, শাহাজাদা এক দস্যু সর্দারকে পাকড়াও করে আনতে পাঠিয়েছিলেন আমাদের, সবাই আহত-নিহত হয়ে মরলাম। আপনার সেনা-সর্দারের ঘোড়াটিও পাগলের মতো চিঁহি চিঁহি শব্দ করে ঐদিকে ছুটে বেরিয়ে গেল...'

খুরম উঠে দাঁড়ালেন, ফুল শুকতে শুঁকতে পায়চারী করতে লাগালেন, বললেন, 'দস্যু সর্দার একাই আমার বাছাই করা সেপাইদের দশজনকে নিহত করল, আশ্চর্য !'

'দস্যু সর্দারটি কে হুজুর ?' শুধোলেন নিয়াজী।

'উঁ, না, সে একজন। আচ্ছা, আমি এখন আসছি। আসমা, তোমার কথা আমার মনে থাকবে।' আচকানের পকেটে হাত গলিয়ে দুটি সোনার মোহর বার করে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে দিলেন নিয়াজীর দিকে। নিয়াজী তা লুফে নিলেন।

শাহাজাদা খুরম তাঁর বাকি কয়েকজন অনুসঙ্গী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যখন নিমেষেই বেরিয়ে গেলেন, হঠাৎ পাশের কামরার পর্দা সরিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঢুকল ফরিদ। ছিন্নবেশ। রক্তাক্ত তার শরীর। বাঁ হাতখানা চামড়ায় ঝুলছে শুধু! তার অবস্থা দেখে আসমা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, 'আলীজা, এই অবস্থা আপনার !'

'এক চুমকি পানি দাও !' ক্লান্ত ফরিদকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে মুখে ধরল তার আসমা।

ফরিদ তা পান করার পর বলল, 'কেন আমার শত্রুতা করছে খুরম ! তার দশজন সৈন্যকেই আমি ঘায়েল করেছি। সাতজন

ময়দানে পড়ে আছে। খুরম কখন গেল? তোমাকে খুব প্রেম-সম্ভাষণ করে গেল বোধহয়?'

'আপনি ক্লান্ত, আমি হাকিম ডাকাচ্ছি।' আসমা দোর এঁটে দিল।

'ব্যস্ত হয়ো না, নিয়াজী এখন আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন আঃ! আজ যদি আমার নীলোফার থাকত। অন্তরের পর্দায় আমার পবিত্র কোরআন খোদিত আছে। আমাকে মারা সহজ হবে না আল্লার কৃপায়, তবে দুর্ভোগ হচ্ছে বোধহয় পীরের যে শিক্ষা তা অজ্ঞানে পালন করিনি বলে। আব্বাজান, পীরচেঙ্গি আমাকে ক্ষমা করো। উপকার করার পর আমি যার উপকার করেছি তাকে উপভোগ করার আকাঙ্খার পাপে অভিযুক্ত বলেই বোধহয় এই শাস্তি হল। আসমা, তোমার গায়ে সেই ছলনাকারী কাম-পরায়ণ হরিণের গন্ধ…আমাকে ক্ষমা করো… উঃ! কী যন্ত্রণা! যদি আমার উপকার করতে চাও তাহলে সেই সৎব্রাহ্মণ কৃষকের কাছে নিয়ে যাও…আর হতভাগ্যকে ভালোবেসো না…আমি এই নরক নগরী থেকে চলে যাব…।'

ফরিদ কথা বলতে বলতে যন্ত্রণাকাতর হাতে আসমাকে ভীষণ-ভাবে আকর্ষণ করছিল। আসমা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। বিহ্বল আর উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে। এখন হঠাৎ ফরিদ অজ্ঞান হয়ে যেতেই সে কাঁদতে লাগল নীরবে। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। কিন্তু ফরিদের যখন জ্ঞান ফিরল না সে তার বাবার স্মরণ নিল। নিয়াজী এসে দেখে গোপন ঘরে তাকে সরিয়ে ফেলে বললেন, 'মা, এঁকে নিয়ে কি করা যায়! হাকিম ডাকলে কানাকানি হয়ে ফাঁস হয়ে যাবে। প্রাণ যাবে আমাদের! বরং এঁকে এই অজ্ঞান অবস্থায় দরিয়ায় ফেলে দেবার ব্যবস্থা করি এসো…'

'না আব্বা, তা হয় না।'

'তাহলে তোমার পথ পরিস্কার হয়ে যাবে, রাজকুমার খুরম তোমার প্রণয়াসক্ত…'

'বিশ্বাস কি তাঁকে এবং...

'এবং কি করতে চাও তুমি ?'

'আল্লা যদি এঁকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখেন, রাত্রে আমি একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে এক পৌত্তলিক ব্রাহ্মণের কাছে নিয়ে যাব— যিনি কৃষিকাজ করেন নগরের পূর্বপ্রান্তের পাহাড়ী উপত্যকার মধ্যে।'

'যা খুশী করো, তবে সাবধান! রাজ্যেও খুব গণ্ডগোল! বাদশা নিজে কিছুই দেখেন না। রাণী নূরজাঁহাই সর্বেসর্বা, বোধহয় যুবরাজ খুরম কিছুদিন পরেই সিংহাসনে বসবেন। তাঁর শত্রুকে আমরা প্রশ্রয় দিয়েছি জানতে পারলে কি আমাদের মঙ্গল হবে মা? প্রাণের দায়ে মানুষ প্রাণাধিক পুত্রকেও তো বন্যার স্রোতে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রাণরক্ষা করে।' নিয়াজী চলে গেলেন। সরাই-খানার টাটে বসলেন গিয়ে।

আসমা ফরিদের সেবা করল সারাদিন। জ্ঞান ফিরল তার অবেলার দিকে। রাত নামতে একটি ঘোড়ার গাড়ি আনিয়ে তার মধ্যে ফরিদকে টেনে তুলল নিজেই। কাটা জায়গাগুলো সে তুলো দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল কিন্তু নাড়াচাড়াতে আবার রক্ত বের হতে লাগল। কোচমানকে বলল, 'তুমি এখন যেতে পারো, সকালে এসে তোমার ঘোড়া আর গাড়ি এবং নজরানা নিয়ে যেও।' কোচমান চলে গেল খৈনী ডলতে ডলতে।

পুরু কালো পোষাক পরে মাথায় ফেটি জড়িয়ে কোচমান হয়ে আসমা ঘোড়ার গাড়ি ছুটিয়ে চলল নগরের পথ দিয়ে।

আলো-অন্ধকারের পথে ধাক্কা মারল এর ওর গায়ে আনাড়ী হাতে ঘোড়াকে চাবুক হেনে। লোকজন চেঁচাল। হৈহল্লা করল। পাগল বলল।

শেষে নগর পারের পূর্বপ্রান্তে চাঁদের আলোয় ভাসা ময়দানে তার গাড়ি চলতে লাগল। পাহাড়ী উপত্যকায় এসে দেখল সবুজ কৃষিক্ষেত।

টিলার ওপর মশাল জ্বলছে।

নেমে পড়ল আসমা। ফরিদকে দেখল। আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে সে কখন। টিলার কুটির পর্যন্ত আর গাড়ি যাবে না দেখে তলোয়ারটা হাতে নিয়ে একাই চলতে লাগল আসমা। পাহাড়ী শিয়াল ডাকছে দূরে। নেকড়েও হতে পারে! এই ময়দানে যুদ্ধ হলে ওরা লাশ টেনে নিয়ে যায়।

টিলায় এসে আসমা দেখল ব্রাহ্মণ লোকটি মশালের আলোয় নিচু হয়ে বসে পালকের কলম দিয়ে তালপাতায় কি যেন লিখছেন।

'কে তুমি, কি চাই?' শুধোলেন তিনি কাছে যেতে।

'আপনার শরণাপন্ন বাবা! শাহাজাদা ফরিদ গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। তিনি আপনার কাছে তাঁকে আনতে বলেছিলেন।'

'তুমি কে?' ধমকের সুরে বললেন ব্রাহ্মণ।

'আমি, মানে, আমি একজন...।'

'ছদ্মবেশী। এবং নারী। বসো তুমি এখানে। রূপা, তোরা সবাই যা তো, আহত ফরিদকে নিয়ে আয় আমার কাছে।'

আসমা তাজ্জব হয়ে দেখল, একুশজন মেয়ে তাদের হাতের মশাল জ্বেলে নিয়ে টিলার নিচে দেবদারু বনের মধ্যে দিয়ে নেমে গেল।

কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরে এলো ফরিদের শরীরখানাকে বয়ে নিয়ে, শুইয়ে দিল ঘাসের ওপরে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিচু হয়ে পড়ে সব দেখলেন। তারপর তাঁর মন্দির থেকে একটি কালো কুঁজো বার করে এনে তা থেকে তরল উগ্রগন্ধযুক্ত কি আরক বার করে ফরিদের দেহের ক্ষতস্থানগুলোতে মাখাতে মাখাতে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন।

আশ্চর্য হয়ে আসমা দেখল, ফবিদ জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাকাচ্ছে। তাব দেহেব সমস্ত ক্ষতস্থান জুড়ে গেছে। চামড়ায়-ঝুলতে-থাকা হাতটিও জুড়ে গেল। এতো ভৌতিক কাণ্ড!

বৃদ্ধের পায়ে হাত দিল ফরিদ।

রূপা মাটির পাত্রভরা পানীয় এনে দিলে বৃদ্ধ তা পান করতে অনুমতি দিলেন।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল ফরিদ। দুজনে বিদায় নিয়ে যখন ঘোড়ার গাড়িতে এসে বসল চাঁদ তখন একখণ্ড কালো মেঘে ঢেকে গেছে।

ফরিদ বলল, 'তোমার রোগ-মুক্তির কৃতজ্ঞতা শোধ হল আসমা। এখন তুমি মুক্ত। তুমি এবার এই গাড়ি নিয়ে সরাইখানায় ফিরে যাও। আমি এখন ফকির বেশে এই দেশ ছেড়ে চলে যাব মক্কার পথে।'

'আমাকে তুমি নিয়ে যাও ফরিদ, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'না, তা সম্ভব নয়। তোমার রূপযৌবন আগলাতে আগলাতে আমার সময় চলে যাবে: আল্লাকে ডাকার আমি সময় পাবো না। নীলোফারের দেখা আমাকে পেতেই হবে, তার দেখা না পেলে আর আমি এই হিন্দুস্থানে ফিরব না। তুমি যাও, লক্ষ্মীটি!'

আসমা ফরিদের হাত ধরে মুখে চেপে কাঁদতে লাগল। বলল, 'তুমি যদি এমন ভাবে আমাকে ত্যাগ করে যাবে তবে কেন এই রূপলাবণ্য দান করলে? আবার আমাকে অভিশাপ দিয়ে কালো কুৎসিত করে রেখে যাও। যুবরাজ খুরম যেন ঘৃণায় আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। ফরিদ তুমি চলে যেও না, গেলেও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, নইলে আমরা অসহায়, খুরমের মতো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি ঠেকাতে পারব না। তাঁর সৌন্দর্য দেখে আমি বিহ্বল হয়ে যাই! বলতে লজ্জা পাচ্ছি, তিনি আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে গোলাপের ঘ্রাণ দেবার পর আমার এই দুটি পাপ চোখের ওপর যখন থেকে চুম্বন করেছিলেন ঠিক তারপর থেকেই চোখ দুটি আমার জ্বালা করছে। জানি না আমি অন্ধ হয়ে যাব কিনা।'

'যদি অন্ধ হয়ে যাও, আতুর হয়ে যাও, আল্লাকে শুধু ডেকো। নীলোফারের দেখা পেলে আমি আবার আসব। আবার তোমাকে আমি রোগমুক্ত করব—যাই আমি আসমা।'

॥ বারো ॥

প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত প্রতীক্ষা করে করে ক্লান্ত, অবসন্ন, হতাশ হয়ে পড়ল আসমা—দীর্ঘ দশদিন দশরাত কেটে গেল কিন্তু তবু আর এলো না ফরিদ।

আয়নার সামনে চুপচাপ এলোচুল মেলে প্রায় বিবসনা হয়ে অন্যমনে বসে থাকে আসমা। সরাইখানার কোনো খোঁজ-খবর ও রাখে না। শুধু কর্মচারীদের খবর দেওয়া আছে ফরিদ যদি আসে তখনি যেন তাকে সংবাদ দেওয়া হয়।

আসমা লিপি চাতুরীতে ওস্তাদ ছিল। কৈশোরে সে এক মুন্সীজীর কাছে লিপি চিত্রণ এবং পট অংকন করতে শিখেছিল। গান গাইতে শিখেছিল। এস্রাজ তানপুরা নিয়ে মাঝে মধ্যে বসত সে। আর ইচ্ছে মতো যার-তার ছবি আঁকত। ফরিদের সে ছবি এঁকেছে এই ক'দিনের অবসরে।

নিয়াজী এক সময় পা পা করে তার ঘরে এসে ঢুকলেন। মেয়েকে গভীর অন্যমনস্ক দেখলেন। ফরিদের পটখানার দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁধে হাত রাখতেই মেয়ে চমকে উঠল।

নিয়াজী বললেন, 'নাওয়া-খাওয়া কি ত্যাগ করলে মা? শরীরের ওপর অত্যাচার করছ। চোখের কোণ তোমার বসে গেছে। মাথার চুলে জট পড়ল। ওঠো মা, কিছু খাবে চলো। ফরিদের কোনো খবর পেলে?'

নীরবে মাথা নাড়ল আসমা।

'ছবিখানা বেশ হয়েছে, ফরিদকে চেনা যায়। কিন্তু মা, এটা তো ওর সাধারণ যৌবনের ছবি। চোখের দৃষ্টিতে কই ওর অন্যকিছু, যা

বোঝা যায় না—সাধারণ বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে স্থির অথচ সন্ধানী চোখ ওর যেন কোনো অপ্রত্যাশিতকে খুঁজে বেড়ায়।'

'ঠিক আব্বাজান, তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ। যে মানুষ সাধারণ, যাকে সহজে বোঝা যায়, দুর্জ্ঞেয় নয়—তা যেন শিল্পীর চোখে এমন কিছু নয়। তুমি যত সহজে ওর চোখ দেখেই চিনেছ আমি হয়তো দেখিনি। দেখেছি যুবরাজ খুরমকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল কথা, বাদশা শুনছি খুবই অসুস্থ। রানী নূর-জাঁহার সঙ্গে খুরমের খুব মনোমালিন্য—হয়তো সিংহাসনে অন্য কেউ বসবেন। যতদুর ধারণা খুরমই—তবু এমন অস্থির সময়ে হঠাৎ সংবাদ পেলাম তিনি আসবেন আজ সন্ধ্যায় আমার গরিবখানায়। মা, তুমি মন শক্ত করো, ভাবালু হয়ো না।'

আসমা বলল, 'আমি অসুস্থ, তুমি বলে দিও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমার চোখ দুটো জ্বালা করেছে কেবলই, পানি ঝরছে—খুরম এই চোখ স্পর্শ করার পর থেকে এই ঘটনা ঘটেছে।'

কথা শুনে সন্দিগ্ধ হলেন নিয়াজী। তবু বললেন, 'দেখ মা, তুমি যেমন বুঝবে তাই করো। তবে আপ্যায়ণের যেন ত্রুটি না হয়।'

'ঠিক আছে, তুমি কিছু ভেবো না।'

নিয়াজী চলে যাবার পর আস্‌মা গোসলখানার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে বসন মুক্ত হয়ে তার অঙ্গশ্রী দেখতে দেখতে স্নান করল। সুগন্ধি তেল মাখল। বাইরে এসে চুল ঝেড়ে শুকনো করল লতাকুঞ্জের রোদদুরে দাঁড়িয়ে। তারপর খেয়ে নিয়ে সাজগোজ করে নিলে। ফরিদের ঘরখানা সাজিয়ে দিলে ফুল দিয়ে।

তারপর দীপমালা জ্বেলে তানপুরা নিয়ে এসে বসল সে। যখন সে গভীরে তান ধরেছে যুবরাজ খুরম এসে পর্দা ঠেলে ঢুকলেন নিয়াজীর সঙ্গে।

আসমা উঠে পড়ে কুর্নিশ করল। বলল, 'বসুন যুবরাজ, আশা করি আপনার শারীরিক কুশল।'

'তুমি বসো সুন্দরী, গান শোনাও আমাকে।' যুবরাজ খুরম বসলেন তাকিয়া ঠেস দিয়ে।

নিয়াজী চলে গেলেন।

খানাপিনা এসে গেল।

যুবরাজ বিনা দ্বিধায় আজ কিছু কিছু খাবার খেতে লাগলেন।

আসমা গান গাইতে লাগল।

খুরম খুশী হলেন গান শুনে। প্রশংসা করলেন কণ্ঠস্বরের।

আসমা বলল, 'সংবাদ পেলাম আপনি যেদিন এখানে আসেন আপনার সৈন্যরা অহেতুক প্রচণ্ডভাবে আহত করেছে হজযাত্রী লিপিকারকে, যিনি সেদিনই আমাদের এই সরাইখানা থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি তা জানেন এবং তা আপনার হুকুমেই ঘটেছে?'

'সুন্দরী, তুমি কি রাজনৈতিক ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাইছ, না নিছক তোমার কৌতূহল?'

'গরিবের মেয়ের রাজনীতিতে প্রয়োজন নেই, শুধুই কৌতূহল। লিপিকার কি আপনার শত্রু? অথবা তাঁর আসল পরিচয় কি?'

'সে একজন ঠগ, জোচ্চোর, বদমাস। বাদশার হারেমে তার জন্ম ঠিকই কিন্তু বাঁদীর গর্ভে—যার নাম গুলনার।'

আসমা বলল,'যাই হোক, জন্মের জন্য কেউ দোষী নয় জাঁহাপনা কিন্তু আপনার জানা উচিৎ, আমার যতদূর ধারণা লিপিকার আপনার শত্রু নন।'

'অন্য কিছু বলো—এসব আলোচনা থাক।' বিরক্ত হয়ে বললেন খুরম। হাতের গোলাপটি তিনি শুঁকতে লাগলেন। তাঁর তির্যক চোখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আসমা হাসল একটু।

খুরম রূঢ়স্বরে বললেন, 'বরং জানাতে পারলে খুশী হব সেই ছেঁড়া বস্তাটাকে তাপ্পি মেরে এখন কোথাও নিজেদের অন্দরের গোপন কোনো গুহার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছ কিনা।'

'জাঁহাপনা!' আহত হল আসমা।

'প্রত্যেকটি কাঁটা আমি সরিয়ে ফেলতে চাই, প্রত্যেকটি ইট সরিয়ে ফেলা হবে এই সরাইখানার...'

ক্রুদ্ধ খুরম আস্‌মার হাতখানা ধরে টান দিলেন, বুকের কাছে টেনে এনে অধরে অধর দিলেন।

পায়ের কাছে বসে পড়ল আসমা। বলল, 'হুজুর, জাঁহাপনা, গোস্তাকি নেবেন না। অজান্তেই আমরা সেই লিপিকারকে আশ্রয় দিয়েছিলাম কিন্তু তাঁর লিপিচাতুরীতে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আপনি দেখুন সেসব।'

আসমা খুরমের হাত ছেড়ে দিয়ে আলমারীর মধ্য থেকে একটি চিত্রপট আর পুস্তিকা বার করে এনে দেখাল।

খুরম দেখলেন তাঁর নিজেরই চিত্রপট, অপূর্ব সুন্দর! তিনি মুগ্ধ হলেন। বললেন, 'কে এঁকেছে, ফরিদ?'

'জী হাঁ! আর এই কবিতাগুলি পড়ে দেখুন।'

'বাহারে ছেলে! তাহলে তুমি বলছ যে সে আমার শত্রু নয়?'

'আমি পবিত্র কোরআন স্পর্শ করে বলতে পারি তিনি আপনার শত্রু নন। তিনি পীরচেঙ্গির দোয়া লাভ করেছেন যদিও তাঁকে অপমান করে অপমানিত হয়েছিলেন। এখন তাঁর রাজ্য-পাটে কোনো লোভ নেই!'

'সে যে আহত হয়েছিল! আহা! কোথায় আছে সে এখন বলতে পারো?'

'আল্লা জানেন, এখন কোথায়! তবে এতদিনে তিনি বোধ হয় হিন্দুস্থান ত্যাগ করে চলে গেছেন।'

খুরম স্তব্ধ চোখে স্থির হয়ে বসে রইলেন। ইসারা করে কবিতা পড়তে বললেন।

আসমা তার নিজের লেখা কবিতাগুলি পড়তে লাগল। যা সে মিথ্যে করে বলেছে ফরিদের লেখা বলে।

'নীল চোখ বাজপাখি
নখে তার বজ্রতীক্ষ্মধার

ডানা ছিল দিগন্ত বিসারী
পর্বতের চূড়ায় ছিল তার বাসা
আদিম ক্ষুধায় সে ছিল হিংস্র
একদিন ছোঁ মেরে আনল একটি
সিংহশাবক।
সিংহশিশু বলেছিল, আমি
অপারগ
তাই অত্যাচার করছ।
বাজপাখি বলেছিল, আমার
আহার দরকার,
তুমি এখন আমার খাদ্য।
সে তাকে খেয়ে ফেলল
কিন্তু তার নাড়ীতে জড়াল
পাখির পা দুটো
কিছুতেই ছাড়াতে পারল না
চূড়ায় যত রোদ পেল তন্তু গেল
শুকিয়ে
বাঁধন হল শক্ত।
বাজপাখি তবু উড়ল
ঝড় উঠেছিল তখন আকাশে
ক্লান্ত ডানা কিন্তু বাঁধা
দুটো পা
বসতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল
পর্বতের নিচে
সিংহ আর সিংহী তাকে ধরল
থাবা মারল মুখে
দেখলে শাবকের লুতাতন্তু তার
পায়ে

বলল, ক্ষমতার অপব্যয়কারী
এবার তুই আমাদের আহার।
তারা তাকে টুকরো টুকরো
করে ছিঁড়ল
খেল আর পালক উড়িয়ে দিল।
সেই রক্তাক্ত পালক
উড়তে উড়তে
আকাশের গায়ে লিখে দিল ঃ
অত্যাচার হল নিজেরই
নিক্ষিপ্ত শর,
ফরিদ তুমি নির্লোভ হয়ে এখন
যাত্রা করো মহামানবের
তীর্থে।'

কবিতাগুলি শুনবার পর খুরম যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কোনো মন্তব্য না করেই ধীরে ধীরে বের হয়ে গেলেন। কোনো জবাব দিয়েও গেলেন না, ঘোড়ায় চড়লেন গিয়ে সম্বিতহারার মতো। তারপর চলে গেলেন।

আসমা হাসল একটু। অজানা এক পুলকে তার যেন নাচতে ইচ্ছে করল।

এই ভাবান্তর কি কাজে লাগবে তার ?

অথচ রক্তমাংসের ক্ষুধা তাকে বার বার বলছিল, তুমি তো খুরমের যৌবন নিয়ে খেলা করতে পারতে, সুখ পেতে, শিহরিত হতে···তবে তবে···তবে···কিন্তু পাগলের মতো শুধু তানপুরা বাজাতে লাগল আসমা।

॥ তেরো ॥

বাদশা জাহাঙ্গীর অসুস্থ। পালঙ্কে তাকিয়া ঠেস দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসে আছেন। এইমাত্র হেকিম চলে গেলেন।

শাহরিয়ার এসে কুর্নিশ করে বলল, 'আব্বাজান, আপনি কি আমাকে ডেকেছিলেন?'

'ডেকেছিলাম? কই না তো। বসো, বোধ হয় সম্রাজ্ঞী তোমাকে এত্তেলা দিয়েছেন। ভাল কথা, রাজ্যের খবর কি? খুরম দাক্ষিণাত্যে গেছে, তার শ্বশুর আসফ খাঁ আর সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ তার দিকেই। তোমার আম্মাজানই এখন গোটা হিন্দুস্থানের সর্বেশ্বরী। আমি অসুস্থ, খোদা জানেন তোমাদের দুই ভায়ের সম্পর্ক কি দাঁড়াবে।' অনেকটা কথা বলার পর ক্লান্তি-বোধ করলেন বাদশা জাহাঙ্গীর।

শাহরিয়ার বলল, 'আব্বাজান, রাজ্য এখন সুশৃঙ্খল। কান্দাহার আর বঙ্গদেশ জয় আপনার অতুল কীর্তি—সম্রাট আকবরের রাজ্য-জয়ের নীতি আপনি নিজের হাতে রূপ দিয়েছেন। আমি সিংহাসনে বসলে আপনার সেই নীতিকেই শিরোধার্য করে সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃত করব।'

'খুব ভাল কথা, এই যে মহারানী, এসো।'

সম্রাজ্ঞী নুরজাহান বঙ্গদেশের দামী মসলিন শাড়ি পরে প্রচুর জড়োয়া অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে এসে বসলেন, বললেন, 'আমি চাই ঐ অবাধ্য খুরম দক্ষিণ ভারতেই পড়ে থাকুক। শাহরিয়ার, তুমি আমার অমতে কোনো কাজ করবে না। খুরম যদি হঠাৎ বিদ্রোহ করে, যেমন এক সময় করেছিল খসরু—তুমি তাকে দমন করবে।

সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ যদি তোমাকে সাহায্য না করে তাকে আমি দোজখে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। আচ্ছা ভাল কথা, ফরিদ কোথায় এখন? কোনো খবর রাখো কি?'

শাহরিয়ার বলল, 'না, তার কোনো সংবাদ পাইনি। তবে সে ছদ্মবেশে দিল্লীতে এসেছিল।'

বাদশা বললেন, 'পীরচেঙ্গিকে অপমান করার পর তাকে রাজধানীর বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। খুরম তার বড় শত্রু। পীরচেঙ্গিই বা আর আসছেন না কেন?'

নূরজাহান বললেন, 'শুনেছি, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। হ্যাঁ, শোনো শাহরিয়ার, ফরিদের সাক্ষাৎ বা সংবাদ পেলে আমাকে জানাবে। কান্দাহারের সুবাদার করে তাকে আমি কাবুল পাঠাতে চাই। সেখানের সুবাদার ঠিক বিশ্বাসী হয়ে কাজ করছে না। অদূর ভবিষ্যতে কান্দাহার চলে যেতে পারে। ফরিদ থাকলে মধ্য এশিয়ার উজবেক বা বলখ রাজ্য জয়ের চেষ্টা করতে পারে—যেখান থেকে মোগলরা এসেছিলেন হিন্দুস্থানে। সম্রাট বাবরের পিতৃস্থান ফরগানা রাজ্যও উদ্ধার করা দরকার। আমার বিশ্বাস খুরম এসব পারবে না। তার চরিত্রে দৃঢ়তার চাইতে বিলাস বাহুল্যই বেশি!'

বাদশা রসিকতা করলেন, 'বাবার হাত রেখেছে।'

নূরজাহানও একটু হাসলেন। কটাক্ষ হানলেন বাদশাকে। শাহয়িয়ার মাথা নিচু করে নিলে। বলল, 'তাহলে এখন আসি।'

নূরজাহান হাত তুললেন।

শাহরিয়ার বাইরে এসে হঠাৎ দেখলে মহব্বৎ খাঁ উন্মুক্ত তরবারীর ঔজ্জ্বল্য দেখছেন আর পায়চারি করছেন। হঠাৎ তাকে দেখে বিনয়ের অবতার সেজে মাথা নুইয়ে বললেন, 'বন্দেগী হুজুর, জাঁহাপনা হলেন অধমের ভবিষ্যৎ নিয়ামক, আশা করি, বাদশা আজ সুস্থ আছেন?'

'হ্যাঁ তিনি সুস্থ। অসুস্থতার খবর খুরমকে কি আপনি খুব তাড়াতাড়ি সরবরাহ করতে চান?'

'সম্রাজ্ঞী যেমন সংবাদ আমাদের দেবেন।'

'খুরমকে সংবাদ পাঠাবেন না বা তার সঙ্গে যুক্তি এঁটে তাকে যেন এসময় বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করবেন না। তাহলে তার দশা আমার বড় ভাই খসরু আর সেজোভাই পারভেজের মতোই হবে। শুনুন, ফরিদ কোথায় জানেন?'

'ফরিদ? খুরম তাকে হত্যা করেছে। সে ছদ্মবেশে দিল্লীর এক সরাইখানায় এসে উঠেছিল। সে নাকি আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপ জানে। একটি রমণীকে নিয়ে নিয়াজীর সরাইখানায় থাকত। কয়েকজন সৈন্য পাঠিয়ে পথের মধ্যে তাকে নাকি খুরম নিহত করেছেন।'

'এতে আপনারও হাত ছিল?'

'না যুবরাজ, তবে এসব সংবাদ সরাইখানার মালিক বা তার অসামান্য সুন্দরী কন্যা আসমা বলতে পারে।'

'হ্যাঁ, বাদশার হারেমেও নাকি এমন সুন্দরী কেউ নেই, যুবরাজ খুরম বলেছেন নেহাৎ আমার শ্বশুর খাঁ সাহেব চটবেন, তাই—নইলে সরাইখানার মালিকের কন্যাটিকে আমি আমার বেগম করতাম, হা-হা-হা...'

মহব্বৎ খাঁও হাসলেন।

শাহরিয়ার তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়ে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে এসে হাজির হল নিয়াজীর সরাইখানায় সামনে।

নিয়াজী ছুটে বেরিয়ে এলেন, আভূমি প্রণত হয়ে কুর্নিশ জানাতে লাগলেন।

শাহরিয়ার কোনো কিছু না বলে ঘোড়া থেকে নেমে নিয়াজীর হাত ধরে সরাইখানার মধ্যে চলে এলো।

ফরিদের কামরায় তাকে বসানো হল। শাহরিয়ার বললে, 'আশা করি আপনাকে আমি একজন বিশ্বাসী প্রজারূপে পাব?'

'জী হাঁ, ছোট যুবরাজ! জানি আপনিই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সম্রাজ্ঞী মা-জননীর আপনিই এখন দক্ষিণ হস্ত। আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—আমরা সবাই আপনার গুণগ্রাহী প্রজা।'

'শুনেছি ফরিদ এখানে ছিল। তার খবর কি? আপনার মেয়ে আসমাকে ডাকুন। ফরিদের সঠিক সংবাদ দিতে পারলে ইনাম পাবেন। তাকে কান্দাহারের শাসন কর্তা করে পাঠাতে চান সাম্রাজ্ঞী। ফরিদ জীবিত না মৃত, উত্তর দিন!'

নিয়াজী বললেন, 'হুজুর, এ বিষয়ে আমার যতদূর জানা আছে তিনি জীবিত আছেন, তিনি হিন্দুস্তান ছেড়ে চলে গেছেন।'

শাহরিয়ার বললে, 'ফরিদ যদি ছদ্মবেশে এখানে থাকত তাকে হত্যা করত।' নিয়াজীর পাশে এসে দাঁড়ানো আসমাকে দেখতে দেখতে বলল, 'কোনো গুপ্তচর মনে করত।—তার তাহলে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে! পারশ্য রাজ শাহ আব্বাস কান্দাহারের ওপরে চোখ ফেলেছেন। খুরম এখন দক্ষিণাত্যে। পিতা অসুস্থ। কান্দাহার হাতছাড়া হয়ে যাবে—ফরিদ নেই অথচ আমিও এই দুঃসময়ে রাজধানী ছাড়তে পারি না।'

আসমা বলল, 'না, আপনি যাবেন না।'

হঠাৎ শাহরিয়ার বলল, 'তুমি কি আমার জীবনে আসবে?'

'আসব জাঁহাপনা, শুধু যুবরাজ ফরিদকে ফিরতে দিন। আপনি সিংহাসনে বসলে তিনি ফিরবেন। তিনি আপনাকে ভালবাসেন।'

'হ্যাঁ, ফরিদের সঙ্গে আমার দোস্তি ছিল খুব। আচ্ছা, তাকে কি তুমি বাকদান করেছ?'

'কতকটা তাই হুজুর।'

'ঠিক আছে। সে ফিরুক। তবে যদি সে ফকির-দরবেশ হয়েই যায় তুমি আমাকে অনুগ্রহ করো।'

'কি বলছেন ছোট শাহাজাদা, আপনিই আমাকে অনুগ্রহ করবেন।'

শাহরিয়ার আসমার হাতখানা ধরে প্রেম ভরে চুম্বন করল। তারপর অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল। বলতে লাগল, 'খুরম বিদ্রোহ করতে পারে! আহম্মদ নগরের আংশিক বিজয় সফল হলেও হাবসী মন্ত্রী মালিক অম্বর বিরোধী! কাংড়া দুর্গ বিজয় করে পিতা অতুল

কীর্তি অর্জন করেছেন ঠিকই কিন্তু আহম্মদ নগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয়লাভ করা দরকার। মেবার হু'বার জয় করা গেল না, খুরম গিয়ে অমর সিংহকে পরাজিত করেছে। রাজপরিবার থেকে মেয়ে পাঠাতে হবে না আর রাজপুতদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে খুরম তাদের কাছে খুব সদাশয় সেজে এসেছে। আসলে ভালবাসায় সে ভোলাতে চায় সম্রাট আকবরের মতো। কিন্তু খুরম আসলে প্রবঞ্চক। আমি যে সব কথা বলছি যেন ব্যক্ত না হয়।'

'একটা কথা বলব আপনাকে ?'

'বলো।'

'শাহাজাদা খুরম আমার চোখে চুমো দিয়ে যাবার পর থেকে অনবরত কেন আমার চোখ হুটো জ্বালা করছে বলতে পারেন ?'

'তার সর্ব শরীরে বিষ আছে।' বলল শাহরিয়ার। 'তার মনেও বিষ ! কবে বাদশা মরবেন, কবে সম্রাজ্ঞীর ক্ষমতা খর্ব করতে পারবেন এই ধান্ধা। আচ্ছা, আমি চলি আজ।'

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো আস্‌মা। বলল, 'এই সরাইখানার মালিকের কন্যার কথা মনে থাকবে তো শাহাজাদা ?'

'নিশ্চয়ই মনে থাকবে। তোমাকে আমি আমার সিংহাসনের পাশে বসাব !'

লজ্জায় মাথা হেঁট করল আস্‌মা।

শাহরিয়ার ঘোড়ায় চড়ে বসলে তার কদমবুসি করল আস্‌মা।

শাহরিয়ার চলে গেল ঘোড়া টগবগিয়ে !

নিয়াজী হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'বাহবা ! বাহবা ! খলিফার এখন কিস্তিমাৎ ! আমার সরাইখানায় শাহাজাদাদের আগমন। আমিও বাংলাদেশের সুবাদার ইসলাম খাঁর মতো প্রশাসক হতে পারি যদি একটা রাজ্যপাট পেয়ে যাই। মা আস্‌মা, তুই ফরিদকে ভুলে যা, শাহরিয়ারকে রানী চান যখন তারই ভবিষ্যৎ ভাল ; তাকে তুই বশীভূত কর।'

আস্‌মা বলল, 'কিন্তু আব্বা, তুমি তো জানো রাজনীতি বড় খল,

ক্রুর জিনিস—খুরমেরই বোধহয় জয় হবে কেননা তিনি বেশি বিচক্ষণ আর বীর পুরুষ। সারা হিন্দুস্থান তাঁর নখদর্পণে।

নিয়াজী বললেন, 'আমি একদিন বাদশাকে দেখতে যাব, কিছু নজরানা বা ভেট নিয়ে যেতে হবে। শুনেছি বাদশা জাহাঙ্গীরের শেষ জীবন বড় কষ্টের। রাণী তাঁর রাজ্য চালনা নিয়ে ব্যস্ত। বাদশার শরীর রোগে পরিপূর্ণ। এখন যে যার তাল গুছোবার ধান্ধায় আছে।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব আব্বা।'

'নিশ্চয়, তুই থাকলেই শাহাজাদা শাহরিয়ার বাদশার কাছে যেতে দেবেন।'

'বাদশাকে বলা দরকার ফরিদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভের কথা—কিন্তু তাঁর স্ত্রী নীলোফার কাছে না থাকলে তিনি তো অপারগ—তবু ব্যাপারটা গোচরে আনা প্রয়োজন। আর সেই সৎ ব্রাহ্মণ, যিনি কৃষিকাজ করে দিন কাটান অথবা হাবসীর কথা আমরা জানাব কি?'

'পাগল নাকি! ওসব ব্যাপার কাউকে কিছু বলবি না।'

পরদিনই বাদশার সংগে সাক্ষাৎ মিলল নিয়াজীর।

আসমাকে বাদশা কাছে বসালেন। মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে কপালে চুম্বন করলেন বৃদ্ধ সম্রাট। বললেন, 'এখন আর কেউ তেমন আসে না মা! খুরমের মেয়ে জাহানারা আর ফরিদের মা গুলনারই আমাকে দেখাশুনো করে।'

নিয়াজী বললেন, 'ফরিদ আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত জাঁহাপনা। তিনি এখন সর্বহারা, আমার সরাইখানায় কিছুদিন ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নীলোফার পীরচেঙ্গির পালিতা কন্যা। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী। তাঁকে না জানিয়ে হঠাৎ মক্কায় হজে চলে গেছেন অনুমান করে ফরিদও শাহজাদা খুরমের সৈনিক দ্বারা আহত হয়ে এক সৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক সুস্থ হয়ে পদব্রজে মক্কায় রওনা হয়েছেন।'

বাদশা বললেন, 'আহা, আমার সন্তান হয়ে পদব্রজে মক্কায়

-যাচ্ছে! গুলনার শুনেছ সংবাদ? পীরচেঙ্গি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কন্যাদান করেছেন। পীরচেঙ্গির সাহায্য না পেলে আমি অনেক কাজ করতে পারতাম না। খুরম ফরিদের শত্রু তাহলে?'

গুলনার অন্দরের পর্দা ঠেলে এসে ওড়নায় চোখ মুছতে লাগল আসমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অন্দরমহলে নিয়ে গেল। হারেমের সিংহদুয়ারে একজন তরবারী হস্তে বিরাট চেহারার খোজা হাবসী দাঁড়িয়ে আছে দেখে আসমা বুঝল, এই হল হাবসী সর্দার বা মোস্তাকিন। সে গুলনারের কানে কানে বলল, 'এই হাবসীটা কিন্তু নারীমহল বা হারেমের সান্ত্রী হলেও খোজা নয়, এ পুরুষ! শাহাজাদা ফরিদ জানতে পেরেছেন।'

গুলনার বলল, 'তাই বুঝি!'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, আমি এটা বাদশা বা রাণীর গোচরে আনব। তুমি বাইরের মানুষকে এসব ব্যাপার কিছুই জানাবে না। তাহলে তোমার গর্দান যাবে।'

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কক্ষে গুলনার আসমাকে নিয়ে গেল।

মহারাণীকে দেখে আসমা হতবাক হয়ে গেল। এমন রূপসী মেয়ে সে তো কখনো দেখেনি! কী অপূর্ব চোখ, নাক, ঠোঁট। তবু তো বয়স চলে গেছে।

মহারাণী বললেন, 'তুমি তো খুব সুন্দরী মেয়ে! কার মেয়ে কোথা থেকে একে আনলে গুলনার?'

গুলনার বললে, 'ফরিদের সঙ্গে এর আলাপ হয়েছিল। শাহাজাদা শাহরিয়ার-এর রূপেগুণে মুগ্ধ।'

'তাহলে তো শাহরিয়ারকেই দিতে হয় এই অপরূপ কন্যারত্নটিকে। কেমন মেয়ে, তুমি রাজি?'

আসমা অবনত মস্তকে স্থির হয়ে বসে রইল।

'কি, লজ্জা পাচ্ছ?'

'জী না মহারানী। ফরিদ আমার রোগ-যন্ত্রণা দূর করেছেন—তাঁর কাছে আমি বাকদত্তা।'

'ওঃ! তাই বুঝি। বেশ, ভাল। ফরিদ কোথায় এখন?'

আদ্যপান্ত সব ঘটনাই বলল আসমা। সব শোনার পর সহসা মহারানী হাবসী বান্নু মোস্তাকিনকে অন্দরে ডাক করালেন।

বান্নু মোস্তাকিন কুর্নিশ করে দাঁড়ালে তিনি রুষ্ট নেত্রে তার দিকে তাকালেন কিন্তু মুখে হাসি মাখিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কি কোন জীন আছে?'

'আমি সামান্য একজন খোজা হাবসী মাত্র—দ্বাররক্ষী, সম্রাজ্ঞী।'

'তুমি ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়াও তোমার জারজ সন্তানদের?'

জিব কাটল হাবসী।

মহারানী পায়চারী করতে লাগলেন। বললেম, 'কি করে এটা সম্ভব? তুমি যে পুরুষ, এটা আজ কেমন করে লুকোবে? এই, কে আছ—এটাকে নিয়ে গিয়ে এখনি শত টুকরো করে এর মাংস কুকুরকে খাওয়াও। এটা ছদ্মবেশী পুরুষ।'

কয়েকজন সৈনিক বান্নু মোস্তাকিনকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। তারা তাকে নগ্ন করার পর দেখলে তার শরীরে উভয়লিঙ্গ বর্তমান।

তাদের একজন ছুটে এসে মহারানীকে সে বার্তা জানালে।

সবাই তো তাজ্জব! এমন কখনো হয়?

বাদশাও শুনলেন ঘটনাটি।

হাবসীকে আনা হল তাঁর গোচরে। তিনি শুধোলেন, 'যখন তোমাকে হারেমের দ্বারপাল করা হয় তখন কি তোমাকে খোজা করে দেওয়া হয়নি?'

'হয়েছিল হুজুর জাঁহাপনা।'

'তবে?'

'তারপর আমার শরীরে এই উভয় লিঙ্গের উৎপত্তি হয়।'

'এটাও কি সম্ভব? ডাকাও রাজ হেকিমকে।'

রাজ হেকিম এলেন। তিনি বান্নু মোস্তাকিনের শরীর পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, এ বেটা উভয়লিংগ, তবে চিকিৎসা শাস্ত্রে এর নজির আছে। ভগে ভগে ঘর্ষণ করে হিন্দু শাস্ত্রে ভগীরথের জন্মকথার উল্লেখ আছে। ভগাঙ্কুর বড় হয়ে কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের শিশ্নের আকারও নেয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় খোজা করার সময় যিনি অস্ত্র চালান তাঁর অসামান্য দক্ষতা তো ছিলই— রসিকতা বোধও কম ছিল না।'

বাদশা বললেন, 'যে একে খোজা বানিয়েছিল সেই নাপিত যদি বেঁচে থাকে আবিব বোলাও তাকে।'

বুড়ো খাজাঞ্চি খাতা খুলে নাপিতের নাম বার করল। সে থাকে নাকি দিল্লীর এক পল্লীতে। তখনই লোক ছুটল; ধরে আনল তাকে।

বুড়ো নাপিতের কানে বালা। মাথায় সাদা চুল, পরনে চেক লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া, গলায় রুপোর তক্তি! সে বলল, 'হুজুর মেহেরবান, আমি অনেক খোজা করেছি এই হারেমের। বান্নু মোস্তাকিনের শরীরে অস্ত্র চালানোর সময় ও বেটা হঠাৎ আমাকে বাঁধা পা ছিঁড়ে ফেলে এমন লাথি মারে যে তিন হাত দূরে পড়ে যাই। তখন আমি ওকে গরুর মতন করে বাঁধতে বলি। ছুরি দিয়ে ওর তল পেটের নিচেটা ফেড়ে দিই। যন্ত্রনায় আছাড়-কাছাড় খেতে থাকলে আমি দয়া পরবশ হয়ে আমার বোতল থেকে একটা আরক লাগিয়ে দিই। এই আরকের গুণ হল ক্ষতস্থান সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে দেয়! কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য।' নাপিত বাদশার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, 'কাটা স্থানটার মুখ না জুড়ে শুধু ক্ষত স্থানের অন্তর নালীটাই শুকিয়ে গেল। তারপর এই উভয় লিঙ্গের জন্ম হয়ে গেছে। এটা কেমন করে ঘটেছে আমি জানি না।'

দুটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বাদশা নাপিতকে বিদায় দিলেন।

রাজবৈদ্যও চলে গেলেন।

বাদশা মোস্তাকিনকে খুব নিচু স্বরে বললেন, 'বন্দো তুমি

একটা কথা আমি জানতে চাই। তোমার প্রাণদণ্ড আমি মকুব করলাম। তুমি আজীবন ভাতা পাবে। তোমাকে দর্শন করবার জন্যে ইনাম দেবে। কিন্তু তোমাকে অবরুদ্ধ রাখা হবে। এখন বলো তো বাপধন, তুমি কি একই শরীরে নিজে নিজে দেহ-সুখ উপভোগ করতে পার ?'

'জী না হুজুর জাঁহাপনা!'

'তাহলে কি ভাবে ওই সুখ উপভোগ করতে ?'

বানু মোস্তাকিন বলল, 'ছুটির পর আমি আমার বাসায় চলে যেতাম। আমার দুটো পোষা গাধা এবং ঘোড়া আছে, তাদের সঙ্গ আমি উপভোগ কবতাম। গাধাটা পুরুষ, ঘোড়াটা মাদী।'

বাদশা শুনে বলে উঠলেন, 'নাউজো বিল্লাহ! মানুষ পশু ছাড়া আর কিছু নয় সে যদি তার যৌন বিকৃতির সব কথা বলে। আচ্ছা, যাও তুমি। এই কে আছ, একে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখো। এ উভয়লিঙ্গ, একে জনসাধারণকে দেখার জন্য নজরানা দেবার ব্যবস্থা করবে।'

রাজা এবং রানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়াজী তাঁর মেয়েকে সঙ্গে করে চলে এলেন সরাইখানায়।

দিন যায়। তাল কুঞ্জের মাঝ দিয়ে সূর্য ডুবে যায়। সন্ধ্যার আজান শোনা যায়। আস্‌মা বিষণ্ন বদনে গবাক্ষের তলায় বসে থাকে, পথচারীদের দেখে, ফরিদের কথা ভাবে কিন্তু তার আর কোনো সংবাদই আসে না।

ফরিদ অন্যমনস্কভাবে নগ্নপদে একবস্ত্রে মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে হাতে একটা লাঠি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। পকেটে তার একটিও পয়সা নেই। ক্ষুধা পেলে সে তালাওয়ের জল পান করে। অঞ্জলি পেতে ভিক্ষা চায়। বলে, 'আমি একজন হজযাত্রী। আমার মানত আছে হেঁটে হেঁটে এলো পায়ে এই একবস্ত্রে মক্কা এবং মদিনায় যেতে হবে। দয়া করে আপনারা যদি কিছু আহার্য দেন তবে প্রাণে বাঁচি।'

লোকজন তাকে দয়া করে। কখনো কখনো উত্তম আহার জুটলেও সে শুধু মাত্র খোরমা, রুটি, দুধ আর হালুয়া মাত্র খেয়েছে। এইভাবে রোদে পুড়ে, শীতে জমে সে দিল্লী থেকে এসেছে পাঞ্জাবে। সেখান থেকে পোশোয়ার হয়ে খাইবার গিরি-উপত্যকা পাড়ি দিয়ে যাবার সময় একজন কাবুলী তাকে অসুস্থ দেখে নিজের উটে তুলে নিতে চেয়েছিল কিন্তু ফরিদ রাজি হল না। কান্দাহারে এসে শুনল, বাদশা জাহাঙ্গীর নাকি মগুপ ও অপদ।র্থ, রানীই রাজত্ব চালাচ্ছেন।

ফরিদ এসব কথায় কান দিল না। পারস্যে যাবার কথা জানাতে একদল হজযাত্রী তাদের সঙ্গে নিতে চাইল হেলমন্দ নদীপথে পাড়ি জমাবার জন্যে। ফরিদ বলল, 'না, আমি হেঁটে যাব'। কান্দাহার থেকে পারস্যের বির্জান্দ নগরে আসতে তার পাঁচদিন কেটে গেল। ইস্পাহান নগরে আসার পর প্রচণ্ড জ্বরে পড়ল সে। আর হাঁটতে পারছে না। পা ফেটে রক্ত বার হচ্ছে। ক্ষুধার্ত। গায়ের জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে। একটা গাছতলায় সে শুয়ে পড়ে রইল।

সন্ধ্যার পর দু-একজন তাকে উঁকি মেরে দেখে গেল। একজনের কাছে জল চাইতে সে তাকে তা খাওয়াল। বলল, 'এখান থেকে উঠে পালাও। শাহ আব্বাস বড় দুরন্ত রাজা। তুমি হিন্দুস্তানের লোক জানতে পারলে রাজঅনুচররা এসে ধরে নিয়ে যাবে—তোমার হাত পা কেটে নেবে।'

কিন্তু ফরিদ জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল। কি তার দুর্ভাগ্য! তার দাদামশায় ছিলেন নাকি পারস্যের লোক। ভাগ্যান্বেষণে হিন্দুস্তানে গিয়েছিলেন একমাত্র কিশোরী কন্যা গুলনারকে নিয়ে। কোনো কাজকাম মিলল না তেমন ভাল গোছের। পেটের দায়ে গালিচা বুনতেন। তাঁর কন্যা বড় হয়ে গেল। একদিন মীনাবাজারে যেতে বাদশা জাহাঙ্গীরের চোখে পড়ল গুলনারকে। তিনি তাঁর বেগমমহলে স্থান দিলেন নূরজাহানের খাস বাঁদী রূপে। স্ত্রীর বাঁদীও চল্ ছিল সমাজে, বিশেষ করে বাদশার

হারেমে। ফরিদের জন্ম হল বাদশার ঔরসে। দিল্লীর সুলতানের পুত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার খাস বেগমের পুত্র নয়, তাই আজ এই ভিখারীর দশা।

বাবা পীরচেঙ্গি, তুমি দয়া করো! মক্কা-মদিনাতে আমাকে পৌঁছে দাও। নীলোফারের সঙ্গে মিলিত করে দাও। কেন সে আমাকে এমন ভাবে কষ্ট দিচ্ছে? সে কি কিছু দেখতে পাচ্ছে না? তার আতসর্কাচ, জাদুদণ্ড, আংটির অদ্ভুত কেরামতি কি নষ্ট হয়ে গেছে? নাকি খুরম তাকে হত্যা করেছে?

হঠাৎ ভাবনা কেটে গেল ফরিদের। মশাল হাতে তিনচারজন সান্ত্রী এসে তাকে টেনে তুলে শুধোল, 'এই, কে তুমি, কোথা থেকে এসেছ?'

ফরিদ বলল, 'হিন্দুস্তানের লোক, পায়ে হেঁটে হজ করতে যাবার মানত আমার। অসুস্থ হয়ে পড়েছি, আমি বড় ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত। আর হাঁটতে না পেরে এইখানে শুয়ে পড়েছি!'

একজন প্রহরী বলল, 'নিশ্চয় এ বেটা গুপ্তচর। পাকড়াও করো, বাদশার দরবারে হাজির করো, ইনাম মিলবে।'

বাদশা শাহ আব্বাসের রাজভবনে টানতে টানতে ফরিদকে এনে হাজির করল প্রহরীরা। তাকে তারা মারধর করার পর তার জ্ঞান হারিয়ে গেল।

হারেমের একটি বাঁদীর চোখে পড়ল দৃশ্যটি, সে বলল শাহাজাদী শিরিনকে। শিরিন বাঁদীকে মোমবাতি নিয়ে তার সঙ্গে বাইরে আসতে বলল। ফরিদকে দেখে তার দয়া হল। বলল, 'প্রহরী, তোমরা চলে যাও, একে আমি দেখছি—দেখে তো মনে হয় খানদানী ঘরের ছেলে, কিন্তু এমন বেশ কেন?'

হারেমের মধ্যে নিজের কামরার এলাকায় এনে একটি পালঙ্কে শোয়াবার ব্যবস্থা করল শিরিন।

• হেকিম ডাকিয়ে চিকিৎসা করানোর পর মাঝরাত্রে ফরিদের জ্ঞান ফিরল। দেখল, একটি সুসজ্জিত কক্ষ। ঝাড়বাতি জ্বলছে।

সবুজ সিল্কের পর্দা ঝুলছে দুয়ার জানালায়। বিছানা কম্বল গালচা সমস্তই রাজকীয়। তার চেহারায় দামী বর্ণাঢ্য পোষাক। মাথায়, পায়ে, হাতে দাওয়াই-দেওয়া পট্টি বাঁধা। সামনের তেপায়ায় কাঁচ-পাত্রভরা বেদানার রস। পাত্রভরা মধু, আঙুর, আপেল।…

কক্ষের মধ্যে কেউ নেই।

ফোটা গোলাপের গুচ্ছ কয়েকটি।

দেওয়ালে আলুলায়িত বেশবাসে একটি অসামান্য সুন্দরীর কয়েকটি বিভিন্ন ভঙ্গীর তৈলচিত্র।

কার যেন পায়ের শব্দ পেয়ে হঠাৎ চোখ বন্ধ করল ফরিদ। কাছে বসে তার কপালে হাত দিল কে যেন! মসৃণ নরম হাত। আস্তে আস্তে চোখ মেলল সে।

চার চক্ষুর মিলন হল।

শিরিন মৃদু একটু হাসল। বলল না কিছুই।

ফরিদ তার হাতখানা ধরল। বলল, 'কে তুমি দয়াময়ী?'

'আমি পারশ্যরাজের কন্যা শিরিন। কে আপনি, পরিচয় দিন।'

'আমি হতভাগ্য এক হজযাত্রী, পদব্রজে মক্কা-মদিনা যাবার মানত করে প্রতিদিন পঁচিশ ক্রোশ পথ এসেছি সুদূর সেই হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী নগরী থেকে!'

'আপনি কি বাদশা জাহাঙ্গীরের বংশধর, আপনার নাম কি ফরিদ?'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম। মনে পড়ে পীরচেঙ্গির মায়া-কাননের কথা? সেখানেই আমি বন্দী ছিলাম—আপনি আমাদের মুক্তি দেবার পর পারশ্যের রাজভবনে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়।'

ফরিদ বলল, 'সেখানে অনেক সুন্দরী ছিল। হাসনু আর এলিজার সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছিলাম কিন্তু তোমাকে আমি

দেখেছিলাম কিনা ঠিক মনে পড়ছে না। আমার মস্তিষ্কটা এখন ঠিক কাজ করছে না বোধহয়।'

'সে যাই হোক, ভগ্নি নীলোফার কোথায়?'

'জানি না। দিল্লীর সরাইখানা থেকে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমার ধারণা, সে হজে গেছে। আমি একটু সুস্থ হলেই চলে যাব।'

'না, আমি যেতে দেবো না!'—শিরিন ফরিদের হাতের ওপরে চুমু খেয়ে আদুরে গলায় বলল।

'তা কি হয়! হজ থেকে ফিরে না হয় তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

'আপনি জানেন কি, সারা হিন্দুস্তানে ঘোষণা করা হয়েছে কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে শাহাজাদা শাহ ফরিদ আহমদকে। তিনি যেখানেই থাকুন বাদশা জাহাঙ্গীরের হুকুমানু-সারে যেন এখনি কান্দাহারে গিয়ে সেখানের সুবাদার পদ গ্রহণ করেন। এবং একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে পূর্বতন সুবাদার খাঁ ইমতিয়াজ অন্য পদ পাবেন শাহাজাদা ফরিদের ইচ্ছানুসারে।'

ফরিদ ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার ভঙ্গী করল।

শিরিন বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি রাজি নন?'

'না।'

'কেন?'

'আল্লার পরে আমি হজরত মোহম্মদকেই একমাত্র জন-প্রতিনিধি বলে মানি। প্রজার ওপরে খবরদারী, জুলুম, জবরদস্তি আমি পছন্দ করি না।'

শিরিন প্রশ্ন করল, 'কেউ যদি এসব করে তার বিচার চাই না?'

পাল্টা প্রশ্ন করল ফরিদ, 'বিচারের নামে যদি অবিচার হয়, যদি প্রহসন হয়? ক'টা মোকদ্দমার সত্য ফয়সালা হয়, ক'টা সাক্ষী ঠিক কথা বলে? যতদিন তুনিয়াতে জমির আল-আটন হয়েছে, সোনার মোহর তৈরি হয়েছে, সুন্দরীদের গৃহে বন্দী করা হয়েছে,

মানুষ স্বার্থপর, লোভী, কামুক হয়েছে। সমাজ গড়ে যেমন লাভ হয়েছে তেমনি সমাজের বা গোষ্ঠির অথবা রাজ্যের স্বার্থের জন্য অনেক ন্যায়-নীতিরও প্রয়োজন হয়েছে। সবাইকে সেই ছাঁচে ফেলা হয়েছে।'

'আপনি হজরতের নীতি মানেন তো?'

'মানি কিন্তু তিনি রাজা বা অত্যাচারী শাসক ছিলেন না। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বন্ধু ভাবাপন্ন হতে বলেছিলেন।'

দুজনেই চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ।

ভোর হতে চলল।

সকাল হতে-অসুস্থ শরীরেই বিদায় নিতে চাইলে শিরিন ফরিদের হাত ধরে অনুনয় বিনয় করতে লাগল। বলল, 'একদিন অন্তত থাকুন—মাত্র একদিন।'

'না, তা হয় না শিরিন। তোমার অতিথি-পরায়ণতার কথা চিরজীবন মনে থাকবে। আমাকে আর এক মুহূর্ত বাধা দিও না, আর মাত্র পনেরো দিন বাকি আছে হজের। এখনো প্রায় চার-পাঁচ শো ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে বাকি! আমাকে যেতে দাও, অবাধ্য হয়ো না।'

'আমার ইচ্ছে করছে আপনার হজযাত্রা ভণ্ডুল করে দিই।'

'কেন?' আশ্চর্য হয়ে শুধোলে ফরিদ।

শিরিন বলল, 'কেন বুঝতে পারেন না?'

'না!'

'আপনি হজ করে এলে পাপ বা অন্যায় সম্বন্ধে সদা-সর্বদা সচেতন থাকবেন। আপনার প্রবৃত্তিকে দমন করবেন। হয়তো সাংসারিক ভোগ-লালসা বিসর্জন দিয়ে পীর-দরবেশ হয়ে যাবেন। আমি আপনাকে পাব না।'

'ছেলেমানুষ!' শিরিনের নাক ধরে টেনে দিল ফরিদ।

সহসা সেই মুহূর্তে সেখানে হাজির হলেন পারস্যের সুলতান শাহ আব্বাস। তিনি কন্যার প্রতি রুষ্ট নেত্রে তাকিয়ে শুধোলেন, 'কে এই যুবক?'

'আব্বাজান, ইনি সদাশয় এক হজযাত্রী। আমাকে মায়া-কানন থেকে উদ্ধার করে দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। শুনলে আশ্চর্য হবেন যে ইনি কান্দাহারের সুবাদার নিযুক্ত হয়েও সে-পদ অগ্রাহ্য করেছেন। পদব্রজে হজ করতে চলেছেন মানত মতো।'

'তাহলে ইনি কি শাহাজাদা ফরিদ আহমদ!'

অভিবাদন করল ফরিদ।

'বাদশা জাহাঙ্গীর কি অসুস্থ?'

'আমি সঠিক জানি না, তবে সম্ভবত তাই, জাঁহাপনা।'

'খুরম কি বাদশা হবে?'

'তার লোভ আছে। তবে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ছোট শাহাজাদা শাহরিয়ারকে হয়তো বাদশা বানাতে পারেন।'

'তুমি কি কান্দাহারের সুবাদার-পদ গ্রহণ করবে না?'

'জী না, খুরম আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে।'

'তুমি পারশ্য-রাজের শত্রু নও?'

'জী না, আমি কারো শত্রু নই।'

'আশ্চর্য! আচ্ছা তুমি কি হজযাত্রার জন্য আমার সাহায্য চাও?'

'জী না, জাঁহাপনা। আমি পদব্রজেই যাব—আপনি অনুমতি দান করুন।'

'তুমি যেতে পার যুবক। কিন্তু ওয়াদা করে যাও, হজ থেকে ফেরার সময় আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করে যাবে।'

'ওয়াদা করলাম, আল্লা যদি হায়াত রাখেন নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাব।'

ফরিদকে বিদায় দিল শিরিন। তার চোখের পাতায় জলের ফোঁটা কাঁপতে লাগল। ফরিদের ঝোলার মধ্যে আখরোট, পেস্তা, বাদাম, নারকোল, খোরমা, রুটি, হালুয়া ইত্যাদি ভরে দিল।

লাঠি হাতে নিয়ে আবার পশ্চিমমুখে হাঁটতে লাগল ফরিদ।

কদিন পরে বাগদাদে এলো। সেখান থেকে সিরিয়ার মরুভূমি পাড়ি দিয়ে গেল জেরুজালেমে। সেখানের মসজিদে নামাজ পড়ল। তারপর আরো কয়েকদিন অবিশ্রান্ত হাঁটার পর একদিন মাঝরাতে এসে পৌঁছল মদিনাতে। সে হজরতের সমাধি প্রদক্ষিণ করার পর সকাল পর্যন্ত শুয়ে পড়ে থাকল। অনেক কাঁদল। গোটা কোরআন শরীফখানা দ্রুত পাঠ করে গেল। দেখলে তার অন্তরের পর্দায় কোরআন শরীফের অক্ষরগুলো ক্রমে ক্রমে উঠে আসছে যেন সমুদ্রের জল থেকে।

দিনের বেলা অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যে সে নীলোফারকে খুঁজতে লাগল। বোবখা ঢাকা মেয়েরা তাঁবুর মধ্যে আছে, নীলোফার কোথায় আছে তাদের মধ্যে কে জানে!

অবশেষে সে মক্কার উদ্দেশে রওনা হল। হজের আগের দিন মক্কায় পৌঁছে সে ন্যাড়া হল। হজের পোষাক পরল।

॥ পনেরো ॥

হজের ক্রিয়াকর্মের জন্য টাকাকড়ির দরকার ছিল—শূন্যহাতে এসেও মারধর খাবার পর অশেষ কল্যাণবুদ্ধি পারশ্য-রাজদুহিতার দেওয়া যদি নতুন পোষাকের সঙ্গে কিছু টাকাকড়ি না আনত তবে তার দুর্দশা ফকিরের চাইতেও হীন হত। তীর্থধাম হলেও যা করতে চাও, যা করতে হবেই তার জন্য টাকা চাই—পয়সা চাই, শ'তিনেক টাকা লাগবেই জেনে শিরিন তার ঝোলার মধ্যে তা দিয়ে দিয়েছিল।

হজের সময় সেলাইহীন লুঙ্গি পরল, গায়ে গামছার মতো এক টুকরো কাপড় আর মাথায় রুমাল বাঁধল। জিরারত হল। নামাজ হল। প্রার্থনা সাঙ্গ হল। একটা দুম্বা কোরবানী দিলে। সেটাকে দান করার লোকও পেলে কিন্তু হজের দু'দিন পরেও নীলোফারের কোনো সন্ধান মিলল না। ফরিদ দেখল তাঁবু তুলে হাজার হাজার লোক দেশে ফিরে যাবার জন্য রওনা দিচ্ছে। কত ধরণের, কত দেশের, বিচিত্র চেহারার মানুষ। অনেকেই বৃদ্ধ আতুর। বয়স প্রায় সাঙ্গ করার পূর্ব সায়াহ্নে এসেছেন। সকলেই চলেছেন মদিনার পথে। মহিলা যাঁরা এসেছেন তাঁদের চেহারা বোরখায় ঢাকা। উটের হাওদার মধ্যে কে কোথায় চলে যাচ্ছেন কিছুই বোঝা যায় না। নীলোফার এঁদের মধ্যে থাকলেও কেমন করে খুঁজে বার করবে? হতাশ হয়ে এবার মদিনার পথে পাড়ি দেবার কথা ভাবতে লাগল ফরিদ।

নীলোফার কি তাহলে তাকে দাগা দিল? সে কি তাহলে হজে আসে নি? খুরম বড় ধুর্ত, সে কি নীলোফার আর তার জাদুযন্ত্র-গুলিকে অধিকার করে নিয়েছে?

হঠাৎ ফরিদের মনে হল অলৌকিকতার মোহ তাকে বাস্তব-

বোধশূন্য করে ফেলেছে? তার মা-জননী রাজগৃহে রাজবধূ হয়েও সে সম্মান না পেয়ে ক্রীতদাসীর মতো রাজার পদসেবা করছেন। আসলে তিনি বন্দিনী। সে কি পারে না দিল্লীর সিংহাসনে বসতে? যদি লড়াই করে তবে তার সঙ্গে খুরম বা শাহরিয়ার কতক্ষণ যুঝতে পারে? তবে তাদের বশে আছে সৈন্যবল, অর্থবল। খুরমের বিরুদ্ধে আছেন সম্রাজ্ঞী। শাহরিয়ার হয়তো তখত-তাউসে বসবে। কিন্তু বেচারা! মহব্বত খাঁ যদি খুরমপন্থী না হত শাহরিয়ার তাহলে সিংহাসনে হয়তো টিকে থাকতে পারত। আসফ খাঁও বিরুদ্ধে!

আর হঠাৎ যদি বাদশা জাহাঙ্গীর মারা যান কান্দাহারের শাসন-কর্তার পদ না নেওয়া কি ঠিক হবে? যদি নীলোফারের সঙ্গে আর কখনো দেখা না হয় তবে আর তার ক্ষমতা কি? ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে সে মদিনার পথে চলল।

আবার সে নিষ্কপর্দক। আবার অনাহার। হজের পর শরীর মন চাঙ্গা হলেও পথ শ্রান্তিতে সে ক্লান্ত হল। সারাদিন মরুভূমি পাড়ি দেবার পর সে পিপাসায় অধীর হল। বসে পড়ল খেজুর কুঞ্জের তলায়। সন্ধ্যার পর দূরে মশালের আলো দেখে সে এগোল। ঘণ্টাখানেক আসার পর একটি বাড়ি মিলল। দেখল, মশালের আলোয় একজন বৃদ্ধ কোরআন শরীফের বর্ণমালা লিখছেন পালকের কলম দিয়ে। তাঁর একটি রূপসী কন্যা শালের নকসা সেলাই করছে মন দিয়ে। ফরিদ সালাম জানাতেই বৃদ্ধ চোখ তুললেন কিন্তু রূপসী কন্যাটি সহসা তাকে দেখেই মুখের নেকাবটি ফেলে দিল। ফরিদ সবিস্ময়ে দেখল, এইতো নীলোফার! হ্যাঁ, তার সেই চোখ, সেই মুখ, সেই সুচারু মসৃণ বাহু! এমন সাদৃশ্য কি থাকতে পারে? কন্যারত্নটি উঠে অন্দরের মধ্যে চলে গেল।

ফরিদ বলল, 'আমি বড় পিপাসার্ত এবং পথশ্রান্ত, যদি দয়া করে একটু…।'

'বসুন বসুন, মেহমান আমি ভালবাসি। দীন মুসলমান আমি

কিন্তু তবুও অধম লিপিকারের বাড়ি মদিনাযাত্রীরা প্রায় সকলেই একবার করে পদধূলি দিয়ে যান। তাঁরা কেউ রাত থাকেন, গজল গান। কাওয়ালী গান। মিলাদ-মহফিল করেন, খানাপিনা সাঙ্গ করে চলে যান। মা-জননী, সারা, মেহমানকে ওজু করার পানি দাও, সরবৎ দাও, খানাপিনা দাও।'

ওজু করতে করতে শীতল জলের স্পর্শ পেয়ে ফরিদ ভাবল সে কিছুটা পান করে ফেলবে কিনা, যদি এরপর আর জল না মেলে? জলহীন দেশ আরব, বড় কষ্ট জলের। তবু সে লোভ সংবরণ করল। ওজু করে এসে বৃদ্ধের কাছে বসল। সরবৎ আর রুটি, খেজুর, হালুয়া, দুধ খেল।

ফরিদ বলল, 'আপনি এই নির্জনে প্রায় একা বাস করেন, বেদুইন দস্যু-তস্করের ভয় নেই আপনার?'

'আমি আর আমার কন্যা এখানে বাস করি। দস্যু-তস্কর এদেশে নেই। রাজকোষ থেকে আমি মাসোহারা পাই—মক্কা-মদিনার পথের আমি আসলে একজন চৌকিদার অথবা পথযাত্রীদের খেদমতগার।'

বাইরের বৈঠকখানা থেকে অন্দরে নিয়ে এলেন বৃদ্ধ।

আশ্চর্য হল ফরিদ। ভেতরের ঘরগুলো বেশ বর্ণাঢ্য, দামী গালিচা পাতা, সুন্দর বিছানা। দেওয়ালে কোনো কোনো মুসাফির্ অথবা কবি, ভাব-তন্ময়া নারীর তৈলচিত্র।

ফরিদ একটা ছবির নিচে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল। শুধোল, 'ইনি কোন্ তপস্বী?'

'ইনি হলেন মহাকবি ফেরদৌসী, যিনি মহাকাব্য 'শাহানামা' রচনা করে জগতে চির অমর হয়েছেন।'

ফরিদ মুগ্ধচিত্তে চিত্রটি দেখতে লাগল, শুধোল, 'কবি, আপনি! অমিতবীর্য যশস্বী সেনাপতি রুস্তমকে প্রায় হারিয়ে দিল তার অপরিচিত পুত্র সোহ্‌রাব! সে বলল, অন্যায় যুদ্ধে আমাকে হত্যা করছেন কিন্তু আমার পিতা যদি জানতে পারেন আপনার ধড়ের

ওপর মাথা থাকবে না। রুস্তম শুধোলেন, কে তোমার পিতা? কে সেই বীর যার নাম তুমি মৃত্যুর সময়েও আশান্বিত মনে আকাঙ্খা করছ? সোহরাব বললে, 'জগতে সবাই তাঁর নাম জানে, তাঁর নাম শুনলে হাজার হাজার সৈন্য পঙ্গপালের মতো পালিয়ে যায়। তাঁর নাম শুনলে প্রতি ধূলিকণা নেচে ওঠে। তাঁকে দেখলে হাজার হাজার রমণী তাদের কণ্ঠমালা ছুঁড়ে দেয় অলিন্দ থেকে...অন্যায় যুদ্ধে আমার মতো একটি কিশোর-তরুণকে আপনি নিহত করছেন...'

'সেনাপতি রুস্তম অধীর আগ্রহে জানতে চাইলেন, কে সেই বীর? এই কিশোরের মুঁখের স্নেহের এমন মায়া কেন আচ্ছন্ন করছে তাঁকে?'

'সোহ্‌রাব বলল, 'সেই বীরের নাম মহাবীর রুস্তম।'

'রুস্তম!' রুস্তম চিৎকার করে উঠলেন। 'অসম্ভব! অসম্ভব! রুস্তমের কোনো পুত্র সন্তান নাই। কোনো প্রমাণ আছে রে হতভাগ্য নওল কিশোর?'

'সোহ্‌রাব মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও একটু হাসল। প্রমাণ স্বরূপ দেখাল তার হাতের বাজুতে বাঁধা একটা সোনার তকৃতি। তারপর সে খোদাতায়ালার নাম করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল!'

'মহাবীর রুস্তম তকৃতি ভেঙে আবিষ্কার করলেন একটি পত্র। সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁরই স্বহস্ত লিখিত সেই পরিচয় পত্র। যৌবন দিনের কথা তাঁর স্মরণ হল। এক রমণীকে ভালবেসে তাঁর সঙ্গে প্রণয় করে এই পত্রটি দিয়ে চলে গিয়েছিলেন যুদ্ধে—পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে। বলে এসেছিলেন, পুত্র হলে সোনার কবচে পুরে বাজুতে বেঁধে দিও। আর কন্যা হলে গলায় দিও হারের তকৃতির মধ্যে। কন্যা হয়েছে বলে আমি মিথ্যা সংবাদ পাই কিন্তু হায়, আমার প্রাণের সোহ্‌রাব! আমি এতবড় বীর হয়ে আজ কিনা একটি তরুণ কিশোরের হাতে পরাজিত হয়েও অন্যায় যুদ্ধে তাকে নিহত করলাম। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হে রুস্তম, তুমি আজ কী নিদারুণ অভিশপ্ত! পুত্র আমার বলেছিল, আমার পিতা যদি শোনেন ...হা-হা-হতভাগ্য রুস্তম...।'

'চমৎকার!'

'এঁ্যা!'

'চমৎকার!'

নারী কণ্ঠের বাহবা শুনে ফিরে তাকাল ফরিদ। দেখল নীলোফার।

বলল, 'তুমি!'

'আমি এই বৃদ্ধ কবি গওস্থল আনামের কন্যা। আপনি তো চমৎকার কাহিনী আর সংলাপ আবৃত্তি করতে পারেন।'

বৃদ্ধ কবি তখন কৌচের মধ্যে বসে বালাপোষ মুড়ি দিয়ে ফুরসিতে তামাক টানছিলেন। চোখ দুটো তাঁর অসম্ভব টানা টানা—তুলিতে আঁকা যেন! সুন্দর পরিপাটি চুল দাড়ি—পীরহান পাজামা। বৃদ্ধ যে এত সুন্দর হয় একমাত্র, বাদশা জাহাঙ্গীরকে ছাড়া ফরিদ আর কখনো দেখে নি। ইনি কি কোনো প্রসাধনী মেখেছেন? জাফরান ফুল চূর্ণ, শুকনো দুধের সর আর তিলের তেল মিশ্রন করা প্রসাধনীর ব্যবহার কি আরবেও আছে? চৌকিদার ইনি নন। বড় দরের মানুষ নিশ্চয়ই।

তিনি বললেন, 'আমার কন্যা সারা।'

ফরিদ অভিবাদন জানাল। সবিস্ময়ে সারার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা কি সম্ভব যে আল্লার তৈরি মানুষের বিচিত্র চেহারার মধ্যে একজনের সঙ্গে আর একজনের হুবহু মিল হয়ে যায়?'

বৃদ্ধ বললেন, 'কখনো কখনো মিল হয়ে যায় বৈকি!'

সারা হাসল। মৃদু হাসি মাখিয়ে বলল, 'কার সঙ্গে আমার মিল দেখে আপনি এমন বিস্মিত হয়েছেন অতিথি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফরিদ। হাঁটতে হাঁটতে ছবি দেখতে লাগল। বলতে লাগল, 'আল্লাকে অশেষ ধন্যবাদ যে নীলোফার ভেবে হঠাৎ আমি আমার এই আশ্রয়দাতা স্বনাম ধন্য কবির কন্যাকে আলিঙ্গন করে বসি নি—তাহলে পাগল ভেবে আমাকে এই মুহূর্তে এই অন্ধকার শীতের রাত্রেই তাড়িয়ে দেওয়া হত।'

আশ্চর্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর নাসিকাধ্বনি হতে লাগল।

সারা বলল, 'আসুন, পাশের ঘরে রাত্রির জন্য বিশ্রাম করবেন, আপনি পথশ্রান্ত।'

পাশের ঘরে গিয়ে ফরিদ ঘুরে পড়েই দু'হাতে হঠাৎ কাঁধ চেপে ধরে বলল সারাকে, 'হঠাৎ পালিয়ে এলে যে? কত খুঁজলাম! আমাকে একেবারে ভিখারী করে দিয়ে এলে। প্রিয়তমা, আমাকে তুমি লুকিয়ো না। দোহাই তোমার...!'

ফরিদ সারার বুকের মধ্যে মুখ ঘষতে লাগল। তাকে জড়িয়ে ধরে চোখে মুখে হরদম চুম্বন করতে লাগল। সারা বাধা দিল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফরিদ শান্ত হলে খুব আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার দোষ নেই। আপনি ভুল করেছেন। হয়তো আপনার প্রেমিকার সঙ্গে আমার নিখুঁত মিল আছে কিন্তু আল্লা মানুষের চেহারায় এমন কিছু গরমিল রাখেন যা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখলে ধরা পড়বেই। যমজ সন্তানের মধ্যেও সাদৃশ্য থাকে। আমি যমজের একজন। আমার পিতা যৌবনকালে খুবই দরিদ্র ছিলেন। দুটি কন্যা সন্তান প্রসব করার পর আমার মা মারা যান। পিতা আমাদের দুটিকে কাঁধে করে নিয়ে বয়ে বেড়াতেন। তারপর ভারতের এক হাজী দরবেশকে একটি কন্যা তিনি বিক্রি করে দেন পেটের দায়ে মাত্র পাঁচটি মোহর নিয়ে। জানিনা, সেই কন্যা আপনার প্রেয়সী অথবা স্ত্রী কিনা—যার সঙ্গে আমার এত মিল খুঁজে পেয়েছেন।'

ফরিদ আলগা হল। দূরে সরে গেল। বলল, 'চমৎকার ধাঁধাঁ তৈরি করলে তো তুমি!'

'বিশ্বাস করুন, ধাঁধাঁ নয়, অলৌকিক ব্যাপারও নয় কিছু—আমি আরবের বিখ্যাত কবি গওসুল আনামের কন্যা সারা।'

'আশ্চর্য!' বলল ফরিদ। বিছানায় বসে পড়ল সে।

বাইরে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল।

সারা বাইরে গেল।

মশাল হাতে অশ্বারোহী সৈন্য।

সে বলল, 'জাঁহাপনা বাদশা নামদারের দরবার থেকে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে হিন্দুস্তানের বাদশা জাহাঙ্গীরকে কাশ্মীরে আনা হয়েছে। তিনি জাহাঙ্গীরবাগে আছেন। সেখানে প্রচণ্ড-তুষার পাত হচ্ছে। বাদশা তুষারপাতের দরুণ হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যু আসন্ন। কান্দাহার পারস্যের বাদশা শাহ আব্বাস কর্তৃক আক্রান্ত। শাসনকর্তা ফরিদ সেখানের শাসনভার নেন নি। পূর্বতন শাসনকর্তা ইমতিয়াজ নিহত হয়েছেন।...হজযাত্রীরা এখন মদিনার পথে। অনেকেই স্বদেশে রওনা হয়ে গেছেন।...'

সংবাদদাতা চলে গেল মশাল উর্দ্ধে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে।

ফরিদও বেরিয়ে এসেছিল সারার পিছু পিছু ঘণ্টাধ্বনি শুনে। সমস্ত সংবাদই সে শুনল। তার পিতা অন্ধ হয়ে গেছেন। হঠাৎ তাঁর সাধের 'জাহাঙ্গীরবাগ' দেখার বাসনা হল কেন? কাশ্মীরে মারা গেলে দিল্লী অরক্ষিত! সিংহাসনে খুরম না বসতে পারলেও গোলযোগ হবে। নূরজাহান হয়তো শাহরিয়ারকেই সম্রাট বলে ঘোষণা করবেন। তারপর ঝড়ের বেগে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ছুটে আসবে খুরম!

হয়তো খুরম নিহত হবে, নতুবা বন্দী অথবা শাহরিয়ারের জীবন অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। হায় রাজ্যের লোভ! ভাই ভাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে! পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে হত্যা করবে। বাদশা আকবর তাঁর নাতি খসরুকে বাদশা করতে চেয়েছিলেন, সেলিমকে অযোগ্য ভাবতেন। তাই সেলিম জাহাঙ্গীর হবার পর বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে নিহত করলেন। এক তলোয়ার মেরে ফেড়ে ফেললেন তাঁর শরীর।

চুলোয় যাক সব কিছু, ফরিদ হঠাৎ শুধোলে, 'এভাবে এখানে সংবাদ পরিবেশন করা হয়? জনে জনে এই সংবাদ প্রচার করার মধ্যে রাজনৈতিক হেতুটাই বা কি?'

সারা বলল, 'জনে জনে নয়, দেশের গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোকদের কাছে এই রকম ডাক আসে।'

'বুঝতে পারছি আপনার পিতা একজন বিশিষ্ট লোক কিন্তু তাঁর কি কোনো সৈন্যবাহিনী বা চাকর-নফর নেই?'

সারা হাসল। বলল, 'আছে, সবই আছে। এখানে পাতালপুরী আছে—তার মধ্যে সবাই থাকে। আব্বাজান গরিবী চালে থাকতে ভালবাসেন আসলে তিনি একটি পরগনার শাসক।'

হঠাৎ সারার মুখখানা করতলের মধ্যে চেপে ধরে শুধোলে ফরিদ, 'একটু একটু করে ছাড়ছ, না নীলোফার?'

'নীলোফার?'

'আমার জাদুকরী স্ত্রী—যে হজ করতে এসেছে মক্কায়—যাকে আমি খুঁজতে এসেছি হেঁটে হেঁটে।'

'আশ্চর্য!'

'কি আশ্চর্য?'

'নীলোফার নামটা। আমার যমজ বোনটিরও নাম ছিল নীলোফার।'

'আবার এক খেলা! নারী তুমি বড় ছলনাময়ী! নীলোফার, এখন আমার বড় দুঃসময়। তোমার জাদুদণ্ড-বলে হাজার কয়েক সৈন্য আনো—আর আমার পিতা বাদশা জাহাঙ্গীরের অন্তিমকালে আমি গিয়ে দিল্লীর মসনদে বসি—নইলে অযোগ্য কেউ মোগল সাম্রাজ্যটাকে ধ্বংস করে দেবে।'

'আপনি বাদশা জাহাঙ্গীরের পুত্র!' বিস্ময়ে অভিভূতা হল সারা।

ফরিদ ভাবলেশহীন ভাবে সারার চোখ দুটো দেখতে লাগল। ডুবে যেতে লাগল যেন একটা সুনীল সরোবরে। বলল, 'হ্যাঁ, সেই চুল, সেই নাক, সেই ঠোঁট, সেই কান—একই রকম!'

সারা বিহ্বল হল। উত্তেজিত হল। মোহিনীর মতো সে

আলতো কাঁপা গলায় ফরিদের হাত ধরে শুধোলে, 'মনে করে দেখুন কোনো তফাৎ নেই, একটা তিলও…'

'হ্যাঁ আছে, দোহাই তোমার, তার বুকের মাঝখানে তিল আছে, আর…'

'আর ?'

'আর, না না না—বলা যায় না…।'

'বলুন।'

'তার নাভিকুণ্ডলীর নিচে একটি লোহিতবর্ণ, বড় রক্তের ফোঁটার মতো তিল আছে। দেখাতে পার তুমি—তাহলে বুঝব…'

'সেই জন্যই বোধহয় জ্ঞানী মুরুব্বিরা বলেন চল্লিশের পরে হজ্জ করো যুবক…হি হি হি…না না…ওসব আমার নেই…নীলোফারের ছিল, আমার মনে আছে।'

'মনে আছে ?'

'সত্যি বলছি।'

'তখন সে কত বড় ?'

'বছর ছয়েক। অভাবের দিন আব্বা তাকে বেঁচে দিল।'

'সে কাঁদে নি ?'

'হ্যাঁ।' সারার বোধহয় কান্না পেয়ে গেল। সে মুখ ফেরাল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটল।

সারা বলল, 'ভাগ্য যে কখন কাকে কোথায় নিয়ে যায়।'

'তোমাকেও আমি নিয়ে যাব!'

চোখভরা হাসিতে জাদু আছে সারার।

ফরিদ বলল, 'নীলোফার এখনো আছ তুমি আমার কাছে, যতক্ষণ না পরীক্ষায় প্রমাণ দিচ্ছ। বুঝতেই পারছ নারী নিয়ে জগতে কত অঘটনই না ঘটে গেছে। আমি রাজকুমার, কাজেই তলোয়ার চালাতে জানি, তোমাকে নিয়ে যাবার সময় বাধা দিলে তোমার পিতা বা তাঁর অনুচরদের প্রাণ যাবে।'

'বাব্বা বাব্বা! এতই ভাল লেগেছে আমাকে ?'

'তোমাকে—হ্যাঁ নীলোফারকে। আমার জন্যে অসামান্য সুন্দরী আসমা, আর অপরূপা পারশ্য রাজ-দুহিতা শিরিনবানু অপেক্ষা করছে কিন্তু নীলোফারের কাছে তারা সাধারণ। তার জন্য আমি পৃথিবীর সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি।'

'মারহাবা! কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আপনার স্ত্রী নীলোফার নই।'

'আচ্ছা, যে ফকির বা দরবেশ তোমার যমজ বোনকে নিয়ে যান তাঁর নাম কি?'

'আব্বা বলেন, তাঁর নাম পীরচেঙ্গি।'

'পীরচেঙ্গি!'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ঠিক। নীলোফার তোমার বোন।'

'তাহলে আমি আপনার শালী?'

'কে আগে হয়েছিল?'

'সে।'

'তাহলে?'

'কি!' ভয় পেল যেন সারা। সে দ্রুত পালাতে চেষ্টা করল। ছুটে গেল ফরিদ। কিন্তু নিমিষেই হাওয়া। পাশের ঘরে সারাকে দেখতে পেল না। পাঁচ ছ'খানা ঘর খুঁজল। দেখল, কোথাও নেই সারা। বৃদ্ধ গওসুল আনাম অকাতরে নিদ্রিত।

নিজের বিছানায় এসে দেখল, আশ্চর্য, সারা শুয়ে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে! তার চাদর খুলে ফেলল।

সারা বলল, 'এই না না—দোহাই—আমি তোমার নীলোফার নই—বিশ্বাস করো—আল্লার কসম বলছি…'

ফরিদ সারাকে বিহ্বল করল। ভয়ঙ্কর রূপবান এই যুবকের স্পর্শ সারাকে উত্তেজিত করল। বাধা দেবার ক্ষমতা যেন কোথায় চলে গেল! ফরিদ তার বুকের কাঁচুলী খুলে ফেলল। গোলাপ রাঙা শঙ্খপেলব নিটোল দৃঢ় স্তন দুটি পরম আকর্ষণীয়। লজ্জায়

কাতর হয়ে অর্ধস্ফুট চোখে তাকিয়ে রইল সারা ফরিদের রহস্যময় সুন্দর দুটি চোখের দিকে। নাভিমূলের নিম্নে সেই রক্ততিল কোথায় ? দেখল, সত্যিই, এ মেয়ে সারা, নীলোফার নয়। তখন সে সংযত হল। বলল, 'আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আমি করজোড়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি—কিন্তু…।'

'দুষ্টু কোথাকার! হজের পুণ্য তোমার আর আছে তো ?'

বেদনার্ত স্বরে ফরিদ বলল, 'এটা কেন বলছ সারা ? ইচ্ছা করে আমি এই সামাজিক রীতি ভাঙার আংশিক অপরাধ করিনি। তবে আমি স্থির বিশ্বাস না পেলে হয়তো রক্তপাত ঘটত। এখন তুমি আমার আদরের শালী—এঁ্যা!' সারার হাত ধরে মাথায় চুমো খেয়ে বলল ফরিদ।

'আহা, সব দেখার পর!'

'তাতে কি।'

'কিছুই না ?'

'না।'

'মন বলছে ?'

হাসল ফরিদ। বলল, 'মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না।'

'তবে ? তাহলে আমাকেও বিয়ে করতে হবে।'

'এহ্! একেবারে রাস্তায়-প্রেম-করা অসহায় মেয়ের মতো শোনাল। শালীকে বিয়ে করা যায় না স্ত্রী বেঁচে থাকতে যদি তারা এক মায়ের পেটের দুই বোন হয়, এটা পবিত্র কোরআনের নির্দেশ।'

'তবে আর মায়া মহব্বত বাড়িয়ো না, তুমি তোমার মতো ঘুমোও আর আমি আমার ঘরে যাই। সকালে আব্বাকে সব কথা জানানো যাবে।'

'আচ্ছা! হায় রে—হৃদয়হীনা রমণী!'

'রমণী বলছ কেন ?'

'ওঃ! দুঃখিত! তুমি রমণক্রিয়ায় এখনো দীক্ষা পাওনি। তবে মহিলা ব'ভদ্রে অথবা সুভগে বলতে পারি—সংস্কৃত কাব্যে তেমন ব্যবহার আছে।'

'দুষ্টু! আচ্ছা, শুভরাত্রি।' সারা অন্যঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিল?

॥ ষোল ॥

ফরিদ অনেকক্ষণ জেগে রইল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

অতি মধুর অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় তারের বাজনা শুনে ঘুম ভেঙে গেল ফরিদের। ঘুমের মধ্যে অথবা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন থাকা-অবস্থায় সে এই মনোরম বীণার ধ্বনি শুনছিল কতক্ষণ কে জানে। কে এমন ওস্তাদী হাতে বাজনা বাজাচ্ছে?

ঘরের মধ্যে দীপাধার জ্বলছে। নীলাভ কাঁচের আলোয় সারা ঘর যেন স্বপ্নময়। ফরিদ দেখল অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র ঘরের একদিকে সাজানো রয়েছে। সে উঠে পড়ে একটি বাজনা-যন্ত্র এনে বিছানায় বসে বাজাতে শুরু করল। সারা দিল্লীর বিদগ্ধ নাগরিকরা এক সময় ফরিদের বাজনায় মুগ্ধ ছিলেন। তার কণ্ঠসঙ্গীত শুনে বাদশা বেগম সবাই কণ্ঠহার খুলে দিয়েছেন।

যে বাজনার ধ্বনি আসছিল কোনো এক অজানা পাতালপুরী ভেদ করে অবিকল সেই বাজনাই বাজাতে লাগল ফরিদ।

এরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। জটিল থেকে জটিলতর সুরধ্বনির টংকার শোনা যেতে লাগল। ফরিদও অবলীলাক্রমে সেই বাজনা বাজাতে লাগল। তারপর দ্রুতলয়ে উচ্চমার্গের ধ্বনি আসতে লাগল।

ফরিদ হার মানল না।

কবি গওসুল আনাম সহসা আবির্ভূত হলেন। তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে ফরিদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে পাশে বসলেন।

ফরিদ শুধোলে, 'আব্বাজান, কে এই ওস্তাদী চালে বাজনা বাজাচ্ছে বলুন তো?'

'এটা নিসর্গ একটা বাজনা—কোথা থেকে আসে কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে, কোনো এক ফেরেস্তা স্বর্গচ্যুত হয়ে এসে কেল্লার কোনো গর্ভগুহা থেকে বাজায়। কেউ বলে, সেনাপতি বদরগাজির কবর থেকে এই সুরধ্বনি আসে। কিন্তু এই ধ্বনির প্রতি-উত্তর আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি গোটা আরব-মিশর-পারশ্যের লোক। বড় বড় নামকরা যশস্বী সুরশিল্পীরা এসে কেল্লার গড়ে মানত করে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকে আর মাঝরাত্রে যেদিন বাজনা বাজে তারাও সেই সুর বাজাতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হার মানতে বাধ্য হয়। তুমি কি মনে করো এই বাজনায় তুমি শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যেতে পারবে—অথবা হার মানবে না, জিততে পারবে?'

ফরিদ মিষ্টি চোখে বিনয়ের হাসি হাসল শুধু। গুরুতর একপর্যায়ে এসেছে সুরধ্বনিটা। কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার পর হঠাৎ যেন খুব মিহি সুরে ভেসে আসে আসমান থেকে আর অত্যন্ত গুরুগম্ভীর নিনাদে শেষ হয়। তারপর হঠাৎ দ্রুততালে উচ্চনাদে শুরু হয়ে ক্রমে ক্রমে খাদে লয় পেয়ে যায়।

কবি গওসুল আনাম খুশী, ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন। শুধোলেন, 'যা শোনা যাচ্ছে তা কি ওস্তাদী হাত? বেসুর কিছু নয় তো?'

ফরিদ মাথা নেড়ে জানাল, 'না। খুব পাকা হাত। হয়তো অজেয় অথবা দুর্নিবার।'

উষার লগ্নকাল পর্যন্ত অদৃশ্যলোকের বাজনা বাজল, তারপর আর শোনা গেল না।

কিন্তু ফরিদ অত্যন্ত দ্রুতহাতে আর বিমোহিত মুদ্রায় সমুদ্র গর্জনের বাজনা বাজিয়ে চলল।

বিমূঢ় হলেন কবি।

তাঁর কন্যা সারা এই বাজনা বাজায়। যে তাকে বাজনায় হারাতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে এমন প্রতিজ্ঞা ছিল। বড় বড় রাজা উজিরের ছেলে এসে হার মেনে ফিরে গেছে। নিসর্গ

ধ্বনি কিছুই নয়। এই রকম কাব্য করে বলে হঠাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট বা ধ্যান-চ্যুত করে দিতে চেয়েছিলেন বোধহয় তিনি। কেননা তাঁর কন্যা সারা হার মানলে অখ্যাতি হবে, পরাজয় হবে সারার গুরু স্বয়ং তার পিতৃদেবের।

সারা এসে ম্লান মুখে দাঁড়াল।

পায়ের কাছে বসল ফরিদের।

ফরিদ বলল, 'দিল্লী থেকেই আমি শুনেছিলাম আরবের কোনো এক মহিলা নাকি বিচিত্র সব তারের বাজনায় জগৎ বিখ্যাত।'

সারা বলল, 'আপনার কাছে তো সে হার মেনে গেল দুলাভাই।'

'দুলাভাই?' শুধোলেন কবি গওসুল আনাম তাঁর মেয়ের দিকে নজর তুলে।

সারা বলল, 'হ্যাঁ আব্বা, ইনি নীলোফারের স্বামী, প্রথমে আমাকে নীলোফার মনে করেছিলেন। সে নাকি হজে এসেছে, অনেক জাদুবিদ্যার অধিকারিনী।'

'বলো কি! সে হজে এসেছে? আমার নীলু? তাকে যে দরবেশ পীরচেঙ্গি আমার দারিদ্র্যের সময় সামান্য কয়েকটি মুদ্রায় কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। পীরচেঙ্গির নাম শুনেছিলাম—তিনি নাকি অসীম ক্ষমতার মালিক, সিদ্ধপুরুষ।—তাই তুমি আমাকে আব্বাজান সম্বোধন করছিলে? নীলোফার কই? সে এখানে আসবে তো?'

ফরিদ বলল, 'তাকে খুঁজতেই তো আমি এসেছি কিন্তু সেই জাদুকরী এখন কোথায় জানি না। তাকে না পেলে আমার জীবন অসহায় অথবা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

'সারার তাহলে কি হবে? তার ওয়াদা পূর্ণ হবে কেমন করে? এখন জানা যাচ্ছে ও তোমার শ্যালিকা। ওকে তো শরিয়ত অনুসারে বিয়ে করতে পারবে না। আচ্ছা, নীলোফারের শরীরে এমন কোনো চিহ্ন আছে কি যা সারার সঙ্গে হুবহু মিল থেকে পৃথক করে দেয়?'

'জী হ্যাঁ, তার বুকের ঠিক মাঝখানে একটা কালো তিল আছে আর নাভিমূলের নিম্নে আছে একটি রক্তবর্ণ জড়ুল অথবা বড় তিল।'

'ঠিক ঠিক। সেই নীলোফার! ঠিক মনে আছে, আমার অতি স্নেহের কন্যা সে। অভাবে-অনাহারে পড়ে তাকে ফকিরকে বেচে দিয়ে খরমুজা, খেজুর আর দুধ কিনে এই সারাকে খাইয়েছিলুম। এ তখন ছিল অসুস্থ। যাক বাবা, তুমি যেও না। কিছুদিন থাক। নীলোফারের খোঁজ আমাকে পেতেই হবে। ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছি সমস্ত মদিনা-যাত্রী—নারী-পুরুষ নির্বিশেষ—যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যান—যেন গরিবের মুসাফিরখানায় পদধূলি দান করে যান।'

ঘোষণা মতো তীর্থযাত্রীদের সকলেই তাঁবু গাড়তে শুরু করল পরগনা-অধিকর্তা কবি গওসুল আনামের বাড়ির সামনে। উট-ঘোড়া আর গাধা-খচ্চরের ভিড় বাড়ল। একে একে প্রত্যেকে আসতে লাগল। দিন দুই পরে সন্ধ্যার সময় কালো বোরখা পরা এক রমণী তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। অপূর্ব সুন্দর বাঁ-হাতখানা বার করে দেখাল।

বৃদ্ধ কবি বললেন, 'মুখের নেকাব তুলুন। বোরখার মধ্যে ছদ্মবেশী ইহুদি পুরুষ আছে কিনা আমি পরীক্ষা করে নিতে চাই।'

মুখের নেকাব তুলে ফেলল খুব ধীর হাতে রমণীটি।

'একি! তুমি!' সবিস্ময়ে বললেন কবি।

'আমি একজন ভারতীয় রমণী—নাম আমার বেগম নীলোফার ফরিদ।'

'হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলছি মা, তুমিই আমার নীলু। আর আমি তোমার পিতা—আমারই ঔরসজাত কন্যা তুমি!'

নীলোফার বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি আমার পিতা! শুনেছিলাম বটে সাধক পীরচেঙ্গি আরবের এক গরিব মানুষের কাছ থেকে আমাকে কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি কি সেই গরিব লোক?'

'হ্যাঁ মা! সারা, দেখবি আয়, কে এসেছে। তোর দুলাভাইকেও ডাক।'

সারা আর ফরিদ এসে দেখল নীলোফারকে। নীলোফার

দেখল ঠিক তারই পূর্ণ অবয়ব নিয়ে তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি মেয়ে! আর ন্যাড়া মাথা গৌরাঙ্গ ফরিদ!

'তোমরা ছিলে যমজ বোন।' বললেন কবি গওস্সুল আনাম।

দুই বোনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

ফরিদ বলল, 'এমন করে হঠাৎ তুমি উধাও হলে কেন নীলু?'

হাসল নীলোফার।

অন্দরে তারা চলে গেল।

তাঁবু তুলে দিয়ে মদিনার পথে তীর্থযাত্রীদের যাবার হুকুম জারী করে দিয়ে গওস্সুল আনাম চলে এলেন অন্দরমহলে।

'আজ আমার বড় আনন্দের দিন—আমার হারানো নিধি ফিরে এসেছে। আমার চেয়ে ভাগ্যবান আর কেউ নেই।' বললেন বৃদ্ধ কবি। মেয়ে দুটির মাথা একত্র করে বুকে চেপে তার ওপরে গভীর স্নেহে চুম্বন করলেন।

নীলোফারের হাতে আংটি নেই, কাঁধে নেই ঝোলা, তাহলে আতসকাঁচ বা জাদুদণ্ডই বা কোথায়—ভাবতে লাগল ফরিদ। মাঝে মাঝে নীলোফার তার চোখ আর ঠোঁটের দিকে তাকাচ্ছে গভীর সমীক্ষার চোখে।

ফরিদ শুধোলে, 'তোমার আর সব জিনিসপত্র কোথায়, হঠাৎই বা চলে এলে কেন?'

'না এলে আজ তো আর এখানে দেখতে পেতে না! হয়তো খুরম বা শাহরিয়ার তাঁদের হারেমের বাঁদী বানাতেন আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়ে।'

'শাহরিয়ায় সম্বন্ধে এ দোষ দিতে পার না। সে আমাকে শ্রদ্ধা করে।'

'এতদিন সে বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ।'

'কেন কেন?'

'উটের হাওদা থেকে আমার তোরঙ্গটা আনিয়ে দাও এখনি—সমস্ত দৃশ্য দেখিয়ে দিচ্ছি।'

নির্দেশ মাত্রই দু'জন বাহক তোরঙ্গ আর জিনিসপত্র এনে নামিয়ে দিয়ে গেল

নীলোফার বললে, 'বাবা পীরচেঙ্গির দয়ায় আমি জগৎ-সংসারের প্রায় সব কিছু ঘটমান দৃশ্য ইচ্ছা করলেই দেখতে পাই। ফরিদও তা জানে কিন্তু ফরিদ কোথায় কেমন ভাবে ছিল মাঝে মাঝে আমি তা দেখেছিলাম। তার আত্মত্যাগ বা ভালবাসার একনিষ্ঠতা না থাকলে আমি আর কোনোকালেই দেখা দিতাম না।'

'তুমি জানো আমার হজ কবুল হয়েছে কি না?'

'আল্লাহ্ অসীম দয়াময় বলেই তোমার হজ কবুল করেছেন কিন্তু অর্ধেক কবুল হওয়াই উচিত ছিল কেননা তোমার মনের অর্ধেকটা ছিল 'বুবু'র দিকে।' বলে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সারা।

তার পিঠে চপেটাঘাত করল ফরিদ। বলল, 'এখন ওসব কথা থাক্—হিন্দুস্তানের ঘটনা দেখাও নীলু।'

তোরঙ্গ খুলল নীলোফার। আংটিটা পরে নিল। ধাতুর জাদু-দণ্ডটি আর আতসকাঁচখানা এনে কাঁচপাত্র ঢাকা আবলুস কাঠের দামী চৌপায়ার ওপরে রাখল।

বিড়বিড় করে 'এসম আজম' মন্ত্রপাঠ করার পর হাতের আংটি-টাকে একটু ঘষতেই সহসা খানিকটা আলো জ্বলে উঠল। দেখা গেল রক্তবর্ণ চেহারার একটা মানব। তার শিং আছে—ডানাও আছে—উপরের দিকটা পুরুষ, নিচের দিকটা নারী চেহারার—সে সালাম জানাল নীলোফারকে

নীলোফার বলল, 'অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, খুব ঘুমিয়ে নিয়েছ তো?'

'জী হ্যাঁ মা-জননী। বলুন, হুকুম কি?'

'এই ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে দাও আর দ্বারপাল হয়ে থাকো, যেন আমাদের এই ঘরে কেউ না প্রবেশ করে—অবশ্য আতসকাঁচের সাহায্যে বা জাদুক্রিয়ায় যেসব শরীরী বা অশরীরী চিত্রকে আনব তার ক্ষমতাকে যেন তুমি প্রতিরোধ না করো।'

'জী আজ্ঞা।' বলা মাত্রই উধাও হয়ে গেল আংটির জীনটি।' ঘরের মধ্যে হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় সব আলো নিভে গেল। ভয়ে অকস্মাৎ সারা ফরিদের কাছে ঘন হয়ে বসল। তার পিঠে হাত চাপড়ে অভয় দিল ফরিদ।

আতসকাঁচ তুলে মন্ত্রপাঠ করার পরই সেই কাঁচের পরিধি বেড়ে গেল আর ঝিলমিল করে আলো খেলা করতে লাগল।

নীলোফার বলল, 'প্রশ্ন করো ফরিদ, তুমি যা যা দেখতে চাও।'

ফরিদ প্রশ্ন করতে থাকল: 'হিন্দুস্তানের বাদশাকে দেখতে পাব কি?'

সহসা আতসকাঁচের ওপরে খুরমের মূর্তি ভেসে উঠল।

প্রশ্ন: 'বাদশা জাহাঙ্গীর কোথায়?'

তাঁর কবরখানা দেখা গেল।

'শাহরিয়ার কোথায়?'

দেখা গেল শাহরিয়ার কয়েদখানার মধ্যে—তার চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হয়েছে!

'বাদশা জাহাঙ্গীর যখন দিল্লী থেকে কাশ্মীরে তাঁর সখের জাহাঙ্গীর বাগে গেলেন তার ধারাবাহিক দৃশ্য আমরা দেখতে চাই।'

দেখানো হল বৃদ্ধ আতুর বাদশাকে কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। জাহাঙ্গীর বাগে অবস্থানকালে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। ঠাণ্ডায় বাদশার চোখ অন্ধ হয়ে গেল। তাঁর কষ্ট এবং বিলাপ। শেষে মৃত্যু। তাঁর শরীর গোপনে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর কবর হল। রাণী নূরজাহানের বিলাপ। শাহরিয়ার বন্দী। তাঁর চোখ উপড়ে ফেলার দৃশ্য। খুরমের অভিষেক। শাহজাহান উপাধি গ্রহণ।...

ফরিদ আর কোনো প্রশ্ন করল না।

আবার আতসকাঁচে আলো ঝিলমিল করতে লাগল।

বৃদ্ধ কবি শুধোলেন, 'মা, ভবিষ্যৎ কি দেখা যায়?' নীলোফার উত্তর দিল, 'না! অতীত এবং বর্তমান দেখা যাবে শুধু—ভবিষ্যৎ আল্লার হাতে। এখন এসব বন্ধ করে রাখি আব্বাজান।'

আবার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

ঘরে আলো জ্বলছে।

নীলোফারের দিকে বিস্ময় বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে বসে আছে সারা। আর তার বাবা কেবলই ফুরসী টানছেন গম্ভীর মুখে।

ফরিদ বিষণ্ণ; বিপন্ন যেন। খুরম তাহলে বাদশা হয়ে গেল? শাহজাহান নাম ধারণ করেছে—ভাবতে লাগল সে, আর সেই বা কি করতে পারত দিল্লীতে অসহায় ভাবে একা একা থেকে? নীলোফার থাকলে হয়তো তার জাত্নদণ্ডের জীনের সাহায্যে সৈন্যবাহিনী এনে লড়িয়ে কাবু করে দিতে পারত—সিংহাসনে বসিয়ে রাখতে পারত শাহরিয়ারকে।

সারা আতসকাঁচটাতে একটা আঙুল স্পর্শ করে দেখবামাত্র লাফ দিয়ে উঠল। বলে উঠল, 'উঃ! এযেন আগুন!'

নীলোফার বলল, 'হ্যাঁ, ঐ আগুনে-কাঁচ রক্ষা করা যার তার কাজ নয়। 'এসম আজম' না জানলে কোনো কাজেই লাগবে না।'

কবি শুধোলেন, 'কাঁচটা কিসের তৈরি বলে তোমার মনে হয়?'

'বহু রকমের ধাতুর কণা থেকে।'

'কে তৈরি করেছিল?'

'প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর দেশের এক পিরামিড প্রস্তুতকারক। নাম তাঁর আবু ইসহাক ইবনে ইমাম। এই আতস-কাঁচ পাওয়া যায় এক ফারাও রাজার পিরামিডের তলা থেকে। বাবা পীরচেঙ্গি এই জাত্নদণ্ড, আংটি আর আতসকাঁচ সেই পিরামিডের মধ্যে থেকে লাভ করেছিলেন।'

'পিরামিড-কবরের মধ্যে তো বিষাক্ত আরক থাকে—যে অর্থ বা অলঙ্কারের লোভে সেখানে যায় তারই মৃত্যু ঘটে!'

'বাবা পীরচেঙ্গিও তাঁর অজানা এক ক্ষমতার বলে সম্রাট দ্বিতীয় ফারাওয়ের কবরের মধ্যে দীর্ঘ সময় ছিলেন। কোহতুর পাহাড়ের পাথর চূর্ণ বা সাদা একরকম ভস্ম মেখে নাকি নেমেছিলেন তিনি।'

কবি বললেন, 'মানুষের ক্ষমতা দিন দিন এমন বাড়ছে, তার

বুদ্ধির এমন বিকাশ ঘটছে যে সে হয়তো গ্রহ-নক্ষত্রলোকেও চলে যাবে, সমুদ্রের তলায় গিয়ে বাস করবে!'

ফরিদ বললে, 'বাদশা জাহাঙ্গীরের রাজসভায় একজন ইংরেজ সাহেব এসেছিলেন, নাম তার টমাস রো—সাতসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন তুলোর তৈরি একটা বিস্ময়কর কাকাতুয়া পাখি। বাদশা সেটাকে দেখে বললেন, আমাদের দেশের শিল্পীরা কি এরকম কাকাতুয়া বানাতে পারে না? পরদিনই অনেকগুলো কাকাতুয়া বানিয়ে আনা হল। সাহেব তাঁর আসল কাকাতুয়াটি আর খুঁজে বার করতে পারলেন না।'

আহারাদির পর অনেক রাত পর্যন্ত গল্প-গুজব করতে লাগলেন কবি গওস্‌সুল আনাম তাঁর হারানো কন্যা নীলোফারের সঙ্গে।

পাশের ঘরে তখন সারা আর ফরিদ এক বিছানায় বসে কথা বলছিল। ফরিদ অন্যমনস্ক ছিল নানান চিন্তায়। আসমার কথা, বাদশার দুঃখময় শেষ জীবনের কথা, শাহরিয়ারের দুর্ভাগ্যের কথা, পারশ্যরাজ শাহ্‌ আব্বাসের কন্যা শিরিন বানুর কথা—নানান কিছু তার মনে পড়ছিল। তবু সৌভাগ্য যে খুরমের কবলে সে পড়েনি। পড়লে নীলোফারই বা তাকে কি এমন সাহায্য করত? খুরমের সৈনিকদের দ্বারা সে আহত হল, মন্ত্রসাধক ব্রাহ্মণ যদি তার আহত দেহ জুড়ে না দিতেন কি অবস্থা হত? পারশ্যরাজের অনুচররা যে তাকে মারধর করল তখন কি নীলোফার ঘুমিয়ে ছিল? সে কি আর তাকে ভালবাসে না?

সহসা সারা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা দুলাভাই, তুমি কার কাছে বাজনা শিখেছিলে?'

'ছেলেবেলায় মিয়া তানসেনের কাছে। তবে লোপামুদ্রা নামের এক লাবণ্যবতী বাঙালী রমণীর বাঁদরের কাছেই আমার সেতার, এস্রাজ, তানপুরা, বীণা, বেহালা সবকিছু শেখার প্রায় পূর্ণতা লাভ হয়।'

'বাঁদরের কাছে!'

'হ্যাঁ, সে বাঁদরটা ছিল সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ। মানুষের মতো পোষাক-আষাকও পরত। বিধবা লোপামুদ্রার জাদুমন্ত্রে সে বাঁদর হয়েছিল কিনা আমি জানতাম না। আমি যে বাঁদরের কাছে বাজনা শিখি এটা কেউ জানত না—জানত, লোপামুদ্রাই আমাকে শেখায়। বাঁদরটি চমৎকার লিখতে এবং ছবি আঁকতেও পারত। বছর খানেক শেখার পর হঠাৎ একদিন গিয়ে শুনলাম বাঁদরটা মারা গেছে। বিধবা মহিলা বুক চাপড়ে বিলাপ করছে। আমার বুকে মাথা চেপে ধরে খুব কাঁদল; তারপর আর যাই নি। কি হল তার আর জানি না।'

'আমাকে তুমি বাজনা শেখাবে?'

'ওয়াদার এখন কি হবে?'

লজ্জা পেয়ে সারা হঠাৎ ফরিদের বুকের মধ্যে মুখ লুকোল।

ঠিক সেই সময় নীলোফার ঘরের মধ্যে ঢুকল। দৃশ্যটি তার চোখে পড়ল।

ফরিদ বলল, 'দেখ নীলু, তোমার বোন ওয়াদা মতো বাজনায় হারলে তার সহধর্মিনী হবার কথা—এখন আমার কাছে হেরেছে, সেকথা জানাতে কেমন লজ্জা পেয়ে আমার বুকে মুখ লুকোচ্ছে দেখ।'

নীলোফার বলল, 'তুমি ওকে দেখে নীলু মনে করে কি রকম নাটক করেছিলে শোনাবে নাকি!'

সারা হঠাৎ ফরিদকে ধাক্কা মেরে নীলুর গায়ে উল্টে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল পাশের ঘরে।

ফরিদ উঠে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিয়ে এসে নীলুকে জড়িয়ে ধরল। শূন্যে তুলে ধরে নাচাতে লাগল।

নীলু বলতে লাগল, 'আরে ক্ষেপা পাগল, পড়ে যাব—দেখ দেখ —এই শোন, একটা ভয়ানক কথা আছে…'

'গুল!' বলে ফরিদ বিছানায় ফেলে দিল নীলোফারকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপরে।

'আরে, এই আনাড়ী, পাশের ঘরে একটা অভুক্ত মেয়ে রয়েছে, তার কথা ভাবো। আলো নিভিয়ে দাও, দুষ্টু কোথাকার!'

'এতদিনের বিরহের শোধ নেবো এবার!' বলল ফরিদ নীলোফারের সর্বাঙ্গে পাগলের মত চুম্বন করতে করতে।

যখন তারা শ্রান্ত হল, ক্লান্ত হল তখন অনেক রাত। কোথায় কোন বিরহী একটা পাখি ডাকছে।

ফরিদ হাতের ওপরে নীলোফারের মাথা রেখে তার গোলাপ গণ্ডের ওপরে আদর করে শুধোল, 'কেন তুমি হঠাৎ চলে এলে?'

'এই তো এখানে মিলিত হবার জন্যে! আমার জন্মদাতা পিতাকে খুঁজে পেলাম। আর যমজ বোনকেও পেয়ে গেলাম তোমার কারসাজিতে।'

'আমার কারসাজিতে কি রকম?'

'তুমি যদি মক্কা-মদিনার পথের এই চৌকিদার কবি গওস্মুল আনামকে না জানাতে আমার হজে আসার খবর তাহলে তদন্ত হত না। আমি ধরা পড়েও যেতাম না।'

'ধরা পড়ে কি খুব খারাপ হল?'

'না, খুব ভাল হয়েছে!' বলে নীলোফার ফরিদের নিচের ঠোঁটটা নিয়ে আদর করতে লাগল।

ফরিদ নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে শুধোল, 'কই, কেন হঠাৎ হজে পালিয়ে এলে বললে না তো?'

'এলাম, কয়েকটি কারণ ছিল। একটি, আমি তোমার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে এমনি ডুবে গিয়েছিলাম যে...'

'আস্‌মার মতো সুন্দরীর অমনভাবে পায়ে-পড়া দেখে স্বাভাবিক ঈর্ষায় জ্বলে উঠেছিলে, এই তো?'

'হয়তো তাই। হয়তো তাও নয়। তাহলে তখন কি হাসনু আর এলিজা ইত্যাদি কন্যাদের সঙ্গে তোমাকে মিশতে দিতাম? তুমি এসব রমণীয়তার মধ্যে যদি হারিয়ে যেতে সেই লাল মরকতের মসজিদে যাবার সুযোগ হত না।' একটু থামল নীলু, বলল,

'পথের মায়াবী প্রাচীর গাত্রের খোদিত পবিত্র কোরআনটি সাঙ্গ করার আগেই শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বা মায়াবী কন্যাদের লোভে যদি ফিরে আসতে তাহলে অন্যসব রাজকুমার বা বণিক পুত্রদের মতোই পাথর হয়ে যেতে। শুধু আমার জন্যই গোটা পৃথিবী থেকে এসব সুদর্শন কুমারদের আনা হয়েছিল। তারা কেউই আমার যোগ্য হতে পারেনি। রাজকুমারী আনা হয়েছিল শুধুমাত্র রাজকুমারদের ইন্দ্রিয় পরীক্ষার জন্য। সকলেই তারা প্রায় ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তোমার দ্বারা পীরচেঙ্গি অপমানিত হলেন, তুমি আমাদের লক্ষ্যস্থল ছিলে না, বরং খুরমকেই জাদুবলে হরিণ বা বাঁদর বানিয়ে আনার কথা ছিল কিন্তু পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়ে গেলে। যাই হোক, হাসনু বা এলিজাকে ভোগ করাব মধ্যে তোমার ইন্দ্রিয় চেতনা জানিয়ে দিয়েছিল তুমি শুধুমাত্র কামপরায়ণ নও। কাজেই আসমার সঙ্গে তোমার এই মাখামাখিতে আমি কিছুটা বিমর্ষ হয়েছিলাম মাত্র। আর আমাকে তুমি হঠাৎ ঘৃণা করেছিলে, উপেক্ষা করেছিলে, তোমার চোখের দৃষ্টিতে সেরকম ভাব ব্যক্ত হয়েছিল। বলো, হয়নি? এই, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?'

'এ্যাঁ, না, ঘুমুইনি। তোমার বোনের কথা ভাবছিলাম।'

'বটে! দুষ্টু কোথাকার!'

'আচ্ছা, জাদুদণ্ডের বড় জীন যেটা ওটা তোমার শরীর লেহন করছিল কেন? ওতো পুরুষ জীন, কাজেই ওকে তোমার মতো সতী-সাধ্বীর শরীর লেহন করতে দেওয়া কি উচিত হয়েছিল?'

'এই তোমার ঘৃণার আসল জায়গা! ও আসলে একটি নিসর্গ শরীর। আমার ইচ্ছা! আমার শক্তি! ওটা পীরচেঙ্গির শক্তি থেকে উদ্ভূত। ও নানান রকম মূর্তি ধরে বেরিয়ে আসে। আমি মানস করলেই ও ফেরেশতার বা বোর্‌রাকের রূপ ধারণ করতে পারে। ও আমার পদতল লেহন করে শক্তি সংগ্রহ করছিল শুধু নয়, পদসেবাও করছিল। ওর কাছে লুকোবার কিছু নেই।'

ফরিদ আর কিছু বলল না। চুপ করে ভাবতে লাগল॥

নীলোফার হয়তো তার কাছে জাদুদণ্ডের আসল ব্যাপার গোপন রাখতে চায়। এসব কথা শুধু ভাববাদের কথা। তার মনে হচ্ছিল অলৌকিকতার একটা জগৎ আছে। নইলে বোররাক জিনিসটা কি যা হজরতকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল? জাদুদণ্ডটি বোধ হয় মিশরের পিরামিডের মধ্যে থেকে উদ্ধার করা জিনিস। আংটিটারও অনেক রহস্য আছে। যা পীরচেঙ্গি জানতেন। নীলোফার হয়তো জানে না। ফরিদের মনে পড়ে তার মা গুলনার কোনো একদিন বলেছিলেন, 'বাবা ফরিদ, ঐ বৃদ্ধ পীরটির সঙ্গে কখনো দুর্ব্যবহার করবে না। উনি ইচ্ছা করলেই তোমাকে উট, ঘোড়া, ছাগল, বাঁদর যাহোক বানিয়ে দিতে পারেন।'

ফরিদ খুব হাসত। বলত, 'ঐ বুড়োটা একটা ঠগ, জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী। ওকে দেখলেই আমার অপমান করবার ইচ্ছে হয়।'

'না না, তা করো না, বাদশা তাহলে খুব অখুশী হয়ে দেশ থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবেন। পীরচেঙ্গির একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। সবই তিনি পড়তে পারেন। বাদশার কাছে কোনো বিদেশী লোক এসে তাদের ভাষায় কথা বললে কেউ যখন বুঝতেন না, ঐ পীরচেঙ্গি বলে দিতেন।'

পীরচেঙ্গি সব ভাষা পড়তে পারতেন। তিনি নাকি সমস্ত প্রাণীদেরই ভাষা বুঝতে পারতেন। এই ক্ষমতা তিনি কেমন করে অর্জন করলেন? নিশ্চয় আধ্যাত্মিক সাধনার বলে!

নীলোফার অঘোর নিদ্রায় এখন অচেতন। তার নাসাধ্বনি হচ্ছে মৃদুমন্দ।

জাদুদণ্ডটির গায়ে বিচিত্র নকশা। নকশার মধ্যেই আরবী অক্ষরের মতো বিচিত্র বর্ণমালা। যা ফরিদ আদৌ পড়তে পারে না। সে খুব ভাল আরবী, ফরাসী, উর্দু, হিন্দী জানে। কিন্তু এ কোন যুগের ভাষা? মনে হয় জাদুদণ্ডের এই ভাষাটিই হল এর ভিতরকার শক্তিকে জাগ্রত করবার মন্ত্র! যা পড়তে পেরেছিলেন পীরচেঙ্গি। কিন্তু তা তিনি কেমন করে পারলেন? কাজেই রুপোর এই

জাত্নদণ্ডটি চুরি করে নিয়ে গেলেও কেউ কাজে লাগাতে পারবে না। নীলোফার কি পড়তে পারে? নইলে ও বিড় বিড় করে কি মন্ত্র বলে যখন জাত্নদণ্ডটির বন্দী শক্তিকে জাগায়? হয়তো ও বর্ণমালাটি পড়তে জানে না। পীরচেঙ্গি কি ওকে মন্ত্রটির স্পষ্ট উচ্চারণ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন? মন্ত্রটি কি করে শেখা যায়?

সকালে নীলোফার গোসল সেরে নামাজ পড়ে এসে সারার বাজনা শুনছিল—মসজিদ থেকে ফরিদ ফিরে আসার পর তাকে সে বলল, 'আমি ফজরের নামাজের পর যেই শেষ সেজদায় গেলাম হঠাৎ যেন কেমন এক ঘুম ঘুম আচ্ছন্ন ভাব হতে লাগল। আমি কিছুক্ষণ বোধহয় অজ্ঞান বা ভাব-সমাধিতে ছিলাম। সেইটুকু সময়ের মধ্যে আমি একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি।'

'কি দৃশ্য নীলোফার?' শুধোলে ফরিদ নীলোফারের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে।

সারা তখনো পাশের ঘরে খুব মিহিস্থুরে আপন খেয়ালে বাজনা বাজাচ্ছিল। অপূর্ব বেহাগের স্থর।

নীলোফার বলল, 'হঠাৎ আমি একটি অন্য জগৎ দেখলাম। যাকে মানুষ বেহেশ্‌ত বলে। দেখলাম তোমার ঘর। তোমার বাগান। কি চমৎকার!'

'আশ্চর্য! আমার বেহেশ্‌তের ঘর? আমার বাগান?'

'হ্যাঁ, সেখানে কত বিচিত্র রঙের অপূর্ব ধরণের ফুল আর ফলের গাছ। সবুজ ঝর্ণার পানি নেমে আসছে ত্নধের মতো সাদা পাহাড় থেকে। রক্তের মতো লাল চকচকে পাথরের বাড়ি। ভেতরে মখমলের নরম বিছানা। মেঝেয় দামী গালিচা পাতা। গাছে গাছে পাকা আপেল, বেদানা, আঙুর, খেজুর—আরো কত মেয়া ফল। বাগানটির চারদিকে হলুদ পানির নদী। তীরে লাল শরখড়ির বনের পাশে পাঁচটি সারস আর পাঁচটি হরিণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি মনোরম আবহাওয়া। বিত্ন্যতের আলোর মতো জ্যোতির্ময়ী হুর দেখলাম পাঁচটি—হাতে তাদের ফুলের মালা। তাদের কি অপূর্ব টানা টানা

চোখ। কি নধর মনোরম ভঙ্গি। আর তোমাকে হঠাৎ দেখলাম, সে কি জ্যোতির্ময়ী রূপ। তুমি একটি হুরের হাত ধরতেই সে তোমার কোলের ওপর ঢলে পড়ল। তারপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। দেখলাম, একটা বিরাট চিতার আগুনে বিরাট দেহী দানব আমার লাসটাকে ভুট্টার মতো করে পোড়াচ্ছে আর তার ওপরে লোহার হাম্বর কষাচ্ছে। আমি চিৎকার করে উঠলাম। তন্দ্রা ছুটে গেল। জেগে দেখি সারা আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। সে বললে, 'আমি নাকি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গোঁ গোঁ করছিলাম—আব্বাও সে দৃশ্য দেখেছেন।'

ফরিদ চুপ করে বসে রইল; নীলোফারের এই কাহিনীটি বলার উদ্দেশ্য কি ভাবতে লাগল। তাহলে তাকে নির্বাসন দেবার ষড়যন্ত্র করছে নাকি নীলোফার! যদি সে বেহেশতটি দেখতে চায় সঙ্গে সঙ্গে জাদুদণ্ডের দ্বারায় সেখানে পৌঁছে দিতে পারে। আর দোজখের শাস্তি পাবে নীলোফার? তার অর্থ সে একজন পাপী এই কথা ভাবলেই ওর ওপরে ঘৃণা জন্মাবে। নীলোফার কি অন্য কিছুতে অন্যমনস্ক? খুরমকে কি সে পেতে চায়? যে তার মনোনীত লক্ষ্যবস্তু ছিল? নইলে খুরম তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাকে হত্যা করতে চেয়েছে, শাহরিয়ারকে অন্ধ করে দিয়েছে, তবু নীলোফারের হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে সে জব্দ করতে চায় নি কেন?

হঠাৎ নীলোফার শুধোলে, 'কি ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি, আমার মতো পাপী বেহেশত পাবে কেন?'

নীলোফার কিছু বলল না।

কবি গওসুল আনাম এলেন, শুধোলেন, 'আচ্ছা মা নীলু, তোমার এ ধরনের মূর্ছা আর কখনো হয়েছিল?'

'না, আব্বাজান।'

'এটা মৃগীরোগ নয় তো?'

নীলোফার বলল, 'না।'

'তাই ভাল। না হলেই ভাল। সিদ্ধপুরুষ রমণীদের ভাব-

সমাধির কথা শোনা যায়। এটা হয়তো তোমার সেই ধরনের কিছু।'

নীলোফার বলল, 'আব্বাজান, সারার এবার বিয়ে দেওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ মা, ওর প্রতিজ্ঞা ছিল বাজনায় যে ওকে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে কিন্তু ফরিদের কাছে হারলেও তাকে তো শরিয়ত অনুসারে বিয়ে করতে পারছে না।

'আপনি অন্য কোনো ছেলে দেখেছেন?' শুধোল ফরিদ।

'পারশ্যরাজের পুত্র শাহ পারভেজকে আমার বড় পছন্দ, তবে সারা যদি পছন্দ না করে?'

'মুসলিম মেয়ে যখন তখন তার মতামতই আসল। সে না সম্মতি জানালে কারো ক্ষমতা নেই বিয়ে দেবার। তবে মা বাবা বা আত্মীয় স্বজনরা—সংসার সম্বন্ধে যাঁরা অভিজ্ঞ—তাঁরাই চিরকাল সম্বন্ধ ঠিক করে দেন! বাপ-মা কখনো কি সন্তানের মন্দ কিছু চান? আপনি কি মনে করেন সারা আপনার অবাধ্য কাজ করতে পারে?'

'না না না—সে চিরকাল লক্ষ্মী মেয়ে—কখনো অবাধ্য হয় নি। তাকে বিয়ে করার জন্যে আরব, দামেস্ক, ইরানের অনেক নামজাদা পরিবারের সুদর্শন তরুণরা পাগল! সারার তস্‌বির বা ছবি অনেক শিল্পী এঁকেছেন এবং তা বেশ উচ্চ মূল্যেও বিক্রি হয়। ওর এবার আঠারো বছর বয়স পার হয়ে গেল, বিয়ে দেওয়া দরকার। ভেবেছিলাম আল্লা এক সময় নিশ্চয় ওর মনোনীত কোনো অতিথিকে গরিবের সরাইখানায় পাঠিয়ে দেবেন। এখন তুমি যদি সহযোগিতা করো মা, তাহলে সুব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, আমি দেখছি, সারার সঙ্গে কথা বলছি।'

॥ সতেরো ॥

সারা এসে বললে, 'বাইরে একটা লোক এসেছে কি রকম দেখবে চলো আব্বা। সে নাকি জাদু জানে! একটা গাধার পিঠে অনেক ঝুলি-ঝাপ্পা চাপিয়ে নিয়ে এসেছে! হিন্দুস্তানের বিখ্যাত জাদুকর নাকি। লোকটার গায়ে গেরুয়া পোষাক। কপালে চন্দনের রেখা। বেশ সুন্দর দেখতে লোকটা। সে জাদু দেখাতে চায়। তার বিনিময়ে কিছু সোনা-রুপো দিলেই হবে নাকি। চলো না, সবাই দেখি। বুবুর চাইতেও সে বেশি জাদু জানে কিনা দেখবে।'

বৃদ্ধ কবি বললেন, 'আচ্ছা, বারান্দা মহলের ভেতরে বসতে বল।'

জাদুকর এলো। বলল, 'আপনারা কে কি দেখতে চান?'

সারা বলল, 'আমি বলব?'

নীলোফার অনুমতি দিল। সারা তখন বলল, 'আপনি হিন্দুস্তানের সব চাইতে ভাল কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াতে পারেন?'

জাদুকর বলল, 'আয়রে জমুরে, আয় আয় আয়, খাওয়া দিদিকে হিন্দুস্থানের সেরা মিষ্টান্ন রসগোল্লা, সন্দেশ, ক্ষীর, মোহনভোগ, রাবড়ি। নিন, আপনারা খেতে থাকুন।'

নীলোফার ফরিদ অবাক হল। জাদুকর হাত বাড়িয়ে এক একটা খাবার ভরা পেয়ালা ধরে দিল তাঁদের। বলল, 'ভয় নেই, খান আপনারা, আমিও খাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে।' লোকটা টপাটপ খেতে লাগল।

'ফল খেতে চান, আপেল, বেদানা, আনারস, কলা, আঙুর, আম, পেঁপে, সবেদা, আতা,'...কলার সঙ্গে সঙ্গে ফলগুলো এসে হাজির হতে লাগল।

জাদুকর ঝোলার ভেতর থেকে একটা মড়ার মাথা বার করে রেখে বলল, 'এটা একটা রক পাখির ডিম। এর অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। এর কাছে আমি যা চাইব তাই পাব।...'

হিন্দুস্তানের অতি অদ্ভুত খেলা দেখাবার কথা বলছে যখন জাদুকর তার চোখের তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টি নীলোফারকে বিচলিত করে তুলল। সে হঠাৎ এক ফাঁকে অন্দরের মধ্যে চলে এলো এবং 'এস্‌ম্‌ আজম' পড়ে জাদুদণ্ডের জীনকে হাজির করল।

জীন এলে তাকে শুধোল, 'কে এই জাদুকর? কি জন্যে এখানে এসেছে?'

জীন বলল, 'এই জাদুকরের নাম জীতেন্দ্র সরকার। যে রক পাখির ডিমটি দেখাচ্ছে ওটি আসলে পাঁচ হাজার বছরের মিশরীয় আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিক আবু ইসহাক ইবনে ইমামের মাথা। একুশ রকমের বৈজ্ঞানিক অদ্ভুত অলৌকিক জিনিস তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। রাজা ফেরাউন বা ফারাও তাঁর সাহায্যেই নানান দৃশ্য, অদ্ভুত কিছু দেখাতেন। যেমন দেখাতেন, এই তিনি গম ছড়িয়ে দিলেন আর তখনই গাছ গজিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গাছে গাছে পাকা গমশীষ দুলতে লাগল।...'

'ছাড়ো ওসব কথা, জীতেন্দ্র সরকার কি চায়?'

'আপনাকে নিয়ে যাবে। আমি ঠেকাতে পারব না। বৈজ্ঞানিকের প্রেতাত্মা আপনাকে চায়। জাদুদণ্ড তাঁর মূল আবিষ্কার। ওটির প্রতি মোহ আছে। আর জীতেন্দ্রকে রোজ রোজ একটা করে মানুষ খুন করে ওঁকে রক্ত দিয়ে পিপাসা নিবারণ করতে হয়। আজ আপনাকে চেয়েছে। আমি আমার প্রভু বৈজ্ঞানিকের আজ্ঞাবহ। এক বছর আপনাকে উনি উপভোগ, শোষণ, লেহন করবেন। এক বছর পরে মুক্তি পাবেন। আপনাকে পাওয়া মাত্র জাদুকর জীতেন্দ্রর মৃত্যু ঘটবে। আমাকে আপনি ঐ মড়ার মাথাটার বিরুদ্ধে কিছু ফরমাস করবেন না।'

ফরিদের কথা—বাবার কথা—সারার কথা একবার ভাবল

নীলোফার। তার কান্না পেল। পীরচেঙ্গিকে স্মরণ করল। হঠাৎ তার মনে হল সে নামাজের পর কেন নারকীয় দৃশ্য দেখেছিল আর তার শিকারই বা হল কেন।

বলল, 'বৈজ্ঞানিকের কি আমাকে পাবার একান্তই ইচ্ছা।'

'জী হ্যাঁ।'

'সারাকে দিলে তিনি খুশী হবেন না?'

'না।'

'ঠিক এক বছর পরে আমি মুক্তি পাব?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁর আত্মা পরিতৃপ্ত হবে? আর ওঁকে প্রতিদিন একটা করে ানুষ দান করতে হবে না?'

'না। এখন ওয়াদা মতো আজ জাদুকর জীতেন্দ্র যাতে না ়কজন মানুষ পায় তার ব্যবস্থা আমি করতে পারি কিন্তু বৈজ্ঞানিকের াথাটিকে আপনি কাপড়ের ভেতরে যতক্ষণ নিজের কোলের মধ্যে াখবেন ততক্ষণ তিনি আর আহার চাইবেন না। তারপর দেখুন, ামি কি করি।' বলেই জাদুদণ্ডের জীনটি হঠাৎ মিলিয়ে গেল।

নীলোফার পাশের কামরায় এসে যেমন বসেছিল তেমনি বসল। ়সতেই অনুভব করল একটি ঈষৎ গরম গোলাকার বস্তু তার কোলের ধ্যে চলে এসেছে। আর মেঝের ওপরে একটি রক পাখির ডিমের শূন্য খোলস গড়াগড়ি যাচ্ছে।

জীতেন্দ্র শুধোলে, 'এটাকে তাহলে আমি ভাঙতে পারি?'

নীলোফার বলল, 'হ্যাঁ, ভাঙুন।'

'কিন্তু মহা অনর্থ হবে যে...।'

'হোক।'

'যদি আপনাদের জীবন যায়?'

'যাক।'

'পরীক্ষা করেছেন আপনারা?' জীতেন্দ্র তার ঝোলার ভেতরে হাত দিয়ে বলল, 'তবে তাই হোক। মারলাম আমার এই লৌহদণ্ড।'

দেখা গেল ডিমটির খোসা গুঁড়ো হয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রকট এক ধোঁয়ার জাল বিছিয়ে গেল।

ধোঁয়ার অন্ধকার কাটার পর দেখা গেল জীতেন্দ্রর দেহটা পড়ে আছে। মুখের রক্ত তার গড়িয়ে পড়েছে ছ'পাশে। নীলোফার নেই।

পাশের ঘরে এসে দেখল ফরিদ—নীলোফার নেই। নেই তার জাছদণ্ড। আতসকাঁচ বা আংটি এবং পোষাকও।

নীলোফারের কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না।

বৃদ্ধ কবি হতভম্ভ।

রাজ দরবারে সংবাদ গেল। এক ভারতীয় জাছকর তার জাছবিদ্যা দেখাতে দেখাতে হঠাৎ মারা গেছে, আর তার মড়ার মাথাটি প্রচণ্ড ধোঁয়ার মধ্যে গায়েব হয়ে গেল—নিয়ে গেল বৃদ্ধ কবি গওস্তুল আনামের যমজ কন্যার একজনকে, যে সবেমাত্র পরিচিত হয়েছিল হজ থেকে ফেরার পথে। এই কন্যাটিকে তিনি ভারতীয় এক দরবেশের কাছে বিক্রি করেছিলেন দীর্ঘ বারো বছর আগে।

এই কাহিনী পল্লবিত হয়ে ছুটল চারদিকে।

॥ আঠারো ॥

জাদুকর জীতেন্দ্রর কবর দেওয়া হল পাহাড়ের মাথার ওপরে। দিন যেতে লাগল। কিন্তু নীলোফারের আর দেখা মিলল না। ফরিদ ঘোড়া নিয়ে বিষণ্ন মনে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। রাত হলে ফিরে আসে। আপন মনে বাজনা বাজায়। সারা এসে বলে, 'তোমার কি মনে হয় নীলোফার বেঁচে আছে? আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'

ফরিদ বলল, 'কি জানি!'

'তাহলে?'

'আমি একমাস আর এখানে থাকব।'

'তারপর?'

'জানি না।'

সারা অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে রইল জানালা দিয়ে দূরের খেজুর কুঞ্জের দিকে। তারপর সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, 'দুলাভাই, নীলু হঠাৎ এমন করে গায়েব হয়ে গেল কেন? যদি চলেই যাবে তবে দেখাই বা হল কেন? কি অপরূপ তার চোখ, নাক, ভ্রূ-ভঙ্গি আর জোৎস্না-স্নাত গায়ের রঙ। কিশোরীদের মতো কচি কিশলয় মুখ। ঠোঁট দুটো কি রক্তাভ।'

'তুমিও কম নও!' হাত ধরে কাছে টেনে বলল ফরিদ। 'কোথাও কোন দূর মরুভূমি পাড়ি দিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে ফেরার পর এমন কোমল পদ্মবাহু যদি নিজের বুকের ওপরে চেপে ধরতে পারি তাহলে তৃষ্ণা মিটে যায়।'

'তুমি থাকো না দুলাভাই! না তুমি যেও না। বলো, থাকবে?

ও যদি আর না আসে? জানো, আমার মনে হয় নীলুকে সেই জাদুকরের রকপাখির ডিমটা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'সারা!' চিৎকার করে উঠল ফরিদ। 'তুমি কি করে এসব জানলে?'

সারা বলল, 'ওটা আসলে কোনো সক্রিয় জাদুযন্ত্র। যখন ওটা ফেটে গেল আব ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল আমি স্পষ্ট দেখেছি একজন অতি কৃষ্ণকায় কিন্তু সুদর্শন পুরুষ আমাকে ধরতে এসেছিল তারপর হঠাৎ আমার পাশ থেকে নীলুকে তুলে নিয়ে চলে গেল।'

'তুমি স্পষ্ট দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সেই লোকটাই মিশরের বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক যার নাম আবু ইসহাক ইবনে ইমাম। আমি জীতেন্দ্র সরকারের স্মরণ-লিপি থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি। তার ঝোলার মধ্যে অনেক কিছু ছিল। যেমন এক রকমের জামা, যা খুবই মসৃণ চকচকে। মুখোস আছে। দূরবীন আছে। এক রকমের গুঁড়ো আছে যা গায়ে মাখলে আগুন বা পানি স্পর্শ করে না। এক রকমের বড়ি আছে যা খেলে কয়েকদিন আর খিদে পাবে না। আর তার স্মরণ-লিপিতে বাংলা ভাষায় লেখা আছে মিশরের পিরামিডগুলোর ভেতরকার বহু বিচিত্র তথ্যের কথা। বাজা দ্বিতীয় ফারাওয়ের পিরামিডের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবু ইসহাক ইবনে ইমামের মাথা ছিল। সেই মাথাটাই আসলে খোলস মোড়া রক পাখির ডিম। সেটা সক্রিয়ঃ ভৌতিক ক্রিয়া-কলাপ করতে পারে। আবু ইসহাক এখনো জীবিত, তার প্রেতাত্মা নাকি প্রতিদিন একটা করে মানুষ খেত। মানুষের সমস্ত রক্ত শুঁষে নিত। গত পরশু রাত্রে আমি একাকী দোর খুলে বেরিয়ে যাই ঘোড়ায় চেপে। রাত বারোটার পর যাই জাদুকর জীতেন্দ্রর সমাধির কাছে। চারদিকে কোকাফ অন্ধকার। হাতে আমার মশাল। পাহাড়ের উপত্যকায় চেরি আর ঝাউ, দেবদারু গাছের জঙ্গল। কেমন যেন ভয় করতে লাগল। হঠাৎ যেন একটা শব্দ হতে লাগল

কবরের ভেতর থেকে। ব্যথাকাতর কান্নার ধ্বনির মতো। কেউ যেন গলা টিপে ধরেছে। শাস্তি দিচ্ছে কোনো লোকের। ক্রমেই সেই চিৎকার বাড়তে লাগল। তারপর দুজন লোকের কথোপকথন শোনা গেল :

'আমি হলাম পীরচেঙ্গি, তুই আমার শিষ্যত্ব করতে এসেছিলি বিহারের সাসারামে। তারপর মিশরের পিরামিডের গল্প শুনে নিয়ে হাজার নিষেধ সত্ত্বেও বিজ্ঞানী জাদুকরের মাথা তুলে আনলি আর তার প্রেতাত্মকে হাজার খানেক মানুষ খাওয়ালি। মানুষ হত্যার সেই পাপ এখন তোর কোন বাবা ঠেকাবে? তিন বছরের শিশু সন্তানকেও তুই চুরি করে তাকে খাইয়েছিস। সেই বিশ্বাসঘাতক বিজ্ঞানী বলেছিল, আমি পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ চাই, ভবিষ্যৎ স্বর্গবাস চাই না। এখন তার প্রেতাত্মা শুধু রক্ত মোক্ষন করে, কিন্তু শরীর ধারণ করতে পারে না। তার পিপাসা মেটে না। তুই শেষ পর্যন্ত আমার নীলোফারের সর্বনাশ ঘটাবার জন্যে দেশে দেশে ঘুরেছিস। আমি তাকে স্বপ্ন দেখিয়ে হঠাৎ ভারতবর্ষ থেকে সুদূর আরবে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে প্রার্থনারত ছিলাম। লোকচক্ষুকে ফাঁকি দেবার জন্যে আমি হঠাৎ মৃত্যু বরণ করার ঘটনা ঘটিয়েছিলাম। আসলে আমি বেঁচে আছি। চেহারা বদল করেছি। আর আল্লার করুণায় আমি প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমি পশু পাখিদের ভাষা বুঝতে পারি।'

'দয়া করে আপনি আমার গলাটা একটু ছেড়ে দিন।'

'ছাড়ব? আরো কষে ধরব। বেটা বেদ্বীন বেইমান। তুই জানতিস না নীলোফার আমার মেয়ে? জানতিস না ফরিদ আমার জামাই। আর সেই জামাইয়ের হৃদয়ের পর্দায় আমি সারা কোর-আন শরীফখানা লিখে দিয়েছি। তোর সেই বিজ্ঞানীর সাধ্য কি ফরিদকে মারে? নীলুকেও কি সে হত্যা করতে পারবে? তবে কষ্ট দিচ্ছে। আমি ভয় পাচ্ছি সে নীলোফারের দৈহিক শুচিতা নষ্ট করতে পারবে কিনা সেই ভেবে।'

'দোহাই পীর সাহেব, আপনার ছুটো পায়ে ধরি, আমাকে মাফ করুন। ক্ষমতার আমি অপপ্রয়োগ করেছি।'

'হ্যাঁ। আমি ইচ্ছে করলেই ফরিদকে ভারতের সিংহাসনে বসাতে পারি। কিন্তু বাদশা শাহজাহান আমার পরম ভক্ত। তাছাড়া ফরিদ গোটা পৃথিবী বিচরণ করে জ্ঞানলাভ করুক। আর তার হাতেই তোমার প্রেতাত্মার মুক্তি হবে। সে এসে গেছে তোমার কবরখানায়। সে যদি…'

হঠাৎ একটা বিকট শব্দে সমস্ত পাহাড়খানা যেন ফেটে গেল। বিরাট একটা জ্যোতি কবরটাব মধ্যে থেকে বেরিয়ে জ্বলতে জ্বলতে মহাশূন্যে, দিগন্তের দিকে চলে গেল। মশালের আলোটাও তার সঙ্গে চলে যায়…'

অন্ধকারে ভয় পেয়ে প্রায় মূর্ছিত হয়ে গেলাম আমি। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরতে হঠাৎ দেখলাম আমার পাশে এসে বসেছে একটি রক্তমাংসশূন্য কংকাল দেহী। সে বলল, 'আদাব আরজ, যুবরাজ ফরিদ সাহেব! আমি জীতেন্দ্র সরকার বলছি।'

আমি সাহস করে বললাম, 'বলুন, কি বলতে চান আপনি?'

'কি জন্যে আপনি এসেছেন?

'আমি আপনার ঝোলার মধ্যে অনেক তথ্য পেয়েছি। বলুন, নীলোফার এখন কোথায়? আর কি জন্যেই বা কবি গওস্থল আনামের গৃহে আপনি পদার্পণ করেছিলেন। যে রক পাখির ডিমটা দেখিয়েছিলেন সেটা এখন কোথায়?'

'জানি না। নীলোফার যে জাতুকরী ছিল তা আমি জানতাম না। কিন্তু একটা মানচিত্রের আলোকে ঐ রক পাখির ডিমরূপী এক মিশরীয় বিজ্ঞানী জাতুকরের মাথা জানিয়েছিল এখানেই তার তৈরি জাতুদণ্ড, আতসকাঁচ এবং আংটি আছে। ভেবেছিলাম হয়তো সেটা বুড়োর কাছেই আছে।'

'মিথ্যে কথা বলছেন, পীরচেঙ্গির জাতুদণ্ড আরবের কবি গওস্থল আনামের কাছে যাবে কেমন করে? তার মেয়ে নীলোফার পাবে

না কেন? অথবা আমার কাছে থাকবে না কেন, এটা কি আপনি ভাবেন নি?'

'ভেবেছিলাম। আপনার কাছেই আছে ভেবেছিলাম। তাই আপনাকে বিজ্ঞানীর প্রেতাত্মার সেদিনকার আহার্য রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম।'

'জাতুদণ্ড আমাকে রক্ষা করতে পারত না?'

'না।'

'ঠিক আছে। গায়ে হাত দেবেন না। এইমাত্র যেসব কথোপকথন শুনলাম তাতে জানতে পারলাম নীলোফার এখন মিশরের পিরামিডের তলায় বন্দিনী হয়ে আছে। তাকে উদ্ধার করার উপায় বলে দিন।'

'তাহলে আমার আত্মার উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেবেন? আপনি পারবেন কেননা পীরচেঙ্গি উদ্ধারের কথায় বলেছিলেন ফরিদ যদি...'

'ফরিদ যদি...সেটা কি?'

'জানি না।'

'তাহলে?'

'আপনাকে আমার কবরের মধ্যে বন্দী করে রেখে দেবো যদি ব্যবস্থা না করেন।'

'কি আশ্চর্য, আমি তো জানি না।'

'আপনি জানেন না—হা হা হা—হা হা হা'—অট্টহাস্য করতে লাগল জীতেন্দ্র সরকারের প্রেতমূর্তি। আমাকে ধরে নিয়ে তার কবরের মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করল। দু'হাতে এমন জোরে গলা টিপে ধরল যে আমার দম আটকে মারা যাবার উপক্রম।'

ফরিদ বলতে লাগল সারাকে, 'আমি তখন বললাম, দোহাই তোমার ছেড়ে দাও, আমাকে মারলে তোমার প্রেতাত্মার উদ্ধার হবে কেমন করে?'

তখন জীতেন্দ্র বলল: 'তবে আপনি আপনার পবিত্র ধর্মগ্রন্থ

পাঠ করতে থাকুন যা আপনার হৃদয়ের পর্দায় লেখা আছে। আপনাকে মারা যাবে না কিন্তু যন্ত্রণাভোগ থেকে আপনার রেহাই হল!'

'একটা শর্তে আমি পবিত্র কোরআন পাঠ করতে পারি যদি মিশরের দ্বিতীয় ফারাওয়ের পিরামিডের মধ্যে নীলোফারের কাছে আমাকে তুমি পৌঁছে দাও এবং নিরাপদে তাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করো।'

'বেশ আমি রাজি।'

'আমি যেই কোরআন শরীফ পাঠ করবার জন্য তৈরি হলাম অমনি কানের ওপরে ফিসফিস ধ্বনি শুনতে পেলাম, খবরদার, কোরআন শরীফ পড়া খতম করলেই জীতেন্দ্রর আত্মা মুক্তি পেয়ে যাবে আর তার হদিস পাবে না।'

ফরিদ বলতে লাগল, 'তখন আমি পট্টি মেরে বললাম, আত্মার শান্তি শুভ শুক্রবারই প্রশস্ত। কিন্তু শুক্রবার তো আজ নয়। আর কোরআন শরীফ পাঠের পর তোমার আত্মা যখন উদ্ধার পেয়ে যাবে তখন তোমাকে আমি ধরব কেমন করে? তার চাইতে তুমি আমার বাহন হয়ে থাকো—তোমাকে দিয়ে আমি অনেক কাজ করাব —তোমার যখন ইচ্ছা মুক্তি চেয়ে নিয়ো।'

জীতেন্দ্র তখন বলল : 'বেশ তাই হবে। তিনবার টুসকি মেরে আমার নাম উচ্চারণ করলেই আমি হাজির হব। আমি ঘোড়া, হাতী, উটপাখি যে কোনো মূর্তি ধারণ করতে পারব। কিন্তু বাঘ হয়ে যদি হঠাৎ দেখা দিই যেন তলোয়ার বসিয়ে দেবেন না। আর একটি কথা। আমি যখন আপনার বাহক বা অনুগত হলাম তখন আপনার ওপর ভর করে রইলাম। এতে আপনার শরীর শুকিয়ে যেতে পারে, লাবণ্য কমে যেতে পারে। আজ যে রূপযৌবন দেখে নারী মাত্রেই আপনার প্রেম ভিক্ষা করার জন্য উদগ্রীব হয় তখন হয়তো তা নাও হতে পারে। যদি অন্য কোনো ব্যক্তির রক্তদান করেন তবে আপনার শরীরের ক্ষয়ক্ষতি হবে না।'

বললাম, 'এর অর্থ, তোমার মত পাতক হবার ব্যবস্থা?'

জীতেন্দ্র বলল, 'এ ছাড়া পথ নেই।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমি আজ যাই। শুক্রবার সন্ধ্যায় আমি তোমার এই সমাধিতে আসব। আমি ভেবে দেখছি তোমায় পালন করতে পারব কিনা অথবা মুক্তি দেবো।'

সারা বলল, 'ভূত পালা ঠিক নয়, তাকে যা হুকুম করবে সে তাই এনে দেবে ঠিকই কিন্তু ঐ যে তোমার লাবণ্য হরণ করবে। দুলাভাই, দোহাই, আপনার এই অপূর্ব সৌন্দর্য নষ্ট করবেন না।'

'কি হবে যৌবনসৌন্দর্য যদি প্রিয়তমা কাছে না থাকে আর তাকে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করে অন্য একটি জাদুকরের প্রেতাত্মা।'

'আপনি কি শুক্রবার রাত্রে মিশরে চলে যাবেন?'

'ভেবেছি তো সেই রকম। কি ঘটে বলা যায় না।'

'যদি প্রতিদিন একটা করে মানুষ দিতে হয় ঐ ভূতটাকে?'

'জানো সারা আমি যদি কোনোক্রমে নীলোফারকে উদ্ধার করতে পারি তবে সমস্ত কিছু জাদুবিদ্যার জিনিস আমি সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসব।'

'দুলাভাই, নীলু বুবু যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে কি তাকে ত্যাগ করবে?'

পরলোকের মানুষের সঙ্গে ইহলোকের দৈহিক সম্পর্কের মধ্যে পাপকার্য এবং তার বিধানের কোনো শরিয়তি ব্যবস্থা আছে কি? কারো বউকে জীন ধরেছে, জীন ছাড়ানোর পর কি তাকে ত্যাগ করা হয়?'

মাথা নিচু করে রইল সারা। তার মৃণালবাহু নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল ফরিদ, 'যদি নীলু মারা যায়, যদি তাকে আর না পাই তবে তুমি তো আমার সঙ্গিনী হবেই।'

'কথা দিচ্ছ?'

'তুমি আমার জেতা জিনিস। অন্য কাউকে প্রাণ ধরে বিলিয়েই বা দিতে পারি কেমন করে?'

সারা ফরিদের পিঠের ওপর মাথা ঘষতে লাগল।

কবি গওস্মুল আনাম এলেন রাজকীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরে। বললেন, 'আমি এখনি একবার রাজদরবারে যাচ্ছি, জরুরী তলব এসেছে, রাজসৈনিক অপেক্ষমান। তোমরা ছুটিতে থাকো। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেও না। দেখো, বাবা ফরিদ, যাচ্ছি আমি।'

কবি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলে গেলেন। জানালা দিয়ে তাঁকে কিছুক্ষণ দেখা গেল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

॥ উনিশ ॥

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে ফরিদ সংবাদ পেলে তার শ্বশুরমশায় আর সেরাত্রে ফিরবেন না, রাজবাড়ির উৎসবেই থাকবেন। গড়ের সৈনিকদের মধ্যে কলহ দেখা দিলে যেন তার বিচার-আচার করে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে গড়ের একজন সৈনিক-সরদার এসে অভিবাদন জানাল। বলল, 'দুর্গের মালিক কোথায়, আমাদের তাকে এখন জরুরী প্রয়োজন?'

'তিনি রাজ-দরবারে গেছেন।' সারা বলল সৈনিককে।

'আমাদের সেকথা না জানিয়ে গেছেন কেন?'

'হঠাৎ বাদশা ডেকে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া কেন গেছেন তার কৈফিয়ৎ তিনিই দেবেন এসে। তোমার এসব ব্যাপারে কৈফিয়ৎ তলব করার হঠাৎ দরকার হল কেন জানতে পারি কি?'

'আপনি কি খবর রাখেন এই দুর্গ আক্রান্ত হতে চলেছে। পারশ্যরাজ শাহ আব্বাসের বিদ্রোহী কয়েক শত সৈনিক তাদের রাজ্য ছেড়ে লুটপাট করতে করতে আরবের মধ্যে ঢুকেছে—আর বাদশাহ তাঁর জন্মদিনের উৎসবে মাতোয়ারা। যদি মদিনা আক্রান্ত হয়, যদি ইহুদিরা তাদের চিরকালের বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে শত্রু সৈন্যদের যোগ-সাজসে হজরতের সমাধিক্ষেত্রের অপমান করে?'

ফরিদ বলল, 'কোথায় শত্রুসৈন্য?'

'ঐতো পাহাড়ের পিছনে। তাদের মশালের আলোয় দিগন্ত লাল হয়ে আছে।'

'তারা এগিয়ে আসুক, তখন দেখা যাবে, আমি তো আছি।'

'হা হা হা—আপনি আছেন, প্রেম করছেন। আমাকে চেনেন আপনি? আমি হলাম পারশ্যরাজের সেনাপতি। পারশ্যের যুবরাজের হুকুম মতো আমরা এই সারা নাম্নী বাদ্যযন্ত্রের জাদু-করীকে হরণ করে নিয়ে যেতে এসেছি। আমি আপনাদের দুর্গের সৈনিক নই।'

লোকটির হাতে খোলা তলোয়ার। সে একপা এগিয়ে এসে সারার একখানা হাত ধরল। বলল, 'বড্ড দেমাক, না সুন্দরী? এখন?'

ফরিদ বলল; 'হাত ছাড়। লজ্জা করে না একজন সেনাপতি বলে নিজের পরিচয় দিয়ে এরকম ডাকাতি করতে?'

'হা হা—আমি আসলে একজন ডাকাত—আরবের বিখ্যাত বেদুইন সরদার শাহ জুম্মান। আমার সৈন্যরা তোমাদের বাড়ি ঘর-দোর ঘিরে ফেলেছে। কিচ্ছুটি আর করার নেই।'

সারার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকল বেদুইন সরদার। ফরিদের কাছে তলোয়ার ছিল না। দুজন লোক ছুটে এলো তাকে পাকড়াও করার জন্য। ফরিদ তাদের ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে একজনের তরবারী টেনে নিয়ে আক্রমণ করল দস্যু সরদারকে। সারা ছাড়া পেয়ে ছুটে পাশের ঘরে ঢুকে পাতালপুরীর সিঁড়ি দিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। ভেড়ার পালের মতো দুর্গের অভ্যন্তর থেকে সৈন্যরা চারদিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ছড়িয়ে গেল।

মরুভূমির অপর প্রান্ত থেকে চাঁদ উঠে আসছিল। অল্প অল্প আলো ছড়িয়ে পড়েছিল।

ফরিদের তলোয়ার আঘাত হানল একটি সৈনিকের গর্দানে। তার মুণ্ডুটা ছিটকে পড়ল। দস্যু সরদার তখন সামান্য আহত হয়ে বাইরে পালিয়ে গেছে।

ফরিদ শুনেছিল কবির গওসুল আনামের তাঁবে পাঁচ হাজার সৈন্য আছে। তারা গড়ের নিচে থাকে। পাহাড় কেটে মাটির নিচে দূর্গ করা আছে। উপরে এই প্রাসাদ।

বাইরে তখন যুদ্ধ চলেছে।

সৈন্যরা টের পেলে কেমন করে ?

সারা কোথায় গেল ?

পাশের কামরায় এসে দেখল কেল্লার গড়ে নামার পথ। সারা তাহলে ভেতরে চলে গেছে। নেমে গেল সে। তখনি ছুটে এলো দুজন সৈনিক। আঘাত হানতে লাগল। ফরিদ শুধোলে, 'তোমরা কি গড়ের সৈন্য, আরবের বাদশার সৈন্য ? তা যদি হয় তবে অস্ত্র সংবরণ করো। আমি তোমাদের মিত্র। সারা, ও মানে মালিকের কন্যা কোথায় ? তাকে পাওয়া যাচ্ছে না ?'

'আপনি নিশ্চয় কবি গাওসুল আনামের জামাতা, বলল একজন।'

'বিয়েই হয়নি শালা জামাতা!' আর একজন বলল।

'কবির দুজন কন্যা, একজনের নাম নীলোফার—আমি তার স্বামী। এরা যমজ বোন। সারা কোথায় ?' বলল ফরিদ।

'তিনি নিরাপদেই আছেন, আপনি যদি মিত্র হোন তবে ওপরে চলে যান, গড়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার নেই।'

বাধ্য হয়েই ফরিদ দুর্গের বাইরে চলে এলো। দেখল যুদ্ধ চলেছে। দস্যু সরদারের সৈন্য সংখ্যা কম নয়।

হঠাৎ সে আক্রান্ত হল দশ বারোটি সৈন্যের দ্বারা।

এবার সে বুঝতে পারল বেতুইন সৈন্যদের মধ্যে অনেকে আছে ইহুদি—যাদের মাথায় বাধা লাল ফেটি—বুকের জামায় ঢ্যারা কাটা সাদা চিহ্ন। আর গড়ের সৈন্যদের পোষাকের রঙ সবুজ, মাথায় ফেটি, বুকে একটা সাদা সূর্যের প্রতিকৃতি।

প্রচণ্ড বেগে তলোয়ার ঘুরিয়ে নিজেকে মুক্ত করল ফরিদ। আঘাত খেয়ে অনেকেই পালিয়ে গেল। সেই অবসরে একজন মিত্র সৈন্যের পোষাক খুলে নিয়ে পরে ফেলল সে। তারপর একটি খুব উঁচু আর তেজি কালো ঘোড়া কাছাকাছি পেয়ে যেতেই ঢাল আর বর্শা হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে তার পিঠে উঠে পড়ল। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, গড়ের মধ্যে আরাম আয়েসে খেয়ে-পরে গায়ে চর্বি গজানো আরব সৈন্যরা পিছু হটতে লাগল। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কেল্লায় ঢোকার মুখে তাদের প্রতিরোধ করল ফরিদ। দস্যু-সরদারের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বাধল।

কেল্লার মধ্যে শত্রু সৈন্যরা ঢুকে যাচ্ছে হুড়হুড় করে বন্যার জলের মতো। এতো সৈন্য একজন দস্যু-সরদারের থাকবে কেন? আর মিত্র পক্ষের সৈন্য পরিচালনা যিনি করছেন তিনি কই? এক হাজারের বেশি সৈন্য তো বাইরে আসে নি! বাকি সৈন্যরা কোথায়? ফরিদ মাথায় চোট পেয়ে অন্ধকার দেখল? সে বন্দী হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই দেখল সারাকে বেঁধে এনেছে দস্যুরা। দুজনকে তারা এক দড়িতে বাঁধল। তারপর কাঠের গাড়িতে তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে চলল। তখন কেল্লায় আগুন জ্বলছিল। লুটপাট হচ্ছিল।

॥ কুড়ি ॥

সারা ফরিদ তুজনেরই চোখ বাঁধা ছিল। কয়েক জায়গার আঘাত থেকে রক্ত ঝরছিল ফরিদের। হাত বাঁধা ছিল তুজনেরই।

সারা শুধোল, 'আমাদের এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানো তুলাভাই ?'

'জানি না।'

'আব্বা যখন ফিরে এসে সব দেখবেন…'

'উঃ! ভীষণ যন্ত্রণা!'

শত্রু সৈন্যরা হৈ-হল্লা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত শেষ রাতের দিকে একটা পাথরের কারাগারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হল তারা তুজনে। পাশাপাশি তুটি কামরার মধ্যে তুজন। সকালে হেকিম এলো। আরক দেওয়া হল।

খাগ্ত দেওয়া হল তাদের!

পর পর তিনদিন তিনরাত পার হয়ে গেল অথচ ফরিদ দেখল তাদের তুজনের একজনকেও দস্যু-সরদারের দরবারে হাজির করা হল না। অন্তত সারাকে যে নিয়ে যাওয়া হবে এটা তুজনেই আন্দাজ করে রেখেছিল। প্রহরীকে একটু আদর করে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'সরদারের শরীর নাকি খুবই অসুস্থ। তাঁর ক্ষতস্থানের রক্তপাত কিছুতে বন্ধ করা যাচ্ছে না, সদাই চিঁইয়ে চিঁইয়ে বার হচ্ছে। কত হেকিম, ওঝা, চিকিৎসক আসছে, সবাই বিফল মনোরথ হয়ে চলে যাচ্ছে। আপনার আঘাতেই তিনি জখম হয়ে গেছেন। সরদার-সেনাপতি আপনাকে খতম করে দেবার ফরমান চেয়েছিলেন কিন্তু সরদার হুকুম দেন নি কেননা তিনি নাকি

বলেছেন, বন্দী বীরের বাহুতে প্রচণ্ড শক্তি, যদি মারা যাই, আমার বাহিনী আর ছোট্ট রাজ্যটি চালনা করবার ক্ষমতা ওরই আছে। বন্দীর যেন যথাযোগ্য সেবা করা হয়।'

সারা লোহার গরাদের ধারে বসেছিল ঠিক ফরিদের বিছানাটার কোলে। ফরিদের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'সরদারের প্রাণে দয়া আছে বলতে হবে!'

প্রহরী বলল, 'হ্যাঁ, তিনি দয়ালু এবং মহৎ মানুষও বটে।'

'তাহলে মেয়েমানুষকে হরণ করে আনাও কি তাঁর মহৎকীর্তি নাকি?'

প্রহরী হাসল। বলল, 'আপনার পাণিপ্রার্থী উনিও হয়েছিলেন! বাজনায় উনি হেরে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই পারশ্যরাজের পুত্রের সঙ্গে আপনার বিয়ের আঞ্জাম হচ্ছে শুনেই সরদার হঠাৎ ঝটিকা সফর করে অপনাকে লুটে আনলেন।'

ফরিদ বলল, 'তিনি কি জানতেন কবি গওসুল আনাম সেদিন রাজবাড়িতে যাবেন, আর তাঁর কন্যা সারা একাকী থাকবে?'

'জী হ্যাঁ, সেই রকম খবরই তো তিনি পেয়েছিলেন!'

'এখন এই লুটতরাজের সংবাদের পর আরব সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই?'

'না, বাদশা আসলে একজন অপদার্থ। যুদ্ধবিগ্রহ তিনি পছন্দ করেন না। তাছাড়া অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন আর গাজি-এল-সালামের সরদারকে তিনি ভয়ও করেন। আচ্ছা, আপনারা কি দুই ভাইবোন?'

'কতকটা তাই, কেন বলো তো ভাই প্রহরী?

'সরদার জানত কবি গওসুলের কোনো পুত্র নেই অথচ হঠাৎ আপনাকে দেখলেন।'

ফরিদ আর এবিষয়ে কিছু বলল না। কিছু ফল আর গরম দুধ খেতে পেল। বলল, 'তোমাদের সরদারের শরীরের রক্তপাত আমি বন্ধ করে দিতে পারি।'

'আপনি পারেন?'

'হ্যাঁ।'

'এই সংবাদ কি সরদারকে দেওয়া হবে?'

'দিতে পার।'

প্রহরী বিদায় নিল। কিছুক্ষণ পরে তুজনেরই তলব হল। তবুও ভাল কেননা একাকী এই নির্জন কারাগারে সারার পক্ষে নিরাপদে থাকা ভাবনার বিষয় ছিল বটে।

ফরিদ আস্তে আস্তে সারার কাঁধ ধরে চলল সরদারের কাছে।

সরদার শায়িত অবস্থায় একটু হাসলেন তাদের দেখে। ইঙ্গিতে বসতে বললেন। সালাম জানাল তুজনে। তারপর বসল তাঁর কাছে।

সরদার বললেন, 'গোস্তাকি মাফ করবেন। স্বীকার করছি আমি দোষ করেছি কিন্তু সারা নাম্নী এই সুন্দরী খ্যাতি সম্পন্না মহিলার সঙ্গে অপদার্থ পারশ্য রাজকুমারের বিয়ের ষড়যন্ত্রে আমার ঘোরতর আপত্তি ছিল বলেই এই তুর্ঘটনা ঘটাতে বাধ্য হয়েছি। সে যাক, আপনি কে বলুন!'

ফরিদ বলল, 'আমার যথার্থ পরিচয় হল দিল্লীর বাদশা শাহজাহানের আমি বৈমাত্রেয় ভাই। আমার নাম ফরিদ। কবি গওসুল আনামের যমজ কন্যার একটি—যেটি বড় ছিল—তাকে তিনি যৌবনের দরিদ্র অবস্থায় ভারতের মহা সাধক পীরচেঙ্গিকে বেচে দেন এবং অধম তাকে সাদি করে। এরা যমজ বোন তুটি একই রকম।'

'সেই কন্যা এখন কোথায়?'

'জানি না। একজন জাতুকর এক আজব মড়ার মাথার কীর্তিকলাপ দেখিয়ে নিজে মারা পড়ে বটে কিন্তু আমার স্ত্রী হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়। সে এই মাত্র কয়েক দিনের ঘটনা।'

সরদার বললেন, 'ভারতীয় সেই জাতুকর?'

'জী হ্যাঁ।'

'শুনলাম, যুবরাজ, আপনি নাকি রক্তপাত বন্ধ করতে জানেন? যদি অনুগ্রহ করেন, আমি প্রাণে বাঁচি। আমি ওয়াদা করছি যথা-সর্বস্ব আপনাকে দেবো কিন্তু সারার বিয়ে দেওয়া চলবে না পারস্য রাজকুমারের সঙ্গে। কারণ আপনারা জানেন না, সে বেটা বড় দুর্বৃত্ত, পাপাচারী। আর সম্পর্কে সে আমার ভাগ্নে।'

সারা বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সরদার, এ বিয়ে হবেই না! একটা দুর্ভাগ্য থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন।'

'বলো, করি নি আমি?' বলে সরদার তাঁর হাতখানা বাড়ালেন সারার দিকে। ফরিদ চোখ টিপতেই সারা তার বাঁ-হাতখানা পেতে দিল।

সরদার চোখ বন্ধ করে বললেন, 'তুমি আমাকে তোমার জাদুযন্ত্রের বাজনা শোনাবে না?'

সারার গলা কাঁপল একটু। বলল, 'শোনাব জাঁহাপনা।'

ফরিদ বলল, 'খানিকটা কর্পূর আনতে বলুন।'

কর্পূর আনা হলে ফরিদ সরদারের শরীরের কাটা অংশ খুলে মুছে পরিষ্কার করিয়ে দিতে বলে গুঁড়ো কর্পূর লাগিয়ে দিল। এবং সরদার শাহ জুম্মান দেখলেন অলৌকিকভাবে তাঁর শরীরের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। বললেন, 'একি জাদু তুমি জানো ভাই ফরিদ?'

'এটা আমি জানতাম না, সেই জাদুকর জীতেন্দ্র সরকারের স্মরণ-লিপি থেকে জেনেছি।'

'ঠিক আছে।—এরা দুজনই এখন মুক্ত। সবাই আনন্দ উৎসব করো। কবি গওস্সুল আনামকে সংবাদ দাও যে তাঁর কন্যা জামাতা আমার অতিথি হয়ে আছে। আমি তাঁর শত্রু নই, মিত্র—তাঁর যা ক্ষতি করা হয়েছে, তারও অধিক পূরণ করা হবে।'

বাজনা এনে দিতে বাজাতে বসল সারা। ফরিদও তার পাশে বসে রইল। বেহালার ছড় টেনে টেনে অপূর্ব মূর্ছনায় সে কান্নায় ফেটে-পড়া এক রাগিনী শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে ফরিদও তার

সঙ্গে সমান লয়ে সমান তালে বাজাতে লাগল। সরদার অবাক হয়ে উঠে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন।

বাজনা শুনে পাগলের মতো ছুটে এলো সরদারের যত লোকজন। তারা সবাই কাজ ভুলে বসে পড়ল যে যেখানে ছিল।

এরপর ফরিদ শুরু করল ভারতীয় এক রকম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কাটা কাটা তাল বহুল দ্রুতলয়ের বাজনা। সারা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না।

সরদার বিস্মিত হলেন। বললেন, 'ছি ছি ছি! আমার এই হাতে তোমার মতো মহান শিল্পীর গায়ে তরবারীর আঘাত হেনেছি! সুন্দরী সারার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে তো, দাও এবার ওর গলায় বরমালা!'

সারা লজ্জায় অধোবদন হল। সে মুগ্ধ হল এই ক্ষুদে রাজার অপূর্ব সুন্দর চেহারা আর নাক চোখের গঠন ভঙ্গিমা দেখে।

ফরিদ বাজনা বাজিয়ে লোকজনকে নাচাতে লাগল। বামন আকৃতির হাস্যকর চেহারার দুজন লোক কোথা থেকে এসে এমন আশ্চর্য নাচ জুড়ে দিল যে রাজা পর্যন্ত হেসে লুটোপুটি।

সারা হেসে গড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে সে তাকাচ্ছে জুম্মান সরদারের দিকে। রাজার চোখেও কটাক্ষ। ফরিদের ভাল লাগল না। এই একটা বেদুইন দস্যু-সরদার, গায়ে হিংয়ের ভট্‌কা গন্ধ পাঁঠার মতো, তাকেই ওর মনে ধরে গেল! ওর বৃদ্ধ বাবা যদি শোকে পাগল হয়ে আরবের বাদশার অনুমোদন নিয়ে হঠাৎ এসে দশ-হাজারী ফৌজীসহ কন্যা জামাতাকে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন?

আসর যখন সরগরম—বাজনা যখন দ্রুত লয়ে চলেছে—হঠাৎ তার ছিঁড়ে গেল!

রাজা ওপরে ঠ্যাং তুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'কেয়া বাত! কেয়া বাত!'

আবার নতুন বাজনা এলো। টংকার তুলতেই আসর জমে উঠল।

খানাপিনা এসে হাজির হল।

॥ একুশ ॥

রাত্রে আঙুর ক্ষেতের গম্বুজাকৃতি মাচার নিচে আলোর ঝাড়-লণ্ঠন টাঙিয়ে গান-বাজনার জলসা বসল। সোনালী আঙুর ঝুলছে চারদিকে। রাজা শাহ জুম্মান আলিসান হয়ে আধশোয়া অবস্থায় সিংহাসনে বসে আছেন। আগরবাতি আর ফুলের গন্ধে চারদিক ম-ম করছে। বহুলোক আসছে চারদিক থেকে। প্রথমে রাজা কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। সবাই বাহবা দিল। আরো কয়েকজন কবিতা আবৃত্তি করল। তার মধ্যে সারাও, সে তার পিতার রচনা থেকে আবৃত্তি করল।

ফরিদের পরিচয় দেবার পর সে বলল, 'আমি আপনাদের প্রায় পঁচিশটা ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি। তার রকম রকম সুর আর দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা।'

হিন্দী, উর্দু, আরবী, পস্তু, সংস্কৃত, বাংলা, কানাড়ী, আসামী, কাশ্মীরী, চীনা, হিব্রু, ল্যাটিন, মিশরী, আরবী, জার্মান, রুশ—নানান ভাষায় সে আবৃত্তি করে সবাইকে হতবাক করে দিল। এটা কেমন করে হয়? সারা অবাক হয়ে তার ভগ্নিপতির জয় জয়কার দেখতে লাগল। রাজার পাশে বসে আছে সারা ফুলের গহনা পরে। রাজা তার পিঠে হাত দিয়ে আছেন আর তাঁর মুদ্রাদোষ অনুযায়ী মাঝে মাঝে একটু করে হিং খাচ্ছেন আঙুলের ডগায় করে।

ফরিদ বিচিত্র ভাষায় গান গাইতে লাগল। হাজার পাঁচেক লোক বাহবা দিতে লাগল।

তারপর সকলের মিলিত বাজনা শুরু হল!

নর্তকীরা নাচ শুরু করল তার সঙ্গে। সন্ধ্যার সময় গোসল-

খানার মধ্যে যখন স্নান করছিল ফরিদ হঠাৎ তার খেয়াল হল তিনবার টুস্‌কি মেরে ডেকে দেখবে নাকি জাত্নকর জীতেন্দ্র সরকারের প্রেতাত্মাকে ? সত্যি না মিথ্যে জানার জন্যে যেই না পরীক্ষা করা অমনি গোসলখানার ভেতরেই হাজির হল একটা লাল-কাপড়-পরা-মানুষ। অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'হুজুর, আজ শুক্রবার ! ঠিক সময়েই আমাকে তলব করেছেন। আজ শেষ রাত্রে আপনাকে আমি মিশরের পিরামিডের মধ্যে নিয়ে যাব। এখন থেকে সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গে রইলাম আমি। আমাব নামে সম্পূর্ণ কোরআন শবীফ খতম করে আমার কবর জিয়ারত করার সময় আবে-জমজম কূপের পবিত্র জল না ছিটনো পর্যন্ত আমার আত্মার মুক্তি নেই। আপনাকে আজ আমি খুব খুশী করব। ত্বঃখ হল, যুদ্ধে যখন আপনি বন্দী হলেন, আহত হলেন, তখন আমাকে স্মবণ করলেন না কেন ? আপনাব নিশ্চয় ভয় হয়েছিল, আমি আপনার আহত স্থান থেকে রক্ত মক্ষণ করব বোধহয় ! সে যাক, আপনি জলসার সভায় আমাকে যেমন ভাবে যা করতে মনস্থ করাবেন তাই করব। এখন থেকে আমি আপনার মানসশক্তি অর্থাৎ আপনাকে ভূতে পেয়েছে।'

সেইজন্য ফরিদ যে ভাষা জানত না, সেই ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করল, গান গাইল।

সারার বাজনায় যখন জয়-জয়কার ফরিদ হঠাৎ তা সাঙ্গ করে দেবার মনস্থ করল। টুস্‌কি মারতেই সবাই দেখল রাজা তাঁর সিংহাসনের ওপরে বনবন করে ঘুরছেন। বাজনার তার ছিঁড়ে গেছে। আলোগুলো তুলতে আরম্ভ করেছে, বামন তুজন ছুটে এসে রাজার তুটো ঠ্যাং ধরতে তারাও তাঁর সঙ্গে ঘুরতে লাগল। তাদের পাজামা খুলে বেরিয়ে গেল।

যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। সবাই চিৎকার শুরু কবে দিল।

সবাই দেখতে পেল সুন্দর ঝলমলে পোষাক পরা রাজকুমার ফরিদ শুধু স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে !

সারা তার কাছে ছুটে এলো। বললে, 'একি, এমন হচ্ছে কেন ?'

ফরিদ বলল, 'একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ আসন্ন। তোমার বাবা আর্থর্ব আমার শ্বশুরমশায় যখন আরবের রাজাকে সংবাদ দিলেন পারশ্য-রাজের পুত্রকে জানান যে সেই সারার ভাবী খসম—ব্যাস, সেই মতো প্রতিশোধের কাজ এখন সম্পূর্ণ। আর কিছুক্ষণ পরেই যুদ্ধের ঝড় নেমে আসবে। অন্তত আমি তাই আন্দাজ করছি। সুন্দরী নারী নিয়ে মহা ঝামেলা।'

'তা রাজা এমন করছেন কেন?'

'ওটা বোধহয় ওঁর মুদ্রাদোষ। মাঝে মাঝে ঘোরেন। যাঁরা বেশি হিং খান, তাঁদের এমন হতে পারে।'

'ভূমিকম্প হচ্ছে কেন?'

'হবে না? তোমার মতো সতী সাধ্বী মেয়েকে অপহরণ করে আনলে এইসব অপকীর্তি তো হবেই!'

'আমার আঙুলগুলো যে সব অবশ হয়ে গেছে!'

'তুমি বোধহয় আর কোনোদিন বাজনা বাজাতে পারবে না।'

'কেন?'

'কত রাজা, রাজকুমার গেল গড়াগড়ি, হঠাৎ একটা লোটাঘটির গলায় মালা দেবার মন হল কেন? তুমি কি দ্বিচারিণী? তোমাকে আমি জয় করিনি?'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে চাও নি দুলাভাই!'

'এখন আমি চাই। আমার যা ইচ্ছে করব। পৃথিবীর সর্ব সুখ চাই আমি। মিশরের বিখ্যাত প্রাচীন বিজ্ঞানী আবু ইসহাক ইবনে ইমামের রুহু বা আত্মার আমি সদ্গতি করতে চাই কেন না সে আমার নীলোফারকে নিয়ে গেছে। আমি বাদশা শাহজাহানের ওপরে প্রতিশোধ নেব যদি না আমার সম্মান ফিরিয়ে দেয়।'

ফরিদ হঠাৎ তালি মারতেই সমস্ত আসরটাই স্তব্ধ হয়ে গেল। গণ্ডগোল বন্ধ হয়ে গেল। আবার যেমন ছিল তেমনি শান্ত।

রাজা শাহ জুম্মান ঝেড়ে-মেড়ে উঠে তলোয়ার বার করলেন। বললেন, 'এ বেটা জাদুকর, একে পাকড়াও করো।'

'ওহে বেদুইন সরদার, তোমার মৃত্যু আসন্ন। পারশ্য রাজকুমার প্রচুর বাহিনী নিয়ে আসছেন। তোমার উচিত শাস্তি পাবে। আমি চললাম সারাকে নিয়ে।'

সারার হাত ধরে যখন ফরিদ বের হয়ে চলল দু'চারজন সৈনিক ছুটে গেল।

ফরিদ তাদের লাথি-চড় মারতেই পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল।

ফরিদ বলল, 'এদের একজনের বুক ফেড়ে কলিজা খাও আর রক্ত পান করো জাদুকর জীতেন্দ্র সরকার।'

হঠাৎ একটি রাক্ষস মূর্তির আবির্ভাব হল। একজন সৈনিকের বুক ফেড়ে কলিজা টেনে বার করে আহার করতে থাকলে ভয়ে সমস্ত লোক হাওয়া হয়ে গেল।

দূর থেকে হৈ-হৈ মার-মার কাট-কাট রবে অসংখ্য সৈনিকদের আগমনবার্তা শোনা গেল।

রাক্ষস মূর্তি পালটে ফেলে একটি ঘোড়া হল। সারাকে তার পিঠে তুলে নিয়ে ফরিদ দ্রুত ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলো মাঠ-ময়দান পার হয়ে রাজধানীর দিকে।

সারাকে নামিয়ে দিল মক্কা-মদিনার ঠিক মাঝখানে তার বাপের বাড়ির দোরগোড়ায়। বলল, 'তুমি অপেক্ষা করো, আমি চললাম নীলোফারকে উদ্ধার করতে।'

॥ বাইশ ॥

ফরিদ সবিস্ময়ে মিশরের রাজা দ্বিতীয় ফারাওয়ের পিরামিডখানা দেখতে লাগল। ভেতরে ঢোকার আগেই লেখা আছেঃ 'সাবধান, এই কবরের কোনো কিছু স্পর্শ করিও না, মৃত্যু অনিবার্য। সমস্ত জিনিসেই বিষাক্ত আরক মাখানো আছে।'

কালো পোষাক পরা ফরিদ এবং বৃদ্ধ দরবেশ সাজে কালো আলখাল্লা-পরা জাদুকর জীতেন্দ্র পিরামিডের অভ্যন্তরে যাবার জন্য যেই না আয়োজন করেছে অমনি ভেতর থেকে নীলোফারের ক্রন্দন-ধ্বনি শোনা গেলঃ 'কে আছ, বাঁচাও আমাকে! ফরিদ তুমি কোথায়! অন্ধকারে একটা অজগর আমাকে পিষে ফেলছে! ফরিদ, তুমি কোথায়…'

ফরিদ হাত চেপে ধরল জীতেন্দ্রর। বলল, 'কি করা যায় জীতেন্দ্র—নীলোফারের এই যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তাড়াতাড়ি ওকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দাও।'

জীতেন্দ্র বলল, 'এই পারদচূর্ণ আপনার সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিই কেননা আরকের সতেজ দহনে আপনার শরীরের সমস্ত মাংসকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সিদ্ধ করে দেবে। নীলোফারকেও সেইভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পারদভস্ম মেখেই আমি জীবন্ত অবস্থায় এই পিরামিডে প্রবেশ করেছিলাম। ঐ দেখুন, মানুষের কংকাল পড়ে আছে। এরা কেউ চোর-ডাকাত, কেউ খুনী আসামী, কেউ বিজ্ঞানী! কেউ আশ্রয় নিতে এসে মরেছে, কেউ সোনাদানার লোভে মরেছে! অনেক হীরক আছে রাজার পোষাকে আর মুকুটে, তার জ্যোতিতে পিরামিডের মাঝখানটায় অন্ধকার নেই।'

ফরিদ পীরচেঙ্গিকে স্মরণ করে এগোতে লাগল। বিরাট ত্রিকোণাকার পিরামিড। ভেতরের দ্বারে দ্বারপাল—কটমটে চোখ বার করে দাঁড়িয়ে আছে। সারি সারি সৈনিক। অজস্র ধনরত্ন। রাজদরবার।

জীতেন্দ্র বলল, 'এটা হাতে নাও, হজরত মুসার আসাবাড়ি। এটা যার হাতে থাকবে তার ওপরে জাদুবিদ্যা খাটানো যাবে না।'

দরবার কক্ষ থেকে আর একটি চাতালে নামতেই বিরাট একটি অজগর এগিয়ে আসতে শুরু করল। সে হাঁ মেলল।

ফরিদ হঠাৎ দেখল জীতেন্দ্র গায়েব!

প্রচণ্ড দুর্গন্ধের ঝাঁঝ লাগল নাকে। মাথা ঘুরতে লাগল ফরিদের। সাপটি তাকে গিলতে যেতেই সে আসাবাড়িটা তার মুখের ভেতরে যেই না গুঁজে দিল অমনি আগুন জ্বলে উঠল। সাপটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফরিদ হঠাৎ হাঁক দিল—'নী-লো-ফা-র!'

শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল।

নীলোফারের কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল: 'ফ-রি-দ!' প্রতিধ্বনি গম গম করে অনেকক্ষণ কাঁপতে লাগল। হঠাৎ ফরিদ দেখতে পেল দুটি কংকালদেহ মারামারি করছে। খটাখট শব্দ।

কথা শোনা গেল: 'শালা, জাদুকর জীতেন্দ্র, মরেও তুমি আমার কাছে এসেছ আবার? শালা, আমার আত্মাকে নিয়ে বড্ড ভোজবাজি খেলে বেড়াতে? গলা টিপে শেষ করে দিয়ে এলাম তবু সাধ যায় নি? এবার তোমার হাড় গুঁড়ো করে দোব।'

'নীলোফারকে মুক্তি দাও, আমরা চলে যাব।'

'নীলোফারকে আমি চাই। নারীদেহ আমি ভোগ করবার সময় পাইনি। আমার আত্মা অতৃপ্ত। তাকে সাপ হয়ে আমি কদিন জড়াচ্ছি, পিষছি—তবুও আরাম পাচ্ছি না। সে আমার আবিষ্কার আতসকাঁচ, আংটি আর জাদুদণ্ড নিয়ে বাহাদুরী করে

বেড়াত। তারও মৃত্যু ঘটবে আমার হাতে। বেরো শালা, এখান থেকে।'

হঠাৎ একটা কংকালের পাঁজরে আর একটা কংকালের হাত আটকে গেল। টেনে আর ছাড়ানো গেল না।

ফরিদ সহসা দেখতে পেল পীরচেঙ্গি তার সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে লাল মলাটে মোড়া একখানা কোরআন শরীফ! তিনি কোনো কথা না বলে ইংগিত করলেন পবিত্র কোরআন পাঠ করতে। আবে-জমজম্ কূপের জল দিলেন একটি পাত্রে করে, ইংগিতে দেখালেন ঐ কংকালের ওপরে ছিটিয়ে দিতে। আর আক্রান্ত হলেই আসা-বাড়িটা ঠেকাবে।' তারপর ইংগিতে হাত দিয়ে দিয়ে দেখালেন মুক্তির পর আতসকাঁচ, জাদুদণ্ড, আংটি আর এই দুটো মড়ার মাথা সমুদ্রের জলে ফেলে দিও।

ফরিদ মাথা নুইয়ে বিনীত ভাবে পীরচেঙ্গিকে অভিবাদন করে যেই না মাথা তুলেছে, দেখল, তিনি আর নেই।

সে ভাবল, আবে-জমজম কূপের জল ঐ মড়ার গায়ে আগে ছিটিয়ে দেবে কিনা। নিজে ঐ পবিত্র জলে ওজু করবে কিনা। কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ল পারদচূর্ণ ধুয়ে যেতে পারে। তাই সে কৃত্রিম ওজু করে নিয়ে পবিত্র কোরআন পাঠ করতে শুরু করল। অমনি চারদিক থেকে কোলাহল শুনতে পাওয়া গেল।

হঠাৎ বজ্র-নিনাদ শোনা গেল দ্বিতীয় ফারাও বা ফেরাউনের কণ্ঠ থেকে ঃ

'এই বেটারা, সবাই চুপ করো! আমি নীলনদে যখন ডুবে মরলাম হাত তুলেও উদ্ধার পাই নি। আজ আমার রুহুর মুক্তি হবে। তোমাদেরও মুক্তি হবে।'

'না না না—রাজা, আমরা মুক্তি চাই না।'

'কেন মুক্তি চাও না?'

'আমরা অনেক পাপ করেছি। আল্লার ফেরেস্তারা আমাদের দোজখের আগুনে পোড়াবে।'

'না, ভয় নেই। তোমাদের সবাই আজ মুক্তি পেয়ে বেহেশ্‌তে চলে যাবে। ঈশ্বরত্বের দাবির জন্য শুধু আমি চিরকাল ভুগব।'

ফরিদ কোনো কথায় কান দিল না।

ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে একদিন আধ রাত ফরিদ পবিত্র কোরআন পাঠ শেষ করার পর চোখ খুলে দেখল সব নিস্তব্ধ। কংকালগুলি শুধু পড়ে আছে। সে জানাজা পড়ল। আবে-জমজম কূপের জল ছিটল।

তারপর খুঁজে বার করল নীলোফারকে। একটি শয্যায় পড়ে আছে সে। হিমশীতল শরীর। নীলোফারের দেহে প্রাণ নেই!

নীলোফার মারা গেছে! তারও যে জানাজা পড়া হয়ে গেছে!

ফরিদ মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল। নীলোফারের লাস কাঁধে তুলে নিয়ে এগোতে মনে পড়ল জাদুদণ্ড ইত্যাদির কথা। সেগুলোও সে সংগ্রহ করল। তারপর পিরামিডের বাইরে চলে এলো।

তখন মাঝরাত।

॥ তেইশ ॥

কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারদিক। আকাশচুম্বী সারি সারি পিরামিডের চূড়ো।

কাঁধের ওপরে নীলোফারের যৌবনভরা নিঃসাড় মৃতদেহ! এই দেহটার এখন আর কোনো মূল্য নেই। কেমন করে মৃত্যু ঘটল নীলোফারের? মুখের ওপরে তার হাত বুলিয়ে দেখল একবার। কি পদ্মপেলব মসৃন মুখ। শঙ্খপেলব বাহু। অপূর্ব সুন্দর একঢাল কালো চুল। নিটোল নধর কঠিন কোমল বুক-জোড়া পীনোন্নত দুটি পয়োধর।

একটি চাতালের ওপরে শুইয়ে রেখে নীলোফারের পাশে বসল ফরিদ। তার বুকের ওপরে হাত দিল, কান পাতল, না, একেবারেই নীরব, নিস্পন্দ, প্রাণের কোনো সাড়া নেই। সারা শরীরে তার হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে পাগলের মতো বিলাপ জুড়ল সে: 'নীলোফার, আমার নীলু, সাগর-সেচা মণি—এখন এইভাবে কি তুমি আমার কাছে বিদায় নেবে? শোক বিহ্বলতা কাটিয়ে এখনি আমার এখান থেকে কি চলে যাওয়া উচিত নয়? কিন্তু তোমার দেহ কাঁধে নিয়ে দিনের বেলা পথে হাঁটতে থাকলে লোকে কি আমাকে পাগল ভাববে না? তোমার দেহ যদি নীলনদের পানিতে ভাসিয়ে দিই আর তারপর হাঁটতে হাঁটতে পথে পথে ঘুরে বেড়াই শূন্য হাতে কে তখন আমাকে ক্ষুধার সময় দুটো অন্ন দেবে? তৃষ্ণার সময় একফালি তরমুজ দেবে? না, দাঁড়াও নীলোফার, লক্ষ টাকার সমাধি গড়ব তোমার আমি। বালির নিচে তোমার শরীর আমি প্রথমে ঢাকা দেব। তারপর নিশান পুঁতে রেখে যাব

কবরে। তুমি লক্ষীটি, একটু শুয়ে থাকো, আমি পিরামিডের মধ্যে থেকে ধনরত্ন নিয়ে আসি। আমি রাজার ছেলে, রাজার মতই থাকব।...'

নীলোফারের মাথার ওপরে গভীর আবেগে একটা চুম্বন করে, তার সমস্ত শরীরটা ঢাকা দিয়ে রেখে আল্লার কাছে হাত তুলে মোনাজাত করার পর ফরিদ আবার আসাবাড়িটি হাতে নিয়ে পিরামিডের অভ্যন্তরে ঢুকে গেল।

থরে থরে সব কিছু সাজানো আছে। রাজা, উজির, সেনাপতি, বিজ্ঞানী, সভাসদ, সৈনিকদের আরক-মোড়া মূর্তি। তারা নীল পাটল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। এখন আর কোনো সাড়া শব্দ নেই।

ফরিদ ভাবল, রাজার মাথার মুকুটের ঐ বড় হীরক খণ্ডটির কি এত দ্যুতি! পিরামিড অভ্যন্তর আলো করে আছে! হীরকটি সংগ্রহ করল সে।

একটি রুপোর সিন্দুক খুলে ফেলল। ওরে বাব্বা! তাজ্জব ব্যাপার! একটি সোনার পাত্রের মধ্যে অজস্র হীরক, সূর্যকান্তমণি, নীলকান্তমণি, চুনী, পান্না, মুক্তা!

আর চারদিকে তো সোনা-রুপোর ছড়াছড়ি! কই আগে তো এসব তার চোখে পড়েনি! তবে কি এসব সংগ্রহ করতে করতে রাত পার হয়ে যাবে আর লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু ঘটবে তার?

অতএব সবই থাক। শুধু মণিমুক্তাভরা রুপোর সিন্দুকটি টেনে টেনে বাইরে আনল ফরিদ। উত্তেজনায় তার শরীরে কাঁপন হচ্ছে। অসহ্য এক রকমের গ্যাসে তার নাসারন্ধ্র জ্বালা করছে। মাথা ঘুরছে। বমি পাচ্ছে। পিরামিডকে সালাম! আর কখনো সে এর মধ্যে ঢুকবে না। তাড়াতাড়ি স্নান করে ফেলা দরকার। কোনোভাবে যদি তার দেহ একটু ছিঁড়ে কেটে যায়, বিপদ হতে পারে, সারা শরীর সাদা হয়ে আছে শীতপ্রধান দেশের মানুষদের মতো, যেমন টমাস রো সাহেব এসেছিলেন দিল্লীর দরবারে—

পারদভস্ম মাখা শিবের মতো এই চেহারা দেখলে লোকে ভাববে কি! কেটে গেলে সেখান দিয়ে পারদচূর্ণ শরীরে প্রবেশ করলে মুসকিল হবে।

হ্যাঁ, সেই সৎ ব্রাহ্মণটি কি করে কাটা শরীর জোড়া দিলেন? ভাঙা কলসী জোড়া দিয়ে দেন? শাহরিয়ারের অন্ধ চোখে কি আবার সে চোখ বসিয়ে দিতে পারে না?

আসমা কি তার জন্যে এখনো অপেক্ষা করে আছে?

সারাকে কি সে বিয়ে করবে?

কিন্তু আর অলৌকিক জীবন নয়। শাহজাহান বাদশাকে বুঝিয়ে দেবে সে, তার রাজ্যপাটে কোনো লোভ নেই। অহেতুক সন্দেহ করে সে। আর এই বড় হীরকটি দান করবে সে তাকে। বলবে, তোমার সম্মানে এমন একটি বহু পল তোলা একপোয়া ওজনের হীরক আমি উপহার দিচ্ছি—যা সাত রাজার ধন!

কিন্তু তরমুজ ব্যাপারী ফেরাউন এটা সংগ্রহ করল কি করে? তার জীবন বেশ মজার! কেউ কেউ বলে, কবরের মধ্যে হয়েছিল আর ছ'মাস না-পচা মায়ের লাসের দুধ খেত সে। এক গোবর কুড়োনী মেয়ে প্রথমে দেখতে পায় বাচ্চাটি নাকি বাইরে কবরের ওপরে বসেছিল, হঠাৎ মানুষ দেখে শিয়ালের বাচ্চার মতো গহ্বর দিয়ে কবরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। মেয়েটি উঁকিঝুঁকি মেরে প্রথমে কিছু দেখতে না পেয়ে চলে যাচ্ছিল। তারপর শিশুর কান্না শুনে ফিরে আসে। সে ছিল নিঃসন্তান। সাহস করে সে কবরটা খুঁড়ে ফেলে। তারপর দেখতে পায় তাজ্জব কাণ্ড! একটি শিশু তার মায়ের স্তন্য পান করছে। শুধু বুকটাতেই তাজা মাংস আছে। বাকি শরীরটা সবটাই কংকাল! সেই শিশুকে এনে মানুষ করার পর সে যুবক বেলায় তার দুর্দান্ত হাব-ভাবের জন্য কবরখানার চৌকিদার হল। যেই কবর দিতে আসুক তার কাছ থেকে নজরানা আদায় করে নিত ফেরাউন। তারপর তার কিছু টাকা জমলে তরমুজের ব্যবসা শুরু করল। কবরখানার চৌকিদারীর নজরানা আর তরমুজ ব্যবসার

হুনো লাভ তাকে সমাজের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি করে দিল। সে নাকি বলত, 'জানো হে, তোমার বাবার মুণ্ডুটা, কাল এসে কবর খুঁড়ে দেখো, আর পাবে না, যদি না আমি চৌকি দিই। এখন বিশ্বের বাজারে মিশরী লোকের মাথার অনেক দাম। তারা পিরামিড গড়েছে যে মাথার বুদ্ধিতে তার আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করার জন্য জোর হুজুগ চলেছে পাশ্চাত্য দেশে।—অতএব চৌকিদার যা চায়, পেয়ে যেত।

শেষে সেই ফেরাউন ধনের পাহাড় জমিয়ে লোকবল আর অস্ত্র-বলের সাহায্যে মিশরের রাজা হয়ে গেল! আর সে আল্লাকে মানল না। বলল, 'আমিই আল্লা!' সে বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে জাদুবলে ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়ে লোককে বশ করল। কিন্তু হজরত মুসা এসে বললেন, 'না, তুমি আল্লা নও, অহংকারী মানুষ মাত্র।'

বেধে গেল মতবিরোধ। তারপর লড়াই। নীলনদে ডুবে মরল রাজা ফেরাউন।

আর হজরত মুসার আসাবাড়িটি এখন এসে পৌঁছল ফরিদের হাতে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পরে। যেটা ভেবেছিল ফরিদ তা হয় নি—তার মনে কেমন যেন আশঙ্কা হচ্ছিল হয়তো জাদুমন্ত্র বলে অথবা অলৌকিক উপায়ে কেউ নীলোফারের লাসটি সরিয়ে নেবে—না, তা হয়নি—নীলোফার তেমনি শুয়ে আছে। ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে তার শরীর।

হীরকখণ্ডটি বার করে মুখের সামনে ধরল নীলোফারের—কী অসীম মমতাভরা নিখুঁত সুন্দর মুখখানা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হীরকটি লুকিয়ে ফেলল ফরিদ। পাছে তার দ্যুতি কেউ দেখতে পায়।

কোমরে বাঁধা কালো রঙের উর্ণিটা পাকিয়ে সিন্দুকের আংটায় বাঁধল ফরিদ। তারপর নীলোফারের শরীরটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ভারী বাক্সটাকে টানতে টানতে চলল সে। বালুকার ওপরে চিহ্ন পড়তে লাগল বাক্স টেনে যাওয়ার। কিছুক্ষণ আসার পর দেখল তার সামনে এখন নীলনদ। মর্মরধ্বনি শুনে সে আন্দাজ করে

নিয়েছিল কোনদিকে নীলনদের অবস্থান। বাক্সটা ওপরে রেখে নীলোফারকে নিয়ে তীরের নিচে নামল সে। তার লাসটা বেলাভূমিতে শুইয়ে রেখে নিজের শরীর বেশ করে ধুয়ে রগড়ে সাফ করে ফেলে ওজু করল। তারপর নীলোফারের গোসল দেওয়ালে। তীরে তুলে এনে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিয়ে জানাজা পড়লে। তারপর তাকে বুকে তুলে নিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল। বলতে লাগল: 'আমার প্রাণের ধন নীলোফার, যাও, তোমাকে বিদায় দিলাম। প্রেতাত্মাদের চিৎকারে, ভয়ে তোমার মৃত্যু ঘটেছে। যদি আর কিছুক্ষণ আগে আসতে পারতাম হয়তো তোমাকে বাঁচাতে পারতাম! যাও বেহেশ্‌তে আমার জন্য তুমি ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করো, আবার আমাদের মিলন হবে। ইয়া আল্লা, তুমি নীলোফারের সব গোনা-গাথা মাফ করো!'

ফরিদ নীলনদের স্রোত-তাণ্ডবের বুকে ছুঁড়ে দিল নীলোফারের দেহটাকে। অন্ধকার জলের আবর্তে সেই দেহটি দু-একটা পাক খাবার পর কোথায় যে তলিয়ে গেল আল্লা জানে! কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল ফরিদের সে যে ভেবেছিল নীলোফারের কবর দেবে বালুকার তলায় আর পরে সে হীরা-জহরতগুলো বেচে এসে চমৎকার একটা সমাধি বানিয়ে দেবে?

এখন আর কোনো উপায় নেই। না, আধিভৌতিক জীবন আর সে যাপন করবে না। সাধাসিধে জীবন মেনে নেবে। সাধারণ মানুষ যেমন থাকে। একটা জীবন তার চলে যাবে এই হীরা, জহরত বেচে। রাজ-দরবার থেকে রাজ-দরবারে সে হীরা-মাণিক ব্যাপারী সওদাগর হয়ে বেড়াবে। কিন্তু এগুলো রাখবে কোথায়? পথেই লুঠ হয়ে যাবে না তো? সকাল হয়ে গেলে পিরামিডের-ধনরত্ন-চুরি-করা চোর বলে ধরা পড়লে মিশরের রাজা তাঁর দেশের জাতীয় ঐতিহ্য হরণকারীর ডান হাতখানা কেটে নেবেন না তো নিজের তলোয়ার মেরে?

অতএব আর মায়া নয়, আর দেরি নয়, এখন আর কোনো

অলৌকিক উপায়ও নেই যে ভোঁ করে উড়ে চলে যাবে যেথা ইচ্ছে সেথা।

পীরচেঙ্গির নির্দেশ মতো আতসকাঁচ, জাদুদণ্ড, আংটি আর জাদুকরদের মুণ্ডু দুটো নীলনদের গর্ভে ফেলে দিলে বাক্স থেকে বার করে নিয়ে।

এখন তো আর ওসবের কোনো সক্রিয়তা নেই। বৈজ্ঞানিকের প্রেতাত্মার মুক্তির পর ওগুলোর শক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। আর যদিও বা শক্তি থেকে থাকে তার গোপন মন্ত্রের ভাষা কোন পণ্ডিত উদ্ধার করবে? ভাবতে ভাবতে আবার পুবদিকের পথে ফিরে চলল সে। আবার সেই পিরামিডের কাছেই এলো। পথের চিহ্নটা দিগ্‌ভ্রান্ত করে দিলে। তারপর অনেক কষ্টে বাক্সটা মাথায় তুলল। বেশ ভারী বোঝা। কিছুদূর আসার পর ভোর হয়ে এলো। কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন।

একটা সরাইখানার সন্ধান করছিল সে। পথে লোক চলাচল আরম্ভ হয়ে যাবে এরপর। হঠাৎ একটা আরোহী-শূন্য ঘোড়ার গাড়িকে যেতে দেখে ফরিদ অল্প চিৎকার করে ডাকল সহিসকে।

সহিস সাড়া দিল, 'কে ডাকে আমাকে?'

'এদিকে এসো, এই বাক্সটা আর আমাকে নিয়ে চলো আরবে, তুমি উচিৎ মূল্য পাবে।'

'উচিৎ মূল্য বলতে কতোটা?'

'তুমি কতোটা আশা করো?'

'এখান থেকে মক্কা শহর পর্যন্ত হলে (সহিস দেখল রুপোর বাক্সটা ভারী এবং লোকটার ঘাম হচ্ছে, লোকটাও রাজপুরুষ) পুরো একশো মোহর লাগবে।'

'একশো মোহর! বলো কি হে? আচ্ছা, পঁচাত্তরটি মোহর পাবে।'

'কিন্তু বাক্সর মধ্যে মানুষের কাটা লাস-টাস নেই তো?'

'না না, আল্লার আর পবিত্র কোরআনের নামে শপথ

করে বলতে পারি এই বাক্সটার মধ্যে মরা বা জীবন্ত কোনো মানুষের দেহ নেই।'

'এর মধ্যে তাহলে কি আছে?'

'পুরোনো আমলের পাথর—যা নিয়ে আমি গবেষণা করব।'

'তুমি পাগল নয় তো? টাকা ঠিক না দিলে রাজ-দরবারে হাজির করব।'

'তাই হবে।' বলে ফরিদ বাক্সটা তুলে দিয়ে আসাবাড়িটা হাতে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে উঠে বসল। এখন সে নিরাপদ আর যেন একজন বিখ্যাত সওদাগর। ঠাণ্ডা বাতাসে তার খুব আরাম বোধ হতে লাগল। কালো উর্ণি দিয়ে বাক্সটা বেঁধে ফেলে তার ওপরে কোমর রেখে শুয়ে পড়ল ফরিদ। সহিসকে ডেকে বলে দিল, 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, আমি ঘুমোই, কেউ কিছু শুধোলে বলবে, রোগী আছে, যাবে মক্কা-মদিনার মাঝামাঝি জায়গায়—বিখ্যাত কবি এবং জেলাধিপতি জনাব গওস্থল আনামের বাড়ি—তিনি আমার শ্বশুর হন।'

সহিস বলল, 'জী হুজুর।'

ঘোড়ার গাড়ি চলতে লাগল উত্তরদিকে। ক্ষুধায় ক্লান্তিতে আর একরকম অবসন্ন আরামে ঘুমিয়ে পড়ল ফরিদ। দুপুর বেলা তার ঘুম ভাঙল যখন দেখল আরবের সীমানায় একটি খেজুর কুঞ্জের মধ্যে তাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে সহিস কিছু তরমুজ-খেজুর আর চাপাটি কিনে এনেছে। তাকেও খেতে দিল কিছুটা। সে না না করল প্রথমে—তারপর 'সোকর আলাহাম্‌দো লিল্লাহ্‌' বলে খেয়ে নিল।

দু'চারজন বেদুইন—যারা সীমান্ত রক্ষী, ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারল। একজন অসুস্থ পুরুষকে দেখে তারা আর কিছু বলল না। ফরিদ দেখল, দুটি ইহুদি সুন্দরী একটি পাথরে বসে খুব স্বচ্ছন্দভাবে তরমুজ খাচ্ছে, তাদের দিকেই সবার আকর্ষণ এখন।

মরুস্থানের পথযাত্রীরা সবাই চাঁদা দিয়ে ইহুদি রমণী দুটিকে অনুরোধ করতে তারা নাচগান জুড়ে দিল। দুটি লোক বাঁশি আর তারের বাজনা বাজাতে লাগল। লোকজন তাদের নাচ উপভোগ করতে লাগল।

বসন তুলে তুলে যৌবনের ঠাস-ঠমক ভরা অঙ্গভঙ্গী করে মেয়ে দুটি নাচতে লাগল। চোখে তাদের বিদ্যুতের ঝিকিমিকি। সোনার পাগড়ি পরা একজন শেখ সাহেব খুশী হয়ে তাদের সঙ্গে নাচ জুড়ে দিলে। তরমুজ ধরে দিলে তাদের গালে। নজরানা দিলে সব চাইতে বেশি।

বিকেলে গাড়ি ছাড়ল সহিস। দু'দিন দু'রাত পরে গাড়ি এসে ভিড়ল কবি গওস্সুল আনামের বাড়ির সামনে।

॥ চব্বিশ ॥

তখন সবে ভোর হয়েছে।

ডাক শুনে কবি বেরিয়ে এলেন! বললেন, 'এসো বাবা ফরিদ, নীলোফারের কোনো সন্ধান পেলে?'

'জী হ্যাঁ, পরে সব বলছি। এই বাক্সটা আমার ঘরে তুলে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক আছে, অন্য কাউকে দরকার নেই, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'

ফরিদ বাক্সটা মাথায় তুলে নিতে কবি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আহা, তুমি কেন নেবে, তুমি কেন নেবে, আমার লোকজন আছে। কি আছে বাবা এতে? নীলোফারের কোনো দুঃসংবাদ নেই তো?'

সারা ঘুম ভেঙে আলুলায়িত কেশে মুক্ত বেশে ছুটে এলো। বললে, 'দুলাভাই, আমার দুলাভাই! একি চেহারা হয়েছে গো তোমার!'

'এই সারা, সহিসকে খাবার দিতে বলো আর পঁচাত্তরটা মোহর দাও—ও আমাকে মিশর থেকে এনেছে। ভয় নেই, ঐ বাক্সটার মধ্যে ভূত বা অলৌকিক কিছু নেই। আমি এখন তোমাদের মতো সাধাসিধে সাধারণ মানুষ!'

'বুবু কই?'

'নেই!'

সমস্ত কাহিনী সংক্ষেপে শোনাল ফরিদ। নীলোফারের মৃত্যু-সংবাদে কবি হঠাৎ শোক-বিহ্বল হয়ে উঠলেন। পাশের কামরায় গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সারাও বিমর্ষ মনে বসে রইল।

ফরিদ মুশকিলে পড়ল। পিরামিডের ধনরত্নের কথা সে কেমন করে প্রকাশ করবে? আর বেদৌরাকে কি এঁরা বিদায় দেবেন? তাছাড়া প্রধান সেবক যিনি এখন পীর সাহেবর আসনে বসেছেন তাঁর সেবিকা হয়ে থাকতে হবে হয়তো বেদৌরাকে।

ফরিদ বলল, 'আমি জানতে চেয়েছিলাম, যে তুর্গন্ধ বিষাক্ত আরক থাকে মিশরী শবাধারের ওপরে তা কি দিয়ে নষ্ট করা যায়। তিনি বলেছেন ফটকিরি, নিশাদল এবং গন্ধকচূর্ণ মিশ্রণ করে।'

সেবক দল সবাই হেসে উঠলেন হো হো করে। যেন চাইবার আর কিছু জিনিস ছিল না। মরার লাসের তুর্গন্ধ দূর করবার আরক চেয়েছে! ছো! বোকা কোথাকার!

ফেরার সময় ফরিদ ঘোড়ায় উঠে বসলে বেদৌরা কাছে এলো —তার হাঁটুর ওপর মাথা চেপে ধরে গাল ঘষতে লাগল। তার উষ্ণ অশ্রুর আভাস পেল ফরিদ। বেদৌরা শুধু কাঁদতে লাগল কিন্তু কিছুই বলল না। ফরিদ ঘোড়াকে চলার তালিম দিতে বেদৌরা ছুটতে ছুটতে পালিয়ে গেল নিজের আশ্রমের মধ্যে।

ফরিদ সবাইকে হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে এলো। বৃষ্টিতে ভেজা বালির ওপরে এবার অঙ্কুরোদগম হবে। প্রকৃতি যেন হাসছে। বালিয়াড়ী পাহাড়ের গায়ের কাঁটা গাছে হলুদ, লাল, নীলবর্ণের কত ফুল ফুটেছে।

ফরিদের ফেরার খবর পেয়ে ছুটে এলো সারা। বলল, 'কোথায় ছিলে তুলাভাই, আমরা তো খুঁজে মরি।'

ঘোড়া থেকে নেমে ভেতরে চলতে চলতে ফরিদ বলল, 'পারশ্যের রাজকুমারের কাছে গিয়েছিলাম, সে বলল, আমার বোন শিরিনকে নাও তুমি আর সারাকে দাও আমাকে। বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।'

'বাবার কাছে দরখাস্ত দাও তাহলে।'

সমস্ত ধনরত্ন শোধন করার পর বড় হীরকটি দেখাল ফরিদ।

কবি গওস্মুল আনাম বললেন, 'সেকি ! এটা যে কোহিনুর ! এর দাম সাত লক্ষ মোহর !'

'এই অপার্থিব বহুমূল্যবান জিনিসটি আমি আমার ভাই ভারত-বর্ষের বাদশা-নামদার শাহজাহানকে বিনামূল্যেই উপঢৌকন দেবো।'

সারা বলল, 'অহেতুক বাহবা নেওয়ার কি মূল্য ?'

ফরিদ বলল, 'শাহজাহান আমাকে ভুল বুঝেছে। আমি উদার।'

'কিন্তু তিনি তো তোমার শত্রুতা করেছেন ?'

কবি গওস্মুল আনাম বললেন, 'শুনেছি, এই কোহিনুর যার কাছে থাকে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি হয়—সে রাজা হয়।'

হেসে উঠল ফরিদ। বলল, 'তাহলে যে মরা রাজার মাথার মুকুটে ছিল সে কেন বেঁচে পর্যন্ত রইল না আর হজরত মুসার সঙ্গে যুদ্ধে ফৌত হয়ে গেল ?'

কবি গওস্মুল আনাম পোষাক-পরিচ্ছদ পরে রাজ দরবারে বিশেষ কাজের জন্যে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন।

ফরিদ রত্নগুলি গুণে গুণে দেখল। পাঁচ হাজারটি রত্ন। অবশ্য কোহিনূরটি বাদ দিয়ে। হীরক আছে তিনশোটি।

সারার দিকে তাকাল ফরিদ। সেও চক্ষু মেলে সব রত্নগুলি দেখ-ছিল ঠিকই কিন্তু আসল রত্ন ফরিদকেই লক্ষ্য করছিল বেশি। ফরিদের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দিয়েছে।

সুগন্ধি ওড়না দিয়ে তার কপাল মুছে দিল সারা। ময়ূর-পালকের পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

সারার পরনে শুধু ঘাগরা আর কাঁচুলী। ওর নাভিমূলের প্রদীপটি বড় আকর্ষণীয়।

ফরিদ ওকে কাছে টানল হঠাৎ। বলল, 'মন ভুলিও না, দোহাই ওগো রূপসী ছলনাময়ী, ইচ্ছে করছে তোমাকে রক্তবর্ণ তরমুজের সরবতের মতো দু'হাতে বেশ করে ছানি আর প্রাণ জুড়ে পান করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করি।'

সারা বলল, 'কিন্তু আমার কি হবে দুলাভাই ?'

'কি হবে আবার। বিয়ে হবে।'

'আব্বা যে কথা দিয়েছেন পারশ্যের রাজকুমারকে—কি হবে বলো না?'

'কেন, তোমার তাকে মনে ধরে না?'

সারা তার সুডৌল সুন্দর গ্রীবাটি হেলাল। মাজা মসৃণ নখ খুঁটতে লাগল।

ফরিদ কটাক্ষ হানতেই সারা হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাগলের মতো। সে মরিয়া হয়ে ফরিদকে শুইয়ে ফেলল আর তার ঠোঁটের ওপর চুম্বন দিয়ে দীর্ঘক্ষণ চেপে থেকে উত্তেজনায় পাগলের মতো ফোঁস ফোঁস করে শব্দ করতে লাগল।

ফরিদ কোনো রকমে মুখ ছাড়াল।

কৃত্রিম ভয়ে বলতে লাগল, 'প্রহরী—দারোয়ান, গড়ের সৈনিকরা ছুটে এসো, নারী-ডাকাত আমাকে আক্রমণ করেছে! আমাকে শুইয়ে ফেলেছে! তোমরা রক্ষা করো!'

'কে তোমাকে রক্ষা করে দেখছি।' বলে ওড়না টানতে টানতে সারা উঠে গিয়ে দুয়ার জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে এলো। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

স্তূপাকার হীরকগুলি শুধু জ্বলছে। কী অপূর্ব জ্যোতির্ময় রূপ, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার খনি!

সারা দেখল ফরিদ ধনরত্নের উজ্জ্বল আভায় বহু বিচিত্র মনোহর দর্শন ফেরেস্তার শরীর ধারণ করেছে। পৃথিবীর আর কোনো মেয়ে কি এই রূপ দেখেছে কোনো পুরুষের? হজরত ইউসুফ কি এর চাইতেও রূপবান ছিলেন?

সারা বলল, 'উঃ। আমি পাগল হয়ে যাব। পৃথিবীর সমস্ত পাখির গান, জোয়ারের মর্মর, সমস্ত ঝরণার কলধ্বনি, আকাশের রামধনুর রঙ, সমস্ত ফুলের সৌন্দর্য—এখন তোমার ওপরে আরোপিত হয়েছে।'

ফরিদ মিষ্টি হাসল। বলল, 'তোমাকেও অপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছে।

শ্যালিকা, তোমার যা ইচ্ছা হয় করো কিন্তু পাপের ভাগ তোমার।'

'পাপ? কাকে বলে পাপ? তা কি এত মনোরম? এত পবিত্র? যদি দুজনের হৃদয়-মন এক হয় তবে পাপ কেন? আমরা তো পয়গম্বর বা পীর নই। আজকের পাপের বদলে যদি দয়াময় আল্লা আমাকে সত্তর দিনেরও শাস্তি দান করেন তবে তা মাথা পেতে নেবো।'

'আমার যৌবন তোমার। আমি এখন নিবেদিতা। তোমার দুটি পায়ে ধরি!'

আশ্চর্য, নারী এমন প্রগলভ হয়? সারা ফরিদের পায়ে জড়িয়ে ধরল। সারা দেহে চুম্বন করতে লাগল। তার বেশবাস অসম্বৃত হল।

ফরিদ চোখ বন্ধ করল। মনে মনে বলল, 'হে আল্লা, আমার পাপ গ্রহণ করো না! আমি শুধু অবাক কবির মতো নারীর নগ্ন সৌন্দর্যের উপাসক হয়েছি, নিরপরাধ শিশুর কৌতূহল নিয়ে ফুলের সঙ্গে খেলা করছি।'

সারার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখল ফরিদ। রত্নের আভায় তার শরীরের অপরূপ সৌন্দর্য যেন সূর্যকান্তমণির মতই ঝলমল করছে।

নীলোফারের কথা মনে পড়ল ফরিদের। সেই চুল, সেই চোখ, সেই নাক, সেই মোহিনী বক্ষচূড়া, অপূর্ব নাভিকুণ্ড, প্রলুব্ধ ক্ষীণ কোমর, তুঙ্গ মাংসল প্রশস্ত যোনিবিম্ব, সুডৌল নিতম্ব আর কোমল উরুদেশ। পদ যুগলও রক্তগোলাপ-রঙে ধোয়া।

নীলোফারের মতোই কিন্তু নেই শুধু তার সেই কালির কৌটার মতো বুকের ঠিক মাঝখানের বড় তিলটি। বাহুমূল আর জঙ্ঘাস্থল ছিল তার চির পবিত্র, চির নির্মল। সারারও তাই! কিন্তু তলপেটের সেই রক্ত তিলটি? ফরিদ কামনায় অধীর হলেও ধৈর্য ধরে বিলম্বিত লয়ে সারাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

উত্তেজনায় অধীর একটি নারী তার যৌবন-পসরাকে মেলে ধরে আছে তার বাঞ্ছিত প্রেমিক পুরুষের কাছে কিন্তু সে শুধু স্তিমিত

মদালস লজ্জাকাতর চোখে দেখছে পুরুষের মুখাবয়বটি। সেই মুখের, সেই চোখের প্রতি ভাবের খেলা! এইটিই কি তার চরম সুখ?

না, চরম সুখ, পরম আনন্দ, অপূর্ব শিহরণের সমুদ্রে ডুবে গেল সারা যখন সে আদিরসের প্রথম আস্বাদন পেল।

প্রেম-বিহ্বল হলেও ফরিদ দেখেছে সারা এতদিন ছিল অনাঘ্রাত কুসুম। কোনো কলঙ্কচিহ্ন পড়েনি তার শরীরে। অভিজ্ঞ পুরুষ সে। নারী ছলনাময়ী। তাই এই প্রথম দেখার সুযোগ সে আদৌ দেয় না লজ্জা বা যন্ত্রণার দোহাই দিয়ে, যদি সে তার ঝিল্লী-ছিন্ন কলঙ্করেখা নিজের শরীরে অংকিত করে থাকে।

সারা এতদিন পবিত্র ছিল এই গরম দেশে! ফরিদ বলল, 'তুমি অপূর্ব!'

'নীলুর মতো।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আর আমাকে ফেলে যাবে না?'

কোনো উত্তর না দিয়ে ফরিদ সারার বুকের ওপরে মুখ চাপল। তার বক্ষচূড়ায় ওষ্ঠপুট রেখে আদর করতে লাগল। সারা ভয়ানক উত্তেজিত হল।

ওরা এক সময় অবসন্ন হল। তন্দ্রাচ্ছন্ন হল। কখন রাত এলো, চাঁদ উঠল কিছুই খেয়াল রইল না।

কবি ফিরে এসে ডাক দেবার পর কন্যার স্ফীত রক্তাভ গাল আর মদালস ভঙ্গী দেখার পর বুঝতে আর তাঁর বাকি রইল না কিছুই।

তিনি গড়গড়া টানতে টানতে বাকি রাতটা পার করে দিলেন।

পারশ্য সম্রাটের পত্রটি তিনি বারবার পড়তে লাগলেন—যা তাঁকে দিয়েছেন আরবের বাদশা—যেটি নেবার জন্যে তাঁর ডাক পড়েছিল দরবারে।

'মাননীয় কবি জনাব গওসুল আনাম সাহেব, আপনার কবিতার লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের শেষ পংক্তির শেষ ব্যক্তিটি আমি। আপনার

কন্যার অসাধারণ রূপ-লাবণ্যের কথা পাঁচ-সাতটি রাজ্য জুড়ে পরিব্যাপ্ত। তাঁর সুরের জাদুতে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ। সেই রত্নটি আমার পুত্রকে আপনি দান করবেন জেনে পরম আনন্দিত। আশা করি, তাদের সাদীর পবিত্র দিনক্ষণ ঠিক করে আমাকে অতি সত্তর জানাবেন।'

সকালে পত্রটি কবি দিলেন তাঁর কন্যাকে। সারা তা পড়ে মলিন মুখে ফরিদের হাতে দিল। ফরিদ পড়ল। পড়ে সে হাসল একটু।

সারা বলল, 'হাসলে যে!'

ফরিদ বলল, 'বোধহয় কাঁদাই উচিত, তাই না? কিন্তু তোমার জন্য আমি যুদ্ধ করতে চাইলেও রশদ কই? ক্ষুদ্রশক্তি হয়ে বৃহতের সঙ্গে লড়ব কেমন করে? তার চাইতে অন্য পথ দেখি। চলো, আমরা তিনজনে হিন্দুস্তানে পালিয়ে যাই। অবশ্য আব্বাজান যদি রাজি থাকেন।'

সারা বলল, 'হ্যাঁ, সেটাই ভাল। আমরা হিন্দুস্তানে পালিয়ে যাব।'

ফরিদ বলল, 'কিন্তু বাঘের ভয়ে কুমীরের আশ্রয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? যদি শাহজাহানকে কোহিনূর দান করি সে হয়তো তোমার দিকে হাত বাড়াবে না—তবে যার ওপর বিচার চলে না সেই রাজার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করবে কে? তার চাইতে আমি একটা ঘোড়ায় চড়ে বণিক হয়ে মণি-মাণিক্য বিক্রি করতে চলে যাই পথে পথে, রাজ-দরবারে দরবারে আর তুমি পারশ্য রাজ-কুমারের বাহুলগ্না হও। এই আছে কপালে!'

সারা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে বসে পড়ল। তার গণ্ড বেয়ে অশ্রু নামতে লাগল।

ফরিদ তার কান্না দেখে বিচলিত হল। মাথায় হাত বুলিয়ে কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলল, 'ভয় নেই, আল্লাকে ডাকো, পথ একটা হয়ে যাবেই। আমি পারশ্য রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করব।

বেদৌবার জন্য বসরার বণিক সেখ হেদায়তউল্লাহ্‌র কাছে যাব, প্রেয়সী ততদিন ধৈর্য ধারণ করো। আর পত্রের উত্তর আমি বয়নামা করে দিচ্ছি।'

ফরিদ অনেক ভেবেচিন্তে লিখতে বসল: 'হুজুর নামদার, পারশ্যরাজ শাহ আব্বাসউদ্দিন খান-খানন তুনিয়া-জাহান বরাবরেষু, আপনার শ্রীচরণে অধম কবির হাজার কদম-বুসীর পর পত্রের উত্তর দানে জানাইতেছি যে, আমার কন্যার অতীব এই সুখের দিনে নিতান্ত তুর্ভাগ্য বলিয়া কঠিন এবং তুরারোগ্য রোগে সে আক্রান্ত হইয়াছে। প্রতিনিয়ত তাহার শরীর হইতে গলিত শোনিত নির্গমন হওয়ার কারণ হেকিম বলিতেছে তাহার পাক যন্ত্র এবং গর্ভকোষের মধ্যে কর্কট রোগ দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে তাহার নাসারন্ধ্র হইতেও প্রচুর পরিণামে শোনিত নির্গত হয়। এই সমস্ত ব্যাধি যদি এক বৎসরের মধ্যেই সারিয়া যায় তবে নিশ্চয়ই আমার অভাগিনী কন্যারত্নটিকে আপনার পুত্রের সেবায় উৎসর্গ করিব। বান্দার গোস্তাকি মার্জনা করিবেন।'

পত্রের মূল বক্তব্যটি কবি গওসুল আনামের পছন্দ হল। তিনি তা নকল করে পাঠিয়ে দেবার মুহূর্তে হঠাৎ সারা বাধা দিলে।

বললে, 'মিথ্যা কথা জানালে অর্থাৎ রোগের খবর দেশ-তুনিয়ায় ব্যক্ত করলে কি আমার নামে মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক হবে না? অথবা তুলাভাই যদি তার ধন-রত্ন বেচার পথে, বিদেশে থেকে অন্য রমণীর প্রলোভনে আমাকে ভুলে বসে তবে পথ কোথায় আব্বাজান? বরং আপনি অন্য কোনো অজুহাতের কথা ভাবুন, তা লিখে দিন।'

'তা বটে, এটারও একটা দিক আছে।'

ফরিদ বিরক্ত হল যখন সে শুনল এমন ডাহা মিথ্যা কথাটা পাঠানো উচিত নয়। শাহ আব্বাস নাকি ভীষণ পরাক্রমশালী। ভারত অধিকৃত ভূখণ্ড কান্দাহার তিনি দখল করে নিয়েছেন। আরবের মৈত্রী ভাঙলে বাদশাও ক্রুদ্ধ হবেন। যুদ্ধ বাধলে হয়তো

কবি আর ফরিদের কপালে অশেষ দুর্গতি লাভ হবে যদি পরীক্ষা করে সারার শরীর রোগমুক্ত বোঝা যায়।

অতএব সাদা কথায় জানানো হল কন্যার ইচ্ছায় বাদশা মাত্র কিছুদিনের জন্য যেন সময় দেন কেননা কবি গওস্থল আনাম গরিব মানুষ। বাদশার পুত্রের উপযুক্ত উপঢৌকন যোগাড় করতে তাঁর কিছু সময় বিলম্ব হবে।

ফরিদ ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। ভাবল, হায়রে নারী। তুমি কই মৃত্যুবরণ করতে পারলে ?

আবার ভাবল, সারা নিজেকে হীনমন্য করতে নারাজ কেন ? অথবা সে কি তাকে বেশি ভালবাসে বলেই যাতে তার প্রাণ বাঁচে সেই পথ খুঁজছে ?

মেয়েরা ভালবাসার কিছু বোঝে কি ? ওরা তো জলের মতো, যে পাত্রে রাখা যায় তারই আকার ধারণ করে।

॥ পঁচিশ ॥

জ্যোৎস্না রাতে ঘোড়ায় চড়ে একাই অনেক দূর চলে গেল ফরিদ। ভাবল, আর সে কয়েকদিন ফিরবে না। কিন্তু মণি-মাণিক্যগুলোই এখন তার পথের বাধা হল। কেউ সন্ধান পেলেই লুঠ করে নিয়ে যেতে পারে। তারপর লোভ মানুষের চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে পারে। যদিও তার শ্বশুর মশায় অত্যন্ত পরহেজগার, দয়ালু, নির্লোভ তবু সারা তার নিজের ভবিষ্যৎ ভেবেও তো পারশ্য রাজকুমার শাহ পারভেজের নজরে আনতে পারে মণি-মাণিক্যগুলো?

বেদৌরার কথা মনে পড়ল তার। বলিষ্ঠ সুঠাম চেহারার মেয়ে। ব্রাহ্মণ-কন্যা রূপাও সহজ সতেজ—অজানা বনফুল যেন একটা—যার গন্ধে সারা বন আকুল হয়ে আছে। জোহান পীরের নির্দেশ, বেদৌরাকে তার পিতা হেদায়তউল্লাহ্ বণিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। পীর ইলাহি কি তাকে ছাড়বেন? •

ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধার্ত হল ফরিদ। দিকহারা হল সে। মাঝ রাতের পর মনে হল তার পেছনে পেছনে কয়েকজন ঘোড় সওয়ার যেন ধাওয়া করছে সন্তর্পণে। তাদের একবার নারাধ্বনি শোনা গিয়েছিল। একটি পর্বতগাত্রের গুহার আড়ালে দাঁড়াল সে। মাথার ওপরে মহীরুহ। কিছুক্ষণ মাত্র অপেক্ষা করার পর পাঁচজন ঘোড় সওয়ার বেরিয়ে গেল তার অত্যন্ত কাছ দিয়ে। এরা কারা? কি এদের উদ্দেশ্য? এরা কি বেদুইন দস্যুদল?

সহসা ফরিদের ঘাড়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা চিতাবাঘ। গাছের ওপরে লুকিয়ে ছিল সে শিকারের সন্ধানে। বুনোমোষ, ঘোড়া বা উটের পিঠের ওপরে কামড়ে বসে এরা আর আক্রান্ত

জীবজন্তু পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়। তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেলে তার মৃত্যু ঘটায়। ঘাড়ের ওপরে কামড় বসিয়েছে চিতাবাঘটা। ঘোড়ার পেটে পা মেরে তালিম দিতেই সে ছুটতে লাগল। ফরিদের পিঠের ওপরে বাঘ। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসেই সে লাফ দিয়ে পড়ল। গড়িয়ে পড়ল। ডিগবাজি খেল। চিতাবাঘ তার হাত ছিঁড়ে দিয়েছে। ঘাড় থেকে রক্ত বেরুচ্ছে গড় গড় করে। চিতাবাঘটা আবার লাফ দিগে পড়ল তার ঘাড়ের ওপরে। ফরিদ স্থান পরিবর্তন করল। তরোয়াল মারল জোরে। লেজটি উড়ে গেল অর। কাছে লাফ দিয়ে উঠতেই চাট মেরে দূরে ফেলে দিল ঘোড়াটি। হ্রেসাধ্বনি করতে করতে সে খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। আবার চাট মারল চিতাটিকে! কাছে এসে পড়ল ফরিদের। সে তখন তলোয়ার মেরেই তুলে নিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। জব্দ হয়ে গেল বাঘটি।

চাঁদের আলোয় ফরিদ দেখল গুল বসানো বাঘটিকে দেখতে বড় চমৎকার! বেশ বড় আকারের চিতাবাঘ!

মরা বাঘটিকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে ফরিদ চলল দ্রুত গতিতে একটা আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে। ভীষণ জ্বালা করছে তার ক্ষতস্থানগুলো। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।

লোকগুলো কোথায় যাচ্ছে কে জানে!

আশ্চর্য, আলোর সন্ধান তাকে এনে দাঁড় করালে জোহান পীরের দরগায়।

মশাল জ্বলছে কয়েকটি। পরী ইলাহি প্রার্থনারত, মুদিতচক্ষু। তাঁর চারপাশে খাদ্যাদি সওদা-সামগ্রীর উপঢৌকন। তাহলে সেই লোক পাঁচজন কি দিয়ে গেল? তারা কোথায়? ভক্তরা ঘুমোচ্ছেন যে যাঁর আশ্রমে। বেদৌরার ঘরের বন্ধ দুয়ারে করাঘাত করল ফরিদ। প্রথমে কোনো সাড়া-শব্দ পেলে না। আবার আঘাত করল। আবার...

এবার ভেতর থেকে শব্দ শোনা গেল।

'কে ?'

ফরিদ বলল, 'বেদৌরা, তাড়াতাড়ি দোর খোল। আমি আহত। তৃষ্ণার্ত।'

বেদৌরা দোর খুলে ফরিদের ছিন্নবেশ, রক্তাপ্লুত দেহ দেখে ভয় পেল। হাতে ওর খোলা তলোয়ার। চিতাবাঘটি ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ফরিদ নেমে পড়ল।

'ফরিদ-ভাই !' বলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বেদৌরা। ঘরের মধ্যে তাকে টেনে এনে দোর বন্ধ করে দিল। তাড়াতাড়ি তার জামা-কাপড় খুলে রক্ত মুছিয়ে কি যেন উগ্র গন্ধযুক্ত আরক লাগিয়ে দিল। জ্বালায় ছটকাতে লাগল ফরিদ। কিন্তু রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। গরম করে আনা দুধ খেতে দিল বেদৌরা। কোলের ওপরে ওর মাথাটি নিয়ে তীব্র দহন জ্বালা প্রশমিত করার জন্য বাতাস করতে লাগল। অবসন্নতার মধ্যে ডুবে গিয়েও—প্রদীপের আলোয় গেরুয়া রঙের আলখাল্লাপরা মেয়েটি—ফরিদের মনে হল, এ বুঝি সোনা আর রুপো গলানো নদী থেকে এইমাত্র স্নান করে উঠে এলো। চকচক করছে সমস্ত মুখখানা। দৃষ্টিতে মায়ের মতো অপূর্ব সহানুভূতি। বেদৌরার ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা নেই আদৌ। সবাই তাকে 'মা' বলে। শুধু ফরিদকে সে ভাই সম্বোধন করল। নৈসর্গিক একটা জ্যোতি কি ওর মুখ-মণ্ডলের ওপরে খেলা করছে! তাকি সেবিকার প্রশান্তি!

কোনো বিদেশিনীকে কি সে এর মতোই আগে কখনো দেখে-ছিল? মনে পড়ল তার। মাতা মেরীর ছবি, যা তাকে বিক্রি করেছিল খৃষ্টানরা।

বোধহয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল ফরিদ। কারা যেন কথা বলছেন না?

'আশ্চর্য সুদর্শন এই পুরুষ, না!'

'হ্যাঁ।'

'এঁর সেবা করো আর জোহান পীরের নির্দেশ মতো চলো।

যদি এঁকে চাও আর ইনি তোমাকে চান তবে এই পবিত্র স্থান ত্যাগ করে যেও। যে ভক্ত নিজের সন্তান বলে তোমাকে চুরি করে এনেছিল সে আজ চারজন সঙ্গী নিয়ে এসে মাজারের নজরানা দিয়ে গেছে। আমি শুধু ক্রুদ্ধ চোখে তাকাতেই সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার ফেলে রেখে পালিয়েছে। নির্দেশ পেয়েছি, পথেই তার উদরাময় রোগে মৃত্যু ঘটবে। তার সমস্ত সামগ্রী ফেলে দাও অথবা গরিব মানুষদের খয়রাত করো। এই আহত অতিথি আরোগ্য লাভ করলে বসরায় তোমার পিতার নিকট যাতে দৌত্য করতে যান তার জন্য তুমি অনুরোধ করবে।'

বেদৌরা বলল, 'আপনি যথার্থই পীর, আপনার নির্দেশ অবনত মস্তকে মান্য করব।'

পীর ইলাহি উঠলেন। ফরিদের সমস্ত শরীরে একবার হাত বুলোলেন। তারপর বেদৌরার মাথার ওপরে একটা স্নেহের চুমু দিয়ে তিনি যাবার সময় বললেন, 'যেখানেই থাকো মা, আল্লাকে ভুলো না।'

দোর বন্ধ করার শব্দ হল।

চোখ খুলল ফরিদ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বেদৌরা। মায়াভরা চোখ, করুণাভরা দৃষ্টি!

ফরিদ ওর একখানা হাত নিজের হাতে নিল। দেখল। তার পর নিজের মুখের ওপরে রাখল কিছুক্ষণ।

বেদৌরা বসরার ধনীর কন্যা আর গড়পড়তা সুন্দরীর সংখ্যা বসরাতেই বেশি সারা পৃথিবীর মধ্যে, তার পরেই কাশ্মীরের স্থান। কিন্তু বেদৌরার স্বভাব-সৌন্দর্যের ওপরে আশ্রমে পুরুষভাবে থাকায় একটা দৃঢ়তা এসেছে—তাতে তার নরম ত্বকের উপকারই করেছে বেশি। শুধু তার চোখ দুটো জেগে আছে সরোবরের তলা থেকে পদ্মের মতো—যা চন্দন পেলব মাটির সম্পর্ক জানে না। এমন আয়ত কাব্যময় সুন্দর নিষ্পাপ শিশুসুলভ চোখ আর কখনো কি দেখেছে সে? এমন মসৃণ তিল ফুলের মতো নাক। চিলের ডানার মতো

সরু রেখাঙ্কিত ভুরু আর ঠোঁটের এমন পরিপূর্ণ নিভাজ গোলাপ কোমল নিখুঁত বিন্যাস! চুলে ওর ঈষৎ সোনালী ভাব কিন্তু কত মসৃণ! আঙুলগুলি ওর সুগোল, দীর্ঘ।...

ফরিদ অনেক মেয়ে পেয়েছে, অনেক রকম তাদের আকর্ষণ। কিন্তু বেদৌরা অন্য রকম। সে সহসা আহ্বান করে হঠাৎ ফুরিয়ে যায় না। তার আকর্ষণ আছে উজ্জ্বল দীপের মতই কিন্তু সহসা ডানা পুড়িয়ে দেয় না। তার পবিত্র চন্দ্রালোকে শিশুর মতো খেলা করতে ইচ্ছে করে!

বেদৌরা বলল, 'এখন কেমন বোধ করছেন ফরিদ-ভাই?'

'নৈসর্গিক একটা ভাব। হয়তো তোমার প্রভাব।'

'ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'কি এমন অপরাধ করেছিলেন যাতে বাঘের কামড় খেতে হল?'

'অপরাধেই কি তা ঘটে?'

'আমি তাই মনে করি। কিন্তু বাঘটা যখন মারতে পেরেছেন তখন আপনি জয়ী।'

ঘাড়ের নিচে লাগছিল ফরিদের। সে মাথা তুলে বেদৌরার কোলের মধ্যে মুখ লুকোতে গিয়ে দেখল রক্তে তার গোটা কোল ডুবে গেছে।

বেদৌরা ম্লান একটু হাসল। বলল, 'অনেক রক্তপাত হয়েছে আপনার। আমি একটা উষ্ণভাব পাচ্ছিলাম বটে কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন বলে নাড়া দিতে সাহস পাই নি।'

'প্রচণ্ড ব্যথায় আমার সর্ব শরীর যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।'

বেদৌরা আলখাল্লা ছেড়ে ফেলছিল গবাক্ষটার পাশে দাঁড়িয়ে। তার রমণীয় ভঙ্গীটা বড় মনোরম।

ফরিদ বলল, 'এই—এই—তুমি অমনি করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকো...'

'ভাল লাগে বুঝি দেখতে?' হেসে শুধোল বেদৌরা।

'হ্যাঁ'। বলল ফরিদ।

'কি দেখো?'

'যা কখনো দেখি নি।'

'লোকালয়ে থাকো, তুমি সুদর্শন রাজপুরুষ, অনেক নারীর সান্নিধ্যে এসেছ তুমি অথচ এক বেশবাসহীনা সন্ন্যাসিনীর মধ্যে কি এমন দেখছ যাতে তোমার চোখে এত মোহমুগ্ধতা? প্রথম দিন ছিল অবাক প্রশ্ন, ভয়, আতঙ্ক আর আজ কি! আমিও তো মুগ্ধ হচ্ছি। অতিথি, তুমি অসুস্থ। ক্লান্তিতে আর অর্ধমূর্ছিত চেতনায় তোমার মুগ্ধতা ছিন্ন করে কি সুখ?'

'তুমি কি তাহলে সংসারের সব পাপ-তাপ, দুঃখ-সুখের সঙ্গে পরিচিত?'

'না। ইন্দ্রিয় আর চেতনা, বুদ্ধি আর বিবেচনা, কাহিনী আর অভিজ্ঞতা আমাকে অনেক কিছু জানিয়েছে। কিন্তু আমি শিশুর মতো সরল আর প্রফুল্ল থাকতেই ভালবাসি।'

বলতে বলতে শরীর আবৃত করল বেদৌরা। ফরিদের কপালে চুম্বন করল হেঁট হয়ে। রক্তটা মুছে দিয়ে আবার আরক দিল। ভীষণ জ্বালায় কাতরাতে লাগল ফরিদ। এটা সেই আগের আরক নয়। মনে হতে লাগল যেন সমস্ত শরীরে তার আগুন ধরে গেছে। ক্ষতমুখে বাতাস করতে থাকল বেদৌরা। যন্ত্রণায় তাকে আঁকড়ে ধরে পেটে জঙ্ঘায় মুখ ঘষতে আর কামড়াতে লাগল। বলতে লাগল, 'বেদৌরা, এ কি তুমি দিলে! আমাকে কি তুমি দিলে? আমাকে কি তুমি মেরে ফেলতে চাও? এটা আরক নয়, এটা বিষ! আমি মারা গেলাম...'

'হ্যাঁ, এটা বিষ। পুড়িয়ে দেবারই বিষ। বাঘের নখে আর দাঁতে বিষ থাকে। তার লালায় বিষ। সেই বিষ এখন জ্বালিয়ে না দিয়ে উপায় নেই। তোমাকে এই মুহূর্তে কি যে ভাল লাগছে—ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না—কেন আমার এমন হচ্ছে! তোমার কষ্ট আর আমার সুখ, এটা কেমন করে হয়?'

'দোহাই তোমার বেদৌরা, পায়ে ধরি তোমার, ঘোড়া কোথায়, আমি পালাব, কোনো ঠাণ্ডা পুষ্করিনীতে ঝাঁপ দেবো, আমাকে ছেড়ে দাও! এর চেয়ে বাঘের পেটে যাওয়া ভাল ছিল। অপগণ্ড বালিকা, তুমি কি জানো এতে ভাল হবে? আর যে সুখের আকর্ষণের স্বাদ পেতে তুমি আকুল তাতে ক্লান্তি এলেই কি আবার আরক ঢেলে দেবে? এই সুখের অন্য সময় আছে, তোমার যৌবন এখন পুরুষ সুখের আকাঙ্খায় হঠাৎ জেগে উঠেছে। আর পতিতাও কি এত সরল হতে পারে যে তার নগ্নমূর্তি দেখাতে এতটুকু লজ্জা পায় না? তুমি সরল শিশুর মতো কিন্তু শিশুর দেহে এত আগুন কেন?'

হঠাৎ হি হি করে হাসতে লাগল বেদৌরা যখন প্রলাপ বকতে বকতে ফরিদ ওকে জড়িয়ে ধরে ওর গণ্ডে ঘাড়ে কাঁধে বুকে কামড়াতে লাগল। বলতে লাগল, 'এমনি কারো, উঃ! কি ভাল লাগছে। ঝড় উঠুক, সিমুম ছুটুক, পৃথিবী লয় হয়ে যাক! আমি আবার তোমার ক্ষতস্থানে দুশো বছরের আঙুরের অম্লরস ঢেলে দেবো।'

'না, দোহাই, তোমার পায়ে ধরি…'

'তাহলে যা বলব তাই শুনবে?'

'বাধ্য করছ? কেন, তোমার কি ক্ষতি করেছি?'

'না, ক্ষতি নয়। প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চাই। আমাকে তুমি সঙ্গিনী করবে বলো! নিয়ে যাবে বলো এখান থেকে আমার পিতার কাছে?'

'হায় আল্লা!' বলে হঠাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ফরিদ। সে চেয়ে রইল বেদৌরার চোখের দিকে। বেদৌরাও চেয়ে আছে। যেন বাঘিনীর দৃষ্টি!

ফরিদ হাত বাড়িয়ে ওকে আহ্বান করল। বেদৌরা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দুজনেই ওরা খুব কাঁদতে লাগল পাগলের মতো চুমু খেতে খেতে।

॥ ছাব্বিশ ॥

এখনো দেখা যাচ্ছে বেদৌরার জানালার আলোটা। এইমরুভূমিটা পাড়ি দিলেই হয়তো আর আলো দেখা যাবে না।

দীর্ঘ পাঁচদিন অধিবাসের পর ঝোলার মধ্যে খোরমা, আখরোট, পেস্তা, ডালিম, খেজুর ইত্যাদি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ফরিদ চলেছে বসরার উদ্দেশ্যে।

নীলোফার কি তেজবীর্যময়ী তপস্বিনী হয়ে আবার তার জীবনে ফিরে এলো বেদৌরারূপে?

মদিনা পার হবার পর এক মরুদ্যানে বৃদ্ধ বণিকের কাছে খবর নিয়ে ফরিদ জানতে পারল বসরা নগরী বহুদূর। উত্তর-পূর্ব কোণাকুণি সোজা দিন চারেক ঘোড়ায় করে গেলে পৌঁছে যাবে। প্রায় দুশো ক্রোশের মতো ব্যবধান। পঁচিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করবে সে প্রতিদিন। পারশ্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে তীর থেকে মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে নগরীটি।

পথে কোনো বিপদ না ঘটলেও ঠিক চতুর্থ দিনেই বসরায় পৌঁছে হেদায়তউল্লাহ্ বণিকের খোঁজ নিতেই সে ঠিকানা পেয়ে গেল। শহরের তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি। মণি-মাণিক্য আর গালিচা, শাল, রেশমী কাপড়ের ব্যবসায় তিনি শহরের মধ্যে বলতে গেলে প্রধান ব্যক্তি।

শহরের প্রধান রাজপথের ওপরে বর্ণাঢ্য দোকানের মধ্যে ঢুকে হেদায়তউল্লাহ্ বণিকের দেখা পেলে ফরিদ।

সালাম জানিয়ে ফরিদ বলল, 'আমি আরব থেকে আসছি, ক্লান্ত, অবসন্ন।'

'বসুন, কি চাই আপনার ?'

'আমি কোনো কিছুর প্রার্থী হয়ে এসেছি এমন কি মনে হচ্ছে আপনার ?'

'কি জানি! আরবদের আমি ভয় করি। তারা কেউ কেউ হজে নিয়ে যাবার জন্যে আসে আর অনেক কিছুর দোহাই দিয়ে মানুষের প্রায় সর্বস্ব লুটে নেয়।'

'তারা বেদুইন দস্যু-সম্প্রদায়। আমি আসলে একজন ভারতীয়। আরবে কিছুকাল আছি। সে যাক, আপনি একজন খ্যাতিমান রত্ন-বণিক। উত্তরাধিকারীসূত্রে আমি কিছু রত্ন লাভ করেছি, সেগুলির কিছু কিছু বিক্রি করে এই বসরাতেই বসবাস করতে চাই।'

'আপনার রত্ন এনে থাকলে দেখাতে পারেন।'

কোমরে বাঁধা থলির মধ্যে থেকে ফরিদ কয়েকটি রত্ন বার করে বণিকের হাতে দিল।

বণিক পরকলা দিয়ে প্রথমে দেখলেন। তারপর যাচাই করতে পাঠালেন একজন পাকা চুল্‌-দাড়িঅলা বুড়োকে।

ততক্ষণে সরবৎ আর ফল মিষ্টান্ন এলো ফরিদের সামনে। টাকা-কড়ি নিতে লাগলেন বণিকটি। দোকানে খরিদ্দার বিস্তর। বহু বিচিত্র বর্ণাঢ্য পোষাকের লোকজন। বোরখা-পরা মহিলা দোকানদারও আছে কয়েকজন। মুখ তাদের ঢাকা নেই। কোথায় যেন কেউ হালকা সুরে বাজনা বাজাচ্ছে।

বুড়োটি এসে বলল, 'বহুকালের অব্যবহৃত সাবেক মাল। খাঁটি আছে।'

'বিক্রি করবেন ?'

'জী হ্যাঁ।'

'এই পাঁচটি রত্নের দাম আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি।'

'মাত্র ?'

'হ্যাঁ। রত্ন বা পাথরের কি দাম যদি মানুষ গ্রহের নিগ্রহ

কাটাবার জন্য ধারণ না করে? অবশ্য বাদশা বা ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও তাঁদের মুকুটে বা পাগড়িতে রত্নাদি ধারণ করেন। কেউ কেউ তাবিজ-কবচ করেন। যাকগে, পাঁচ হাজারের বেশি আমি দিতে পারব না।'

'আমি অন্যত্র যেতে পারি?'

'যান কিন্তু ঠকাবার ভয় আছে।'

'কি করে?'

'দেখার সময় বদলে নেবে।'

ইতস্ততঃ করতে লাগল ফরিদ।

মাঝ-বয়সী বণিক একবার সুন্দর চোখটি মেলে হাসলেন। বসতে ইঙ্গিত করলেন। ফরিদ বসল। তিনি টাকা গুনে দিয়ে বললেন, 'অত দূর থেকে এসেছেন কষ্ট করে, আচ্ছা, আর এক হাজার বাড়িয়ে দিলাম। আরো কিছু থাকলে আমাকে দেবেন।'

ফরিদ সোনার মোহরগুলো নিয়ে থলিতে ভরে কোমরে বাঁধল। তারপর বলল, 'আপনি এখন ব্যস্ত আছেন কিন্তু খুব গোপন জরুরী একটা সংবাদ আছে আপনার—যার জন্য আমার এতদূর আসা।'

তটস্থ হলেন বণিক হেদায়তউল্লাহ্। বললেন, 'তাহলে আসুন আপনি আমার সঙ্গে।'

একটি নিভৃত কক্ষের মধ্যে এসে বসল ফরিদ। বলল, 'আপনার সন্তানাদি আছে তো?'

'জী না। কেন বলুন তো?'

'আদৌ কখনো আপনার সন্তানাদি হয়নি?'

'হ্যাঁ, তা হয়েছিল। একটি তিন বছরের কন্যা আমার চুরি যায়। বড় সুন্দর দেখতে ছিল মেয়েটি। তখন আমি দরিদ্র ছিলাম। ছোট্ট একটি দোকান ছিল আমার। দোকানে তাকে বসিয়ে রাখতাম্। মাঝে-মধ্যে বাজারে ঘুরে বেড়াত একা একা। সবাই তাকে ভালবাসত। আদর করত। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। হঠাৎ একদিন তাকে পাওয়া গেল না।'

'কত বছর আগের এই ঘটনা ?'

'হ্যাঁ, তা বছর পনেরো হবে বোধহয়।'

'তারপর আর বিয়ে করেন নি ?'

'জী না। হয়তো সময় হয়নি অথবা প্রয়োজন হয় নি। শোক-সন্তপ্ত স্ত্রীকে আবার যদি সতীনের জ্বালা দিতাম তবে কি সুবিচার করতাম আমি ?'

'আপনার সেই চুরি-যাওয়া কন্যার সংবাদ আমি এনেছি। সে সুস্থ আছে। পবিত্র আছে।'

'কোথায়—কেমন করে আছে সে !'

'আমি তার ছবি এঁকে এনেছি—দেখুন, এই তসবীর।'

বণিক দেখলেন। হ্যাঁ, এই রকমই তো হবে। যৌবনে তাঁর স্ত্রীর মুখের আদলও ছিল এমনি। বললেন, 'বেশ। উপযুক্ত মূল্য আমি দিচ্ছি এই ছবিটির, আরো সংবাদ দিন, তার জন্যও নজরানা পাবেন।'

'ছবিটি আপনি এমনিই পাবেন, ছবি বেচা আমার পেশা বা ব্যবসা নয়। তবে ইচ্ছা হলে এঁকে থাকি। ইচ্ছা হলে গান গাই। বাজনা বাজাই। আর নজরানা আমার চাই না। আপনি পিতা, হারানো কন্যাকে পেয়ে যদি সুখী হন সেই আনন্দই আমার আনন্দ।'

'আপনি খুব মেহেরবান। দয়া করে বলুন সে কোথায় আছে।'

'নাম তার বেদৌরা। পুরুষের পোষাক পরে জোহান পীরের মাজারের সেবিকা হয়ে দিন যাপন করছে। সে ভাল লেখাপড়া শিখেছে। শিশুসুলভ হাবভাব। পাপ বলে কিছুই জানে না। অন্য কোনো কারণে ঐ মাজারে আমি হত্যে দিয়ে স্বপ্নের মধ্যে নির্দেশ পাই যে কন্যাটিকে যে ভক্ত দান করে যায় মাজারের সেবার জন্যে সেটি সেই ভক্তের নিজকন্যা নয়, চুরি করা। ওর বাবা বসরার বণিক হেদায়তউল্লাহ্। তাঁর কাছে তুমি নিজে তাকে পৌঁছে দাও।—তাই আমি এসেছি।'

'অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার পরিচয়?'

'খুব ব্যথার, দুঃখের। আমি একজন সর্বহারা। পথিক।'

'তাহলেও পিতৃপরিচয় তো মানুষের থাকে? আপনার চেহারা আর গায়ের রঙ কিন্তু বলে দিচ্ছে আপনি সাধারণ ঘরের ছেলে নন।'

'আপনি বণিক। রত্ন চেনেন। আমি হলাম বাদশা জাহাঙ্গীরের পুত্র যুবরাজ শাহ ফরিদ।'

'মানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিলাসী দিল্লীর সুলতান শাহজাহানের ভাই আপনি?'

'জী হ্যাঁ, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই। আমি রাজ্য থেকে বিতাড়িত। আমাকে তিনি ভয় করেন। পাছে সিংহাসন কেড়ে নিই। কিন্তু জানেন, ওসবে আমার ইচ্ছে নেই।'

'বাবা, আপনি আমার মেয়েকে এনে দিন, উচিত নজরানা, সেই মতো ধনরত্ন আপনাকে দেবো আমি।'

ফরিদ কথা দিল, আশ্বাস দিল যে শীগগিরী বণিক তাঁর কন্যার মুখ দর্শন করতে পারবেন।

একদিন মাত্র রসরায় কাটানোর সময়ই ফরিদ বিস্ময়কর ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়ে গেল প্রধান বণিকের ছবি এঁকে দিয়ে আর রাত্রির জলসায় গান-বাজনা করে।

পরদিন সে বিদায় নিল বেদৌরাকে আনবার জন্যে।

বণিক বলেছিলেন, 'আমি কি পাঁচজন প্রহরী দেব আপনার সঙ্গে?'

জিজ্ঞাসু চোখে হেসেছিল ফরিদ।

বণিক জ্ঞানী এবং চতুর ব্যক্তি। বললেন, 'অবশ্য আপনি বীরপুরুষ, একাই একশো। আপনি বিশাল রাজ্য হিন্দুস্তানের বাদশা জাহাঙ্গীরের পুত্র। রাজ্য পেলেও আপনি চালাতে পারেন, আর এতো সামান্য একটা ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, যুবরাজ ফরিদ,

বেদৌরা মা-মণিকে পুরুষের পোষাকেই আনবেন। তার জন্য একটি ঘোড়া কিনে নেবেন এবং অন্যান্য খরচের টাকাও আমি দিচ্ছি।'

লু হাওয়ায় নিঃশ্বাস টানতে পারছে না ফরিদ। মরুভূমি ভীষণ মূর্তি ধরেছে আজ। দূরে দূরে মরীচিকা ঝিলমিল করছে। প্রচণ্ড শুকনো হাওয়া। ঘাম হচ্ছে না। শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। ঘোড়াটিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার শ্বশুরের বিখ্যাত ঘোড়া। শ্বশুরের মতো বয়স হয় নি তো? হাসি পেল তার কথাটা মনে হতে। ঝোলার মধ্যে থেকে একটা পিঁয়াজ বার করে কড়মড় করে চিবোতে লাগল। একটা বেদানা খেলে। দমকা হাওয়ায় বালি উড়ছে পাক খেয়ে খেয়ে পাখির ডানার মতো। বালিয়াড়ি পাহাড়। বেশি দূর দেখা যায় না। সবই যেন ধোঁয়া আর ধোঁয়া। বেদৌরা পথ চেয়ে বসে আছে তার। পুরুষ সাহসী বীর্যবান, সে ইপ্সিতা নারীর প্রেমের আকাঙ্খায় অন্ধকার সমুদ্রে, আগুন-জ্বলা মরুভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেদৌরার সঙ্গে কখন দেখা হবে সেই ভাবনাই সমস্ত পরিশ্রম, ক্লান্তি, অবসাদ—ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা—নাম, যশ, মর্যাদা—সব কিছু হরণ করে নিয়েছে। এইটাই তো জীবন। এই সংগ্রামেই তো আনন্দ। বাদশা শাহজাহান সিংহাসনে বসে চোখের ইংগিত করলেই বহু সুঠাম সুন্দরী, কাশ্মীরী 'আনারকলি' (ডালিমের ফুল) এসে হাজির হয়। কিন্তু যাকে সহজেই পাওয়া যায় তাকে পেয়ে আনন্দ কিসের? এক ঘণ্টার চেষ্টায় পাওয়া গেলে এক দিনের মধ্যেই তা ফুরিয়ে যায়। ফরিদ তার প্রথম যৌবনে যেসব রমণীদের সঙ্গে লীলা করেছিল আজ কি আর দেখলে তাদের চিনতে পারবে? যারা অনেক পায় তারা সত্যিই চিনতে পারে না। তার চোখে সবাই তখন রাঙা পিঁয়াজ!

সরাইখানার মালিক নিয়াজীর কন্যা রত্নটির কি নাম যেন? অনেকক্ষণ ভেবেও কিছুতেই মনে আনতে পারল না। অথচ তার আকর্ষণের জন্যেই নীলোফার তাকে ত্যাগ করে গেল!

সারার কথা মনে হল। এতদিনে তার বিয়ে হয়ে গেল কিনা কে

জানে? সারা কি তার জন্যে সুখ চাইবে না? শাহ পারভেজ কি তার খুব অযোগ্য হবে? শ্বশুরের যখন ইচ্ছা তাই হোক কিন্তু যদি তার সামনে বেদৌরা না আসত তাহলে কি এমন উদার হয়ে ভাবতে পারত, সারা অন্য আর একটি পুরুষকে নিয়ে সুস্থ জীবন যাপন করুক? প্রেম আর আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব মানুষকে ঈর্ষাকাতর করে তোলে।

ফরিদ হঠাৎ নিজের মাথায় গাঁট্টা মারল মাথাটা এত গরমেও ঠিক আছে তো? কত রকম দর্শনচিন্তাও এখন মাথায় আসছে তার।

হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে হল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সে। ডিম ছেড়ে বেরিয়েই পৃথিবীর কোন প্রান্তে উড়ে গেছে কত পাখি মা-বাবা সে সবের কি খবর পায়?

কুড়িটা খেজুরগাছ ঘেরা পরিচিত সেই মরুদ্যানটি পেয়ে গেল ফরিদ। গাছগুলি দীর্ঘ। সব ক'টির গোড়া চক্রাকার হয়ে মিলেছে এক জায়গায়। কেউ হয়তো বীজ পুঁতে রেখে গিয়েছিল এই রকম করে। দু'জন লোককে দেখল সেখানে। গরমে পিপাসায় পাগল হয়ে গিয়ে তারা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। এক সময় লোক দুটো পড়ে যাবে। অজ্ঞান হয়ে থাকবে। তারপর রাত্রে ঠাণ্ডা পেলে হয়তো জ্ঞান ফিরবে। তাদের দুজনকে ধরে পায়ে পায়ে বেঁধে ছায়ায় ফেলে রাখল। পিঁয়াজ খাওয়াল। শুকনো নারকোল, খোরমা আর বাদাম খেতে দিল। রাত হলে ওদের জ্ঞান হবে, তখন পালিয়ে যাবে। দুজনের গায়েই অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। ঘা দগদগ করছে। জামা-কাপড় ছিন্ন। মনে হচ্ছে ওরা ডাকাত দলের লোক। অথবা লুণ্ঠিত হয়েছে ওদের সবকিছু। ওরা দুজনেই কথা বলতে পারছে না। হাসছে আর কাঁদছে। বুবু করে শব্দ করছে। এখন ওদের উদ্ধার করা শক্ত! কিন্তু হঠাৎ ফরিদের চোখে পড়ল ওদের একজন আর একজনকে চোখ মারল। ঘা রক্ত এসব তাহলে তৈরি করা? ওরা অভিনয় করছে। কিন্তু বেচারারা, সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে। যখন ওদের সেবা করতে ব্যস্ত ছিল তখনই

আক্রমণ করতে পারত। ফরিদ ঘোড়ার দিকে এগোতেই লোক-দুজন তাদের পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। ফরিদ তৈরি ছিল। এমনটাই আশঙ্কা করেছিল। দুজনকেই সে ছাড়িয়ে ফেলল। তারপর তলোয়ার বার করে হাঁক দিল, 'আয় দেখি নিমক-হারামরা। দুজনেরই মাথা উড়িয়ে দেবো।'

কিন্তু ফরিদ নিরুপায় লোক দুটোর প্রতি করুণা করে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল।

একজন বলল, 'আমাদের সর্বস্ব লুঠ করেছে একদল বেদুইন দস্যু, তাদের সরদার তুমি।'

ফরিদ বলল, 'সেই ধারণায় উপকার পেয়ে কি প্রতি-উপকার করবার জন্যে আমাকে আক্রমণ করেছিলে বন্ধুরা? এটা একটা তোমাদের মিথ্যা চাল। ঘোড়ার চাট মেরে তোমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

ফরিদ বিশ্রাম করতে পারল না। সন্ধ্যায় সে একটি গ্রামে এসে পৌঁছল। একজন মুসলমান বৃদ্ধ চাষী খুব সমাদর করে, তাকে খাওয়াল। আশ্রয় দিল। বৃদ্ধ তার দুঃখের কথা বলল অনেক রাত পর্যন্ত। খেজুর বাগান, আঙুর ক্ষেত, তরমুজ, লাউ, সব্জির চাষ-আবাদ নিয়ে তার সময় কাটে। পাঁচটা উট আছে। ঘোড়া আছে দুটো। ভেড়া আছে পঁচিশটা। চারটে বউ। তাদের দশ ছেলে আর দশ মেয়ে। ছেলেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করে। দশ জনেরই বিয়ে হয়েছে। মেয়েদের এখনো দশ জনেরই বিয়ে হতে বাকি। সবাই একসঙ্গে আছে। বিরাট সংসার। নানান অজুহাতে মেয়েগুলো প্রায় সবাই ফরিদের সামনে এলো। তাদের কাউকে যদি পছন্দ হয় ফরিদের তো বিয়ে করে নিয়ে চলে যেতে পারে।

রাত্রে শোবার পর চাষী বুড়োর অবিবাহিত দশটি মেয়ে একে একে এসে ফরিদের বিছানার চারপাশে ঘিরে বসল। কারো হাতে তেলের বাটি, কারো হাতে চিরুনী, কারো হাতে পাখা, সরবতের

গেলাস, জলের পাত্র, মেহেদি বাটা, জাফরান, রং আর তুলি, পবিত্র কোরআন, বেহালা—শেষ জনের হাতে তাম্বুরা।

মেয়েদের একজন বলল, 'হে আমাদের রাতের অতিথি, আপনি যদি বিরক্ত না হন তাহলে আমরা কয় ভগিনী মিলে আপনার সেবা যত্ন করি। এই আমাদের রেওয়াজ।'

অন্যজন বলল, 'আমাদের মধ্যে যাকে আপনার পছন্দ তাকেই সঙ্গিনী করতে পারেন।'

ফরিদ বলল, 'আমার সৌভাগ্য যে আপনারা দশ বোন একসঙ্গে সেবা করতে এসেছেন! যা হোক, আমি বেরসিক নই। প্রথম-জন পবিত্র কোরআন পাঠ করুন কিছুক্ষণ।'

তিল ফুলের মতো সুন্দর নাক-অলা, বেণী বাঁধা, পুতির চুম্‌কি লাগানো লাল টুপি পরা তন্বী মেয়েটি মিহি সুরে কোরআন শরীফ পড়তে লাগল।

ফরিদের পায়ের তলায় আর হাতের তালুতে মেহেদি রঙ লাগাতে লাগল আর একটি মেয়ে। অন্য একজন চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়াতে আর বিলি কাটতে লাগল। বেহালার তারে খুব ধীরে ধীরে ছড় টানতে লাগল একজন। তুলিতে করে রক্তের মতো টকটকে জাফরান রঙ নিয়ে ফরিদের দুটো ঠোঁট রাঙিয়ে দেবার পর বোনে-দেরও ঠোঁট রাঙাতে বসল আর একজন।

ফরিদ প্রত্যেকটিকে ভাল করে দেখল শুয়ে শুয়ে। যেন কাকে নেবে তাই পছন্দ করছে। তারপর সে চোখ বন্ধ করে চুপ চাপ চিৎ হয়ে পড়ে রইল।

'কাকে আপনার পছন্দ হল দয়া করে বলবেন কি? তাহলে সেই আপনার সেবা যত্ন করবে সারারাত—সকালে তাকে সাদি করে নিয়ে যাবেন যেথা আপনার খুশী।'

ফরিদ বলল, 'কন্যাদায়ে আপনাদের বৃদ্ধ পিতা যে নিয়ম বার করেছেন তা শরিয়ত বহির্ভূত এবং বোকা অতিথি আপনাদের

আতিথ্য নিয়ে ফাঁদে পড়বে সে যদি আমার মতো চালাক না হয় তো…'

সকলে তখন হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল মেয়েগুলো। একজন একচোখ দেখিয়ে বলল, 'আপনি চালাক ?'

ফরিদ এক চোখ বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। সবাই হাসতে লাগল। শুধু কোরআন পড়তে ব্যস্ত যে মেয়েটি সে মাথা নিচু করেই আছে।

ফরিদ উঠে বসে দু'চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হবার মতো কিছুক্ষণ বসে থাকল। মন দিয়ে আল্লার বাণী শোনার পরই সে দেখতে পেল অন্তরের অন্ধকার পর্দায় একে একে সেইসব বিচিত্র বাহারের সারি সারি অক্ষর সাজানো পবিত্র কোরআনের সুরা। তাহলে তার অজু আছে, নইলে এসব আসত না! সামনে তার বড় বিপদ। এই ইন্দ্রজাল তাকে ছিন্ন করতে হবে। সে আর তাকাল না। জলদ গম্ভীর স্বরে সে কোরআন শরীফ পড়তে লাগল। তার স্বরের মাধুর্যে সবাই অবাক হল।

কিন্তু কতক্ষণ আর এরকম চলতে পারে যখন চক্রান্তকারিণীরা ফরিদের চারপাশে বসে আছে? ঘণ্টাখানেক পরে একজন বলল, 'আবু হেনা, তোর কোরআন শরীফ রেখে দে—আর কেউ ওর শরীর অপবিত্র করে দে—তাহলে আল্লার বাণী উচ্চারণ করা বন্ধ হয়ে যাবে। এই হাফেজ সাহেবকে জীবনের স্বাদ পাওয়াতে হবে।'

তার কথা মতো কাজ করা হল।

একটি মেয়ে ফরিদকে চুম্বন করতে লাগল। ফরিদ হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল। অন্তরের অন্ধকার সমুদ্র উত্তাল হল। কোর-আন শরীফের বাণীগুলো ঢেউভাঙা স্রোতে দোল খেয়ে খেয়ে ডুবে যেতে লাগল।

দুর্গন্ধ এলো নাকে।

মেয়েগুলো সবাই তাকে ধরে জামা-কাপড় খুলে ফেলতে লাগল। মুখ চেপে ধরেছে একজন।

ফরিদ বিরক্ত হল। রাগ হল তার। ভাবল, এদের প্রত্যেকটিকে সে জব্দ করবে, কাউকে আর অক্ষত রাখবে না।

বলল, 'আহা আহা, রঙ্গিনীরা এমন বেরসিক হয়ো না তোমরা। আমাকে বুঝতে দাও, ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর করতে দাও। প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করলে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। এতে শুধু মনের ক্ষিধে মেটে—দেহের আগুন নেভে না!'

একজন মেয়ে বলল, 'তাহলে কাকে আপনি চান বলে দিন।'

ফরিদ চক্রান্ত করল। ভাবল একবার, হজ করা তার বৃথাই গেল, তাই চল্লিশ বছর বয়সের আগে হজ করা উচিৎ নয় বলে জ্ঞানীরা উপদেশ দেন।

ফরিদ বলল, 'আমি একজন একজন করে আমার কাছে আসতে বলছি। কাকে আমার পছন্দ ঠিক করতে পারছি না। যাকে দেখছি তাকেই যেন পছন্দ।'

'বেশ। আমরা একে একে আসছি।' বলে সবাই চলে গেল কিন্তু বড়টি গেল না।

এইখানেই বাধল গণ্ডগোল। ফরিদ ভেবেছিল সবাই চলে যাবে। আর ওদের মধ্যে থেকে কে আগে আসবে তাই নিয়ে কলহ হবে কিছুক্ষণ। ততক্ষণে এদিকের দরজা খুলে পাঁচিল টপকে ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু বড় বোনটি বসে রইল যে। থাকুক। তাকে বলল, 'দোরটা এঁটে দিয়ে এসো—কেউ যেন আমাদের কথা শুনতে না পায়।'

মেয়েটি দোর এঁটে দিল। কাছে এলো। ফরিদ তাকে হাত ধরে বসাল। বলল, 'তোমার বয়স কত? নাম কি?'

মেয়েটি বলল, 'আমার নাম আবু সাহানা। বয়স পঁচিশ।'

'আমাকে তোমার ভাল লেগেছে?'

মাথা কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে আবু সাহানা ফরিদের কোলের ওপরে ঢলে পড়ল। ফরিদ তাকে বিবসনা করল, বলল, 'আমাকে চাও, বেশ! কিন্তু আমার জীবনে অভিশাপ আছে, যে নারী মাত্র একবার

আমাকে তার দেহে ধারণ করে তার মৃত্যু ঘটে। নইলে দেখতেই তো পাচ্ছ নগ্ন নারীদেহও আমাকে উত্তেজিত করছে না কেন! এমন পুরুষ কি কখনো দেখেছ?'

'না।'

'না মানে?'

'আপনি যথেষ্ট সংযমী।'

'তাহলে কি তোমরা, মানে তুমি, অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছ?'

'না।'

'তাহলে জানলে কি করে যে আমি সংযমী?'

'পুরুষদের ভাবে বোঝা যায়।'

দোরে আঘাত পড়ল। যা ভেবেছিল তাই। যাদের আকাঙ্খা বেশি তারা অভুক্ত এবং অতৃপ্ত হলে ঈর্ষান্বিত হবেই। দোর খুলে দিতে বলল ফরিদ। কিন্তু আবু সাহানা বিছানা থেকে উঠল না। সে তার দৈহিক ঐশ্বর্য নিয়ে পড়ে রইল।

ফরিদ ভাবল মেয়েটাকে একটা লাথি কষিয়ে খাটের নিচে ফেলে দেয়। এরা অসৎ চরিত্র। সাধারণ চাষীর মেয়ে। কোনো লালিত্য বা সৌন্দর্য নেই।

নিজে সে থু থু ফেলল একদিকে। আর দোর খুলে দিল। আর একটি বোন এসে হাজির হল। সাহানা তখন উঠে চলে গেল।

'তোমার নাম?'

'আবু আসমা।'

'আসমা! আসমা নামটা পরিচিত। হ্যাঁ, ভারতের এক সরাইখানার মালিকের কন্যা। যাক গে, আমাকে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'চিরকালের জন্য?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি কি জানো যে আমার কোনো বউকেই একদিনের

বেশি বাঁচিয়ে রাখি না। দূরে নিয়ে গিয়ে তাকে কেটে ফেলে তার রক্ত পান করি। আমি মানুষরূপী একজন রাক্ষস।'

'হেই বাপ!' মেয়েটা দোর খুলে পালাতে গেল। ফরিদ ছুটে গিয়ে তাকে ধরতে যেতেই পালিয়ে গেল। আর কোনো মেয়ে এলো না। দোর বন্ধ করে দিয়ে আপাতত নিশ্চিন্ত হল ফরিদ। ঘুম এলো না। বেদৌরা তার অপেক্ষায় বসে আছে। বাইরে ঘোড়াটা আছে নাকি কে জানে!

বেহালাটা পড়ে আছে দেখে সে বাজাতে শুরু করল। বাইরে মেয়েগুলো চুপ করে শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরেই পাখি ডাকতে শুরু করতে ফরিদ বুঝল ভোর হয়ে গেছে। হঠাৎ দোর খুলে দাঁড়াল সে। মেয়েগুলো ঘুমোচ্ছে ওখানে এখানে পড়ে। ঘুম পড়ানী বাজনা বাজাচ্ছিল সে বেহালায়। জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করছে তার বাজনাটা।

ফরিদ আস্তে আস্তে বাইরে এলো। চারদিকে চুপচাপ। তাকে দেখে ঘোড়াটা হ্রেসা ধ্বনি করে উঠল। ফরিদ তলোয়ারটি কোষমুক্ত করে হাতে নিয়ে ঘোড়ার কাছে এলো। হাবসী পাহারাদার গাছের গোড়ায় বসে ঘুমোচ্ছিল। পিঠে উঠতেই ঘোড়াটা হ্রেসা-ধ্বনি করল। হাবসীটি জেগে উঠেই 'কোন্ হ্যায়'—বলে ছুটে এলো। হাতে তার চওড়া তলোয়ার অর্থাৎ খড়গ। কাছে আসতেই ঘোড়াটাকে পেটে মেরে বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করল শত্রুকে জোর চাট মারতে। শিক্ষিত ঘোড়াটি তাই করল। ফড়াং করে পিছলীর পা ছুঁড়ে ঘোড়াটি ঠিক তেগে হাবসীর কপালে মারল জোরে একটা চাট্! হাবসীটা বাপ বলে ছিটকে পড়ল। আবার উঠে ছুটে আসতেই ঘোড়াটা তাক বুঝে মারল প্রচণ্ড জোর লাথি। ঘোড়ার সমস্ত জোর হল তার পিছনের পায়ে। ঘোড়ার চাট্ সহ্য করা খুবই কঠিন। হাবসীটা আর উঠতে পারল না।

ফরিদ ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক দূর চলে এলো। সকাল হয়ে গেল।

বেলা বাড়তে লাগল। একটা পল্লীতে এসে সরাইখানায় ঢুকে স্নান আহারাদি করল।

বিকালে আবার বেরিয়ে পড়ল।

যখন সে জোহান পীরের দরগায় এসে হাজির হল তখন রাত বারোটা হবে।

ঘোড়া থেকে নেমে পীর ইলাহিকে কুর্নিশ জানাতে তিনি বললেন, 'খবর ভাল তো ভাই-সাহেব?'

'জী হ্যাঁ। জোহান পীরের ইচ্ছাই সফল হবে। সংবাদ সবই সত্য। আপনার নির্দেশ মতো আমি পীর সাহেবের খেদমত করতে পারি।'

'আপনি এখন বিশ্রাম নিন। বেদৌরা অপেক্ষা করছে। বেচারা অভাগী মেয়ে! শিশুকাল থেকে এখানে ছিল; কেমন একটা সাংসারিক মায়া মনকে আচ্ছন্ন করেছিল ওকে ঘিরে। ওর পিতার শোকসন্তপ্ত হৃদয় পীরের ইচ্ছায় স্নেহপ্রেমে আপ্লুত করে দিয়েছে। আপনি ওকে পৌছে দেবেন।'

ফরিদ বলল, 'দেখুন পীর সাহেব, আমরা সাধারণ সংসারী জীব। ষড় রিপুর আন্দোলনে আমাদের মন বিক্ষুব্ধ। আমার মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল আপনি ওকে ছাড়বেন কিনা! না ছাড়লে হয়তো যুদ্ধ বিগ্রহ করতে হতে পারত। বুঝতাম আপনি অসাধু, মোহগ্রস্ত। জোহান পীরের নির্দেশ অমান্য করছেন।'

হাসলেন ইলাহি পীর। বললেন, 'আপনি তো জানেন না, মাজারে মানুষ হলেও বেদৌরা ঠিক দীক্ষা পায়নি বা মুরীদ হয়নি। চল্লিশ বছর বয়স হবার পর দীক্ষা দেওয়া হয়। আর পুরুষদের শরীর থেকে কামশক্তি হরণ করে নেওয়া হয় কোনো এক বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা। আপনার মতো একজন অতিথির আগমন প্রতীক্ষায় ছিলাম। তাই ওর ঘরে যাবার আপনার কোনো বাধা নিষেধ ছিল না। আপনার সাহচর্যে ওর নারীভাব জাগ্রত হোক এবং ও সংসারজীবনে ফিরে যাক—এই ছিল মাজারের পবিত্রতা

রক্ষার জন্য নির্দেশ। যান, আপনি ওর ঘরে, আহারাদির পর বিশ্রাম করুন।'

'ওর পিতা বণিক হেদায়তউল্লাহ্ খুবই মহৎ উদার এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি। বসরা নগরে তাঁর মণিমাণিক্য এবং দামী বস্ত্রের দোকান আছে। এককালে তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তাঁর ছোট দোকানটিতে মেয়েটি বসে থাকত। বাজারে ঘুরে বেড়াত। সবাই আদর করত।'

'তা তো হবেই, উত্তম ফসলের বীজ দেখলেই চেনা যায়। নিজের কন্যা বলে যে ভক্তটি মাজারের খেদমতের জন্য ওকে দিয়ে গিয়েছিল পীরের অভিশম্পাতে সেই মিথ্যাবাদীর পথিমধ্যে উদরাময় রোগে মৃত্যু ঘটেছে।'

'আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে হুজুর মেহেরবানের কাছে।'

'বলুন, নিঃসঙ্কোচেই বলতে পারেন।'

'বেদৌরা কি নিষ্পাপ, সতী-সাধ্বী আছে ?'

ইলাহি পীর ক্রুদ্ধ হলেন। উঠে এসে ফরিদের কাঁধে ঝাঁকানি দিলেন। চোখে তাঁর আগুন জ্বলছে। সহসা তিনি ফরিদের তলোয়ারখানা টেনে বার করে নিয়ে বললেন, 'ধরুন এটা।'

ফরিদ সেটা আকাশে উঁচু করে ধরল। ইলাহি পীর তলোয়ারটিতে ফুঁ দিতেই সেটা মাথা থেকে জ্বলতে জ্বলতে নামতে লাগল।

তিনি বলতে লাগলেন, 'যদি আল্লার বিশ্বাস আপনার নিঃসন্দেহে না হয়, যদি দুধ, আপেল, মধু ইত্যাদির প্রাকৃতিক রস আল্লার করুণায় অকৃত্রিম না হয়, যদি হৃদয়ের শব্দ প্রতি নিয়ত আল্লাকে ডাকার ধ্বনি বলে বিশ্বাস না করেন, যদি মেঘ থেকে বিশ্বের ফসলের জন্য বৃষ্টিরূপ করুণাতেও আপনাদের চেতনা না আসে—তবে হে যুবক, আপনি এই তলোয়ার ধরে থাকুন আর পুড়ে মরুন। আমরা মিথ্যা কথা বললে এই আগুন জ্বালাতে পারতাম না। যাতে আমরা ফুঁ দেব তাতেই আগুন ধরে যাবে। আমি বলছি, বেদৌরা

নিষ্পাপ, চিরকুমারী। আমার নির্দেশ, আপনি তাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করুন।'

আগুন জ্বলতে জ্বলতে নামছিল। কাছে এসে পড়েছিল ফরিদের। সে ভয় পেল, বিহ্বল হল! কিন্তু তলোয়ারটিকে ফেলে দিতে চেষ্টা করেও পারল না। বলল, 'দোহাই আল্লার, দোহাই রসুলের, আমি বিশ্বাস করি। পবিত্রতাই টিকে থাকে, এবং তা আছেও। আপনাদের মতো মহান উদার সিদ্ধবাক পীরের ক্ষণিক সাহচর্যও জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আমার জীবন আপনি রক্ষা করুন। আমি বেদৌরাকে গ্রহণ করলাম।'

তখন ইলাহি পীর খুশী হয়ে হাসলেন। এবং তলোয়ারটি নিয়ে বালির মধ্যে গুঁজে দিতেই নীলাভ তেজস্বী আগুনটি নিভে গেল।

ফরিদ তাঁর কদমবুসী করল।

পীর ইলাহি তাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'চলো ভাই, আমরা সবাই পীরভাই, তোমাকে বেদৌরার ঘরে পৌঁছে দিই। বেটি আমার, কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর আজ যখন তুমি এলে ঠিক তখনই বোধহয় ক্লান্ত অবসন্ন মনে ধ্যানমগ্ন হয়ে অশ্রুপাত করছে।'

দুজনে হাত ধরাধরি করে বেদৌরার কামরার দোর গোড়ায় এসে হাজির হতে শোনা গেল ভেতর থেকে গুনগুন করে পবিত্র কোর-আন পাঠের ধ্বনি।

দুয়ার ঠেলতেই খুলে গেল।

ইলাহি পীর বললেন, 'মা, দেখ, ফরিদ ভাই এসেছে শুভ সংবাদ নিয়ে। কাঁদছ কেন মা? তোমাকে তো কখনো কাঁদতে দেখিনি!'

বেদৌরা উঠে এসে ইলাহি পীরের বুকে মাথা গুঁজল। বলল, 'আমি কেবলই প্রার্থনা করেছি যেন কোনো অশুভ সংবাদ না আসে, যেন পথিক পথ না হারায়। যেন সে বিপদে না পড়ে।'

'তোমার মঙ্গল হোক মা। ফরিদ একজন বিশ্বাসী ভক্ত। তার হাতে তোমাকে সমর্পণ করলাম। এখন থেকে তোমরা

সংসারী। মাজারের সমস্ত আরোপিত শর্ত তোমার ওপর থেকে তুলে নেওয়া হল পীর জোহান সাহেবের ইচ্ছায়।'

ফরিদের হাতে হাত সমর্পণ করেছেন বেদৌরার। তার প্রত্যর্পিত হাত অন্তরের জান্তব চেতনায় কাঁপছে তখন থর থর করে। তুজনের চোখে অপূর্ব এক মাধুরী-ভরা হাসি। তুজনেই ইলাহি পীরকে কদমবুসী করে উঠে দাঁড়াতে তিনি কন্যার অভিমত এবং পরে ফরিদের মতামত নিয়ে পবিত্র কোরআন থেকে কলেমা পাঠ করার পর সাদী দিয়ে দিলেন।

ইলাহি পীর চলে-গেলেন।

তুজনে তুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বেদৌরা ফরিদের তুটো ভুরু, তুটো ঠোঁট, তুটো চোখ দেখল আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে। মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগল। জামার বোতাম খুলে দিতে দিতে বলল, 'কত কষ্ট করেছ তুমি! কত আগুনের ঝড় ভেঙে রাজপুত্র তুমি ছুটে গেছ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে। এখন তুমি গোসল করো, পানি তুলে রেখেছি পাতকুয়া থেকে। চলো, তোমার শরীর থেকে ধুলো ময়লা সাফ করে দিই।'

পাথব বাঁধানো একটি কামরার মধ্যে গোসলখানা। জামাকাপড় খুলে দিল বেদৌরা। কিন্তু কিছুতেই নগ্ন হতে পারল না ফরিদ। হাসল বেদৌরা। স্নান করাল সে নিজের হাতে অপূর্ব দর্শন পুরুষকে।

তারপর ঘরে এনে আহার্য দিল। হালুয়া, রুটি, খেজুর, বেদানা, আপেল, তুধ আর জলপাইয়ের আচার—আরো কত কি।

ফরিদের খুব ঘুম পাচ্ছিল। বসতে পারছিল না। বেদৌরা তা বুঝতে পেরে ওর মাথাটা কোল পেতে আদর করে তুলে নিয়ে গালে খাইয়ে দিতে লাগল। ফরিদ খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। কয়েকবার বেদৌরা তাকে, 'এই, খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি—তারপর আমার বুকে মাথা রেখে ঘুমোবে'—বলে নাড়া দিয়ে সচেতন করবার চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। এবার সে হাল ছেড়ে

দিয়ে ফরিদের মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। ভাবতে লাগল। এই পুরুষ পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোথায় এতদিন ছিল কে জানত। কৌমার্যের তপস্যা তার সফল হয়েছে। তার পিতা-মাতার খোঁজ নিতে গিয়েছিল এই বীর যুবক কত মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত পাড়ি দিয়ে। ক্ষুধায় পিপাসায় ক্লান্ত হয়েছে। হয়তো কত বিপদ-বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। তবু আবার তার বুকে ফিরে এসেছে। কি অপূর্ব আর দীর্ঘ ওর চোখের ভুরু। কি চমৎকার নাকের গঠন। ঠোঁট দুটি কি সুন্দর নরম আর রক্তাভ। বক্ষপট বিশাল এবং সুগঠিত। এই পুরুষই তার নারীদেহের যৌবন-ক্ষুধাকে জাগ্রত করেছিল ন্যায়-অন্যায়ের চিন্তাকে তুচ্ছ করে দিয়ে।—দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেদৌরা। ভাবান্তর কাটিয়ে সে আস্তে আস্তে ফরিদের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে ওড়নাটা বেঁধে নিয়ে হেঁট হয়ে পড়ে ওর কাঁধ এবং হাঁটুর নিচে হাত গলিয়ে টেনে তুলবার চেষ্টা করল। প্রথমে পারল না। হেসে ফেলল সে। নিজের অক্ষমতায় লজ্জা পেয়ে গেল। তারপর পীরের নাম করে তুলতেই সে সহজে তুলতে পারল। ফরিদের ঘুম ভেঙে গেল। সে ওর কণ্ঠ বেড়ে ধরতেই বেদৌরা চুম্বন করল একটা চকিতে।

'প্রিয়া, আমার প্রিয়তমা, বেদৌরা!' আলতো ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলতে বলতে আবার ঘুমিয়ে গেল ফরিদ।

দোর বন্ধ করে দিয়ে এলো বেদৌরা। বিছানায় উঠে এসে ফরিদের পা টিপে দিতে থাকলে একটা স্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। বলল, 'কেবলই আমার ঘুম পাচ্ছে কেন বলো তো?' হাত ধরে বেদৌরাকে বুকের ওপরে টেনে আনল ফরিদ। তার মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগল। চুম্বন করতে লাগল পাগলের মতো। বেদৌরা হাসতে লাগল। কি রকম কাতুকুতু পায় যেন তার শরীরে হাত দিলে। বলল, 'বলো না আমার মা-বাবার কথা। পথে কত কষ্ট পেলে, কি কি ঘটনা ঘটল, সব বলো।'

ফরিদ প্রদীপের আলোয় বেদৌরার মুখখানার দিকে তাকিয়ে থেকে সমস্ত কাহিনী বলতে লাগল। তার আগের জীবনের কথা। দিল্লীর রাজবাড়ির কথা, তার মায়ের কথা। বাদশা জাহাঙ্গীরের কথা, খুরমের কথা। পীরচেঙ্গি, নীলোফার, মায়াকাননের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের কথা। লোহিতবর্ণ মসজিদের কথা। সুড়ঙ্গ প্রাচীরের মধ্যে সারারাত ঠায় দাঁড়িয়ে পবিত্র কোরআন পাঠ করার কথা। পীরচেঙ্গির মৃত্যুর কথা। নীলোফারের সঙ্গে সাদি, মায়াকানন ভেঙে দেওয়া, তারপর নিয়াজীর সরাইখানায় আশ্রয় গ্রহণ, আসমার রোগমুক্তি, খুরমের ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, আসমার ওপরে ঈর্ষা করে নীলোফারের গোপনে হজে চলে আসা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাটা শরীর জোড়া দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা, তারপর ভারতবর্ষ ত্যাগ করে আরবে হজ করতে আসা, মক্কা-মদিনার পথে জেলা-শাসক কবি গওস্সুল আনামের গৃহে সারাকে দেখে নীলোফার ভাবা, পরে আসল নীলোফারের সঙ্গে মিলন, জাদুকর জিতেন্দ্রর কীর্তিকলাপ, মিশরের পিরামিডে বন্দিনী নীলোফারের মৃত্যু, প্রেতাত্মাদের উদ্ধার। রত্ন সংগ্রহ, সারার জীবনের সমস্যা, পরে বেদৌরার সংগে সাক্ষাৎ—সমস্ত কাহিনী শেষ করতে ভোর হয়ে গেল ফরিদের। বেদৌরার বাপ মাকে কি রকম দেখতে, বসবার বিবরণ।—সবই বলল ফরিদ। শেষে বলল, 'তুমি ঘোড়ায় চড়া জানো বেদৌরা?'

'জানি। যুদ্ধ করাও শিখেছি। আমি তো পুরুষ হয়েই ছিলাম এতদিন। তোমার হাত ধরে যখন এই মাজারে আনি, যখন নাদ গানের মুজ্‌রো চলছিল, তুমি কি আমাকে নারী বলে বুঝতে পেরেছিলে?'

'না। তবে চোখ মুখের কমনীয়তা, হাতের পেলব মসৃণতা, কণ্ঠস্বরের মোলায়েম মিহিধ্বনি আমার মনে কৌতুক এবং কৌতূহল এনেছিল। ভেবেছিলাম ইনি বোধহয় মেয়েলী ভাবের পুরুষ!'

'তারপর?'

'তারপর তো তোমার বাসায় এনে যখন প্রায় বিবসনা হয়ে দাঁড়ালে আমি তো…'

'আশমান থেকে পড়লাম—হি হি হি…'

'যাকগে, শোনো কখন আমরা বেরোব?'

'সকালেই চলো আমরা বেরিয়ে যাই। আহা, আমার এই ঘরের কি হবে! ওই দ্রাক্ষাকুঞ্জ, খর্জুরবীথি। ঐ চেরিগাছ, জোহান পীরের মাজার, ঐ মরুভূমি, আকাশ এসব ভুলব কেমন করে?'

'মেয়েরা যখন শ্বশুরবাড়ি যায় সেইজন্যই কাঁদে, পরিবেশ ত্যাগ করার মধ্যে একটা বিরহ আছে। পাছপালাগুলোও তোমার মনের আয়নায় চিরকাল তার পটভূমি সমেত ছবি হয়ে ভাসতে থাকবে। তবু এসব তোমাকে ত্যাগ করে যেতে হবে। বৃহতের টান আছে তোমার। বাবা-মা তোমাকে ডাকছেন।'

'হ্যাঁ, আমি যাব, এসবের মায়া ত্যাগ করব। শুধু একটা জিনিস আমি নেব, সেটা তোমাকে দেখাব না।'

'কি জিনিস?'

'না, আমি দেখাব না।'

'আমাকে দেখাবে না এমন জিনিস কি তোমার থাকতে পারে?'

বেদৌরা মিটিমিটি হাসতে হাসতে লজ্জায় নখ খুঁটতে লাগল আর বারবার ফরিদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বলল, 'সে পরে বলব।'

'ধ্যেত্তেরি, পরে আর সময় নেই! সকাল হয়ে গেছে। আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে. এই মাজারে আর থাকতে নেই। এখানে দৈহিক মিলন হওয়া অনুচিত, যদি তুমি আমি উত্তেজিত হয়ে যাই…ঠিক আছে, আপত্তি যখন, পরে বলো। আমি একবার সারার কাছে যাই, আমার ওখান থেকে বিদায় নেওয়া উচিত।'

'না, যাবে না, সারা তোমাকে আসতে দেবে না।'

'না। শাহ পারভেজের সংগে তার সাদি হবে, তবে সে হয়তো

আমাকেই চাইবে। আমি চাইব না। সে বড় নীলোফারকে মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া সেখানে না গেলে আবার আমাকে বসরা ত্যাগ করে এখানে ফিরে আসতে হবে, কেননা মণি-মাণিক্যগুলো ওখানে আছে একটি পাতালপুরীর মধ্যে—সেগুলো নিয়ে যেতে হবে।'

বেদৌরা বলল, 'তাহলে যাও, কিন্তু শীগগিরী চলে আসা চাই।'

মুখ হাত ধুয়ে কিছু নাস্তা করে নেবার পর ঘোড়ায় উঠল ফরিদ।

পীর ইলাহি এগিয়ে এসে একখানা নক্সাদার রুপোর খাপঅলা তরবারী উপহার দিলেন। তাঁকে সালাম জানিয়ে বেদৌরার দিকে হাত তুলে বিদায় নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ফরিদ।

ঘণ্টাখানেক পরে গন্তব্যস্থলে এসে হাজির হল সে। কবি গওস্থল আনাম বেরিয়ে এলেন। কয়েকদিনে তিনি যেন ন্যুব্জ হয়ে গেছেন। বললেন, 'সারার সাদি হয়ে গেছে বাবা। শাহ পারভেজ সহসা একদিন এলেন বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে। উৎসব আনন্দ হল। তোমার খোঁজ পেলাম না।'

'ঠিক আছে। ভালই হয়েছে। চাবিটা দিন—পাতাল-ঘর থেকে আমার ধনরত্নের বাক্সটা আজ বার করে নিয়ে যাব। আমি বসরায় যাচ্ছি ওগুলো বিক্রি করবার জন্যে।'

কবি একহাতে অশ্রু মুছলেন নিজের চোখ থেকে। চাবিটা দিলেন। বললেন, 'তোমরা সবাই চলে যাবে! একটা ভুল আমি করেছি—সারার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে তোমাদের দুজনকে এখানে হয়তো রাখতে পারতাম। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস! ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে পারশ্যরাজ শাহ আব্বাসকে আমি বা আমার দুর্বল বাদশা ঠেকাতাম কি করে?'

'সারার কাছে আমি যাব যখন নীলোফারের জন্য খুব মন খারাপ করবে আমার। আচ্ছা, আমি দেখছি ধনরত্নগুলো—আপনি বিশ্রাম করুন।'

চাবি খুলে বাক্সটা যথাস্থানেই পেল ফরিদ। দেখল, সেখানে একটা চিঠি পড়ে আছে।

'তুলাভাই, আমাকে মনে রেখো। তোমাকে আমি ভুলব কেমন করে? তোমার জন্যে সারা জীবন আমি কাঁদব। পায়ে ধরি তোমার, আমার সঙ্গে দেখা করো। ইতি—সারা।'

খানিকটা সময় বিহবল হল ফরিদ। মোমের আলোয় পাতাল-পুরীর গরমে সে যেন হাঁপিয়ে উঠল। বাক্সটা খুলে ফেলল। ভয় ছিল তার, হয়তো সে কিছুই দেখতে পাবে না। হয়তো তার শ্বশুরের ওপরে অশ্রাব্য কিছু বলতে হবে। হয়তো সারার হটকারিতার জন্য তার স্বামী শাহ পারভেজকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু না, সারা তাকে সত্যিই ভালবেসেছিল, নইলে রাজকুমারকে এই ধনরত্নের সন্ধান দিতই সে।

রত্নগুলি ঠিক আছে। বাক্সটা বার করে নিয়ে এলো। বসরায় কেমন করে রত্নগুলো নিয়ে যাবে সে বিষয়ে তার শ্বশুরের উপদেশ চাইল। পরিশেষে বেদৌরার কাহিনীও সে আত্মপান্ত বলে দিল।

কবি বললেন, 'জেলা শাসক হিসাবে আমি সেই কন্যাকে জানি। জোহান পীরের উরসে গিয়ে তার নাদ গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি। মেয়েটিকে মনে হত বোধহয় বেহেস্তের কোনো হুর। আশ্চর্য ক্ষমতা তার। চমৎকার একটি কাব্য-পুস্তক রচনা করেছে সে—যার তাবৎ ভাষা, কাহিনী, সবই মনে হয় নৈসর্গিক। আমাদের দেশে এই ধরণের কাব্য-সাহিত্যের নজির নেই। তা যখন শুনি মনে হয় প্রতীক্ষিত মরুভূমিতে যেন মুষলধারায় বর্ষণ হচ্ছে। এই ব্যাপারটা কি তুমি জানো?'

'কই না তো! তবে কি একটা যেন লুকোতে চাইছে যা সে এখান থেকে নিয়ে যেতে চায়।'

'ঐ গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি!—এই রত্নগুলি নিলে ঘোড়ায় করে মাত্র তুজনেই বা যাবে কি করে? হাওদাঅলা উট নেওয়া ছাড়া তো গতি দেখছি না।'

ফরিদ ভাবতে লাগল। এতদূর পথ। ঘোড়া ছুটতে পারে, উটও পারে কিন্তু যদি যুদ্ধ বিগ্রহ বাধে, যদি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়?

যাই হোক, ইলাহি পীর যা বিধান দেন তাই হবে ভেবে রত্নের বাক্সটা নিয়ে রওনা দিল ফরিদ। কদমবুসী করল তার শ্বশুরকে। তিনি সাশ্রুনয়নে পথ পানে তাকিয়ে রইলেন।

ঘোড়াটি রেখে গেল ফরিদ। ঘোড়ার গাড়িতে উঠল। মাজারে এসে বেদৌরার ঘরে ঢুকে বাক্সটা নামিয়ে রেখেই হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগল। বলল, 'কই, তোমার সেই পাণ্ডুলিপি?'

'এই এই, কে বললে, কে বললে!'

'আরবের সব চাইতে নামজাদা কবি গওসুল আনাম সাহেব বলেছেন, তুমি নাকি অসাধারণ ভাল কবিতা লিখতে পারো। কাব্যপুস্তক রচনা করেছ? তুমি পৃথিবীকে জানো না, কেমন করে কাব্যপুস্তক লিখবে?'

হি হি করে হাসতে লাগল বেদৌরা। তার চোখ থেকে আনন্দে জল বেরিয়ে গেল।

কাপড়ের পুটুলি খুলে পাৎলা মসৃণ হরিণের চামড়ায় সোনার কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো বার করে দিল বেদৌরা।

পড়তে শুরু করল ফরিদ।

বেদুইনের বাঁশি শুনে
ক্লান্ত উট তন্দ্রাচ্ছন্ন যখন,
পরী নেমে এলো আশমান থেকে,
সাদা পালকের মতো নরম তার শরীর,
গায়ে তার হলুদ লাল নীল মেঘের গুঁড়ো,
হাতে তার সাদা গোলাপের মালা,
বলল সে মুক্তাপাঁতির মতো
শুভ্র দাঁতের মিষ্টিহাসি মাখিয়ে,
কে তুমি বেদুইন প্রেমিক,
তোমার বাঁশির সুর পৌঁছেছে পরীদের রাজ্যে
আর তাদের ভাঙিয়ে দিয়েছে ঘুম
কিন্তু আমিই তোমার সন্ধান পেলাম।

কেন না শ্বেতপাথর ক্ষয়ে গেছে আমার প্রার্থনায়,
আমি নিষ্পাপ শিশুর মতো,
শিশির ধোয়া গোলাপ অথবা যুঁইয়ের মতো,
তোমায় আমি চাই
কিন্তু তোমার উটের বোঝা
আমি বইব কেমন করে?'

ফরিদ মুগ্ধ হল বেদৌরার বাণী ছন্দ ইত্যাদি দেখে। সে চমৎকার ছবিও আঁকতে পারে।

বলল, 'বেদৌরা, তুমি কবি, তুমি গায়িকা, তুমি জ্ঞানী, তুমি সমৃদ্ধ, তুমি নিষ্পাপ, তুমি সুন্দরী, তুমি অনন্যা—'

'থাক হয়েছে। দেখি, তোমার বাক্সের মধ্যে কি আছে।'

'ঐ ধনরত্নগুলো দিয়ে আমি তোমার এই কাব্যগ্রন্থটি কিনে নিলাম।'

'দেখি তোমার ধনরত্ন।'

ফরিদ রত্নগুলি দেখাল। বেদৌরা স্থির চোখে সেগুলো দেখল।

ফরিদ তাড়াতাড়ি সেসব বন্ধ করে ফেলল পীর ইলাহির আগমনের আন্দাজ পেয়ে।

পীর ইলাহি এলেন এবং বললেন, 'তোমাদের এখন এই মাজার ত্যাগ করার সময় উপস্থিত। উটের পিঠে বৃদ্ধ দাড়িঅলা পীরবেশে যাবে বেদৌরা। ফরিদ যাবে ঘোড়ায়। সঙ্গে আরো পাঁচটি উটে যাবে মাজারের পাঁচজন সেবক। সংবাদ হল, বসরায় যাচ্ছেন পীর ইলাহির দৌত্য করতে তাঁর সেবক-বন্ধুরা। সবই তৈরি আছে। এখনি সবাই রওনা হয়ে যাও।'

বেদৌরাকে বৃদ্ধ পীর সাজানো হল। সে একটুও হাসল না। হাওদায় উঠে গেল। পাণ্ডুলিপি আর রত্নের বাক্স রইল তার কাছে। অস্ত্রহাতে পাঁচজন সেবক উটের পিঠে উঠে বসল। ঘোড়ায় চাপল ফরিদ। জোহান পীরের মাজার তিনবার প্রদক্ষিণ করার পর তাদের কাফেলা রওনা হয়ে গেল।

॥ সাতাশ ॥

—বেদৌরা পুরুষ বেশে থাকলেও কখনো যে তাকে এমন দাড়িঅলা বুড়ো লোক হতে হবে তা ভাবে নি। যদি নারী বেশে থাকে তাহলে পথিমধ্যে বেদুইন দস্যুরা তাকে লুঠ করে নিয়ে পালাবে। মেয়ে-মানুষের ওপরে পুরুষদের এত লোভ কেন? কেন, কিসের লোভে অনেকখানি উপলব্ধি করতে পারলেও এখনো সঠিক বোঝে না বেদৌরা। মাজারের পবিত্রতা রক্ষার জন্য যৌনাচার নিষিদ্ধ বলে ফরিদ অথবা বেদৌরা দারুণ উত্তেজনায় অধীর হলেও দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয় নি। এটা করলেই নাকি পীর ইলাহির শরীর জ্বালা করতে থাকবে। মাজারে বাহুপীরের সময়ে একবার ঐ রকম ঘটনা ঘটিয়েছিল কোনো এক দম্পতি। তারা নিষেধ মানে নি বলে মাজার থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়।

বেদৌরা বলেছে, 'আমাদের এ বিয়ে তো সামাজিক বিয়ে নয়, এটা সম্প্রদান মাত্র। তবে এর কোনো হেরফের হবে না। মা-বাবাকে আমি বলব। বসরায় আমাদের সামাজিক বিয়ে হবার পর আমরা মিলিত হব। তাছাড়া প্রতীক্ষাই হল প্রেমের ক্ষেত্রভূমি।'

ঢেউ তোলা। মরুভূমি পার হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে ফরিদদের কাফেলা। উটের পিঠের হাওদার মধ্যে বসে সামনের পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছে বেদৌরা। কাছাকাছি ঘোড়ার পিঠে চলেছে ফরিদ। তিনজন উট-চালক সামনে আর দুজন পিছনে। দুপুরের মরুভূমি ভীষণ মূর্তি ধরেছে। পাক খেয়ে খেয়ে শুকনো বাতাস ছুটে চলেছে। নিঃশ্বাস ফেলা যায় না। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিম্নভূমিতে নামার পর একটা মরুদ্যান পাওয়া গেল। সেখানে

তাঁবু গেড়েছে একদল যাত্রী। তারা কুয়ো থেকে জল তুলছে, আগুন জ্বেলে রান্না করছে। মাংস রান্না হচ্ছে, তার সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। ফরিদ সেখানে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিল।

তাঁবু খাটানো হল একটাই।

বৃদ্ধ পীর সাহেব বসলেন, তাঁকে সবাই কুর্ণিশ করতে লাগল।

ফরিদ বলল, 'মেহেরবান, এখন খানাপিনার ব্যবস্থা করা হোক।'

বেদৌরা দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভারীক্কি চালে বলল, 'আল্লা যদি কোনো আহার্য মেলান তবে সবাই তা সমান ভাবে বখরা করে খেতে পারো।'

মদিনার বিখ্যাত পীর আলি আল্ আহ্রাম সাহেবের জন্য অন্য তাঁবুগুলি থেকে নজরানা এসে হাজির হল। পুবদেশ যাত্রী মিশরের বণিক আবদেল খাদেম নিজে এসে ময়ূর পাখার বাতাস দিতে লাগলেন পীরসাহেব-রূপী বেদৌরাকে। শুধোলেন, 'হুজুর নামদার, পীর সাহেবের গন্তব্য স্থান কোথায় অধম জানতে পারে কি?'

বেদৌরা বলল, 'বসরা নগরী।'

'হুজুরের কণ্ঠধ্বনি বীণার বাজনার মতো! কী অপূর্ব! কী মধুর! হুজুর কি কোনো 'মাজেজা' দেখাতে পারেন?'

অনেক অনুচর সান্ত্রী-সঙ্গীরাও এসে হাজির হল বণিকটির। তারা যেন খুব মজা দেখতে এসেছে। ফরিদ বুঝতে পারল এরা সবাই ব্যঙ্গ করছে। আর শেষ পর্যন্ত হয়তো অপমানও করতে পারে। এরা সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশজন হবে। অনেক উট আর ঘোড়া, ভেড়া, হাঁড়ি-পাতিল, তাঁবু, অস্ত্রাদি সঙ্গে আছে। কে জানে এরা বণিক-সম্প্রদায় কিনা! যদি তা না হয় তবে মহা বিপদ হবে। বেদৌরাকে হারাতে হবে। ধনরত্নগুলিও লুঠ হয়ে যাবে। বেদৌরা কি বাক্ চাতুরীর দ্বারা নিজেকে বাঁচাতে পারবে, না ধরা পড়ে যাবে?

বেদৌরা বলল, 'মাজেজা বা অলৌকিকতা না দেখাতে পারলে বুঝি আপনাদের ধর্মে ভক্তি আসে না ?'

ফরিদ বলল, 'ইসলাম ধর্মে মাজেজা-পন্থী যারা তারা কি শরিয়ত বিরোধী ভাববাদী সুফী সম্প্রদায়ের লোক নয় ?'

'আমরা অতশত বুঝি না, পীর হলেই তাঁর কিছু না কিছু অসাধারণ ক্ষমতা থাকে। আপনাদের পীরের এমন সুন্দর দাড়ি। এমন সুন্দর নাক, চোখ, ঠোঁট—ভেতরে যেন একটা কাঁচা কচি বয়সের তরুণী লুকিয়ে আছে…'

'তোবা তোবা!' বলে উঠল মাজারের একটি সেবক।

ফরিদ বলল, 'সেইটিই তো একটা মাজেজা। ওঁর বয়স ধরা যায় না।'

বণিক বলল, 'বহুৎ খুব!'

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঁর বয়স ধরা যায় না।' 'মারহাবা। মারহাবা! 'হাওদার ভেতর ঐ রুপোর বাক্সটার মধ্যে কি আছে আমাদের একটু দেখাবেন ?' ওর ভেতরেই ঠিক মাজেজা আছে।'

'খবরদার!' ফরিদ এগিয়ে এসে তলোয়ার টেনে বার করতে গেল।

লোক কজন সরে গেল ভয়ে।

একজন বলল, 'এরা ঠিক ছদ্মদেশী ডাকাতদল। পীর সাহেবের দাড়ি ছিঁড়ে ফেলা হোক।'

ফরিদ লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে পড়ল। তলোয়ার ঘুরিয়ে হেঁকে বলল, 'এরা সব মন্দ লোক। মহৎজনের সম্মান দিতে জানে না। এদের মুণ্ড উড়িয়ে দাও।' বলেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে লোকগুলিকে আক্রমণ করল। ঘোড়াটি দারুণ তেজি, উঁচু আর শিক্ষিত। তার পেটে পা মারলেই দারুণ জোরে চাট মারে। পা ছুঁড়ে মেরে পাঁচ-সাতজনকে ছিটকে ফেলে দিল। লাফিয়ে চিঁহি চিঁহি করে অনেককেই ছত্রভঙ্গ করে দিল। সেবক পাঁচজন সেই ফাঁকে উটের পিঠে উঠে পড়েছে।

বেদৌরা দাঁড়িয়ে উঠেছে। তার পা আর হাত দুটোর দিকে লক্ষ্য পড়ল বণিক সরদারের। সন্দেহ হল। না, এ পীর নয়। মেয়েলোক! তাই মজা পেলেন। বললেন, 'ভাইসব, খামোস! লড়াই করে কি লাভ! ওই মরুদ্যানে চলো, সবাই সুরাপান করি। রাতটা আমরা সবাই এখানে মিলেমিশে থাকব।'

ফরিদ ঘোড়া নিয়ে বণিকটির সামনে এসে বলল, 'তোমাদের পাপমন সন্দেহ পরায়ণ। তোমাদের বিশ্বাস করা কঠিন।'

'তাহলে যুদ্ধ চান?' বাণকটি ক্রুদ্ধচোখে শুধোলেন।

'আপনারা এই পীর সাহেবকে যদি অপমানজনক কথা বলেন তাহলে যুদ্ধ এবং জীবনদানই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হবে।'

বণিক বললেন, 'না, আমরা অপমানজনক কথা আর কেউই বলব না যদি উনি অধমদের কিছু মাজেজা দেখাতে পারেন।'

বেদৌরা হঠাৎ বলল, 'মাজেজা দেখতে চান আপনারা?'

'হ্যাঁ চাই।'

সবাই আবার এক জায়গায় জড়ো হল। খেজুরকুঞ্জের বাইরে বিকেলের মরুভূমি তখনো আগুন ওগরাচ্ছে। কিছু লোক তাদের তাঁবু থেকে অস্ত্রপাতি হাতে নিয়ে এসেছে।

বেদৌরা বলল, 'যদি এই মাজেজা আপনাদের দেখাই যে আপনাদের সমস্ত তাঁবুগুলোতে হু হু করে আগুন ধরে গেল আর আপনারাও অগ্নিদগ্ধ হয়ে ছটকাতে লাগলেন তাহলে কেমন হবে?'

'বেশ তো—সেই মাজেজাই দেখান।' বলল বণিকের একটি চেহারাঅলা কালো হাবসী পালোয়ান। সেও কিন্তু ফরিদের ঘোড়ার চাট খেয়ে তিনটে গড়াগড়ি দিয়ে ধুলো মেখে এখন একটা লাঠি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

'সন্ধ্যার পর এই মাজেজা দেখলে হয় না?' শুধোলে বেদৌরা হাসি মুখে।

ফরিদ বিস্ময়াভিভূত। সত্যিই কি ও মাজেজা দেখাতে পারবে? হে আল্লা এই নিরপরাধ সতীসাধ্বী মেয়ের ইজ্জৎ রক্ষা করো!

'না, আমরা এখনি দেখতে চাই।'

'তাহলে আপনারা আপনাদের তাঁবুর মধ্যে ফিরে যান আর আমার লোকজনরা আমাদের তাঁবুর মধ্যে ফিরে আসুক।' তেজস্বিনী বেদৌরার কণ্ঠধ্বনি সবাইকে যেন বাধ্য করল তার কথা শুনতে।

ওরা সবাই চলে গেল।

বণিকটি যাবার আগে বাঁকা হাসি হেসে এক চোখ দেখিয়ে গেলেন বেদৌরাকে।

ফরিদের ইচ্ছে করল এক তলোয়ার মেরে ওঁর মুণ্ডুটাকে উড়িয়ে দেয়। গালাগালি করল বিড়বিড় করে।

বেদৌরা বলল, 'তুমি শান্ত হয়ে বসো।—হে আমার জোহান পীরের সেবক দল, এসো আমরা সবাই এখন তাঁর শরণ করি।'

বেদৌরা আর পাঁচজন সেবক নামাজ পড়তে বসে গেল। প্রার্থনার পর বেদৌরা উঠে তাঁবুর বাইরে গেল। আর হাঁক দিয়ে বলল, 'সন্দেহপরায়ণ অবিশ্বাসীরা, তোমরা পুড়ে মরো, তোমাদের তাঁবুতে আগুন লাগুক আর তোমরা জ্বালায় ছটকাতে থাকো।' বলেই বেদৌরা ফুঁ দিতে শুরু করল তাঁবুগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে।

আশ্চার্য ব্যাপার! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল তাঁবু-গুলোর মাথায়!

চিৎকার আরম্ভ হয়ে গেল ঃ

'আগুন! আগুন! পানি ঢালো! পানি কোথায়! জ্বলে গেল! পুড়ে গেল!...'

ফরিদ ছুটে এসে বেদৌরার হাত চেপে ধরল। দেখল তার দুটো চোখে তখন আগুন জ্বলছে। দাড়িটা সে টেনে খুলে ফেলে দিল। ফিরে এসে বলল, 'চলো, আমাদের হাওদা তোল!'

ওরা চটপট তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে উট আর ঘোড়ায় উঠে পড়তেই ওদিকের তাঁবু থেকে লোকজন ছুটে আসতে লাগল।

বণিকটি স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন পীরের দাড়ি নেই। সত্যিই

মেয়েমানুষের মুখ। বললেন, 'হুজুর, আপনি মেয়ে বা পুরুষ যেই হোন, আমাদের বাঁচান, আমাদের সর্বস্ব গেল, শরীর জ্বলে পুড়ে গেল, আমাদের বাঁচান।'

'আল্লাকে ডাকুন'—বলে বেদৌরা দ্রুতগতিতে উট চালাতে লাগল। ফরিদও ঘোড়াকে চলতে তালিম দিল।

ওদের তাঁবু জ্বলতে লাগল আর বেদৌরার কাফেলা চলতে লাগল। দুর মরুভূমি পার হবার পর সন্ধ্যা ঘনাল।

জ্যোৎস্না রাত দেখে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল। তারপর ক্লান্ত হয়ে সবাই তাঁবু গাড়ল ছোট্ট একটা নির্জন মরুদ্যানের মধ্যে। বেদৌরা নাদ গান গাইতে শুরু করল আরবীতে। সঙ্গের সেবকরা তার ধুয়ো ধরল।

রাত পার হবার পর আবার তাদের কাফেলা চলতে লাগল।

বড় বড় পাথর ছড়ানো দুর্গম পথ। দুপুর পার হয়ে সূর্য অস্তা-চলে নেমে গেল। দীর্ঘতর উটের ছায়া বিলীন হয়ে গেল।

বিকেল ভর আর কথা বলেনি ফরিদ। কখনো এগিয়েছে, কখনো বা পিছিয়ে গেছে বেদৌরার কাছ থেকে। নিজেকে যেন অকিঞ্চিৎকর, আর অতপস্বী মনে হয়েছে তার। বেদৌরার চোখের ওপরে চোখ রাখা যায় না। আগে কুসুমকোমল সহজ শিশুভাবের দৃষ্টি মেলে তাকাত আর হাসত বেদৌরা! এখন তার চোখে তীক্ষ্ণতা। স্থির দৃষ্টি যেন বুকের ভেতরটাকে দেখতে পায়। তীব্র অনুসন্ধানী আলোয় খরগোসের মতো হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। সর্ব পাপ, গ্লানি এই বুঝি তার চোখে পড়ে গেল! কোনো কিছুই লুকোনো যায় না ওর চোখ থেকে। তাহলে কি বেদৌরা সবজান্তা? সে তপস্বিনী। তার ফুৎকারে আগুন বের হয়। তবে আর ভয় কিসের তার? কে তার শত্রুতা করতে পারে? তাহলেই বা ছদ্মবেশ কেন? কিন্তু তপস্বীর একটা বিষয় হল তার ক্রিয়াকলাপ যথাসম্ভব গোপন রাখা—সাধারণ মানুষের গোচর না করা।

বেদৌরা হাজার রত্নের সেরা রত্ন। তাকে পেয়ে যেমন আনন্দ

তেমনি ভয়ও আছে। আবার সাধারণ জীবনের লোভ লালসা, ঈর্ষা, হিংসা ইত্যাদি ষড়রিপুর আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষের ভুলত্রুটিকে সে কেমন চোখে দেখবে? তার অতীত রহস্যময় ব্যবহার সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করছিল ফরিদ।

প্রায় অনিচ্ছাকৃত একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে নিজেদের রক্ষা করেছে বেদৌরা। লোকগুলো কোথায় পড়ে রইল! বেদৌরার কি একটুও মায়া হয় না ওদের জন্যে?

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগেই একটি উপত্যকার মধ্যে কয়েকটি মহীরুহের নিচে তাঁবু গাড়ার নির্দেশ দিল বেদৌরা।

সকলেই মগরেবের নামাজ পড়ল তারা। ইমামতী করল সেবকদের মধ্যে থেকে বয়স্ক একজন লোক।

বেদৌরা বসে বসে একা নামাজ আদায় করল। আহার্য যা ছিল সবাই মিলেমিশে বখরা করে খেল। কিন্তু দেখা গেল জলের পাত্রটি ভুলক্রমে ফেলে রেখে আসা হয়েছে আগের তাঁবু গাড়ার জায়গাতে। তাড়াতাড়ি করে চলে আসার জন্যে হয়তো এটা ঘটে গেছে। বোধহয় সেবকরা সন্ত্রস্ত হয়েছিল অগ্নিদগ্ধ মানুষগুলো যদি ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের আক্রমণ করে!

বেদৌরা বলল, 'এখন কি হবে?'

ফরিদ বলল, 'আমার ভীষণ তেষ্টা। পানি না পেলে আমি মারা যাব। পেছনের পথে আবার ফিরে গিয়ে পানির পাত্রের খোঁজ করাও এখন অসম্ভব! নিকটে কোথাও কুঁয়োও তো দেখছি না।'

'আমরাও খুব পিপাসার্ত।' প্রৌঢ় সেবকটি বলল।

কিন্তু জল পাবার কোনো উপায়ই যখন দেখা গেল না ফরিদ মাথা গুঁজে শুয়ে রইল স্থির হয়ে।

বেদৌরা তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

সেবকরা ছিল অন্য তাঁবুর মধ্যে।

ঘোড়া আর উটগুলোকে গাছ-ডালপাতা ভেঙে দিতে তারা আরাম করে চিবোচ্ছে।

বাঁশি বাজাতে শোনা গেল সেবকদের একজনকে।

ফরিদের মনে হল এ কোথায় সে? কোথায় দিল্লীর দরবার—আর কোথায় এই মরুভূমির পাহাড়ী উপত্যকা!

মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ফরিদের। দেখল বেদৌরা নেই। পাশের বিছানা খালি।

দূরে পুব দিগন্তের কোলে মাথা ভাঙা এক টুকরো চাঁদ উঠেছে। অস্বচ্ছ আলো। দেখল বেদৌরা একাকী দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের নিচে। পরে দেখল আর একজন পুরুষ তার পাশেই রয়েছে। গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য করল ফরিদ—ওরা কি করছে। চিনতে পারল, পুরুষটি হল বেদৌরার যুবক পীরভাই হাসান।

হাসান বলছে, 'পিপাসায় আমরা সকলেই মারা যাব। আমার আর সহ্য হয় না। একটা কথা তোমার মনে পড়ে কি? এই কারবালার ওপরেই যুদ্ধ হয়েছিল যখন কাশেম যুদ্ধক্লান্ত পিপাসার্ত হয়ে তাঁবুতে ফিরলে তাঁর পিতৃব্য ইমাম হোসেন নিজের জিহ্বা চুষতে দিয়েছিলেন। আমিও তোমার কাছে দুটি হাতে ধরে আর্জি করছি, তুমি তোমার জিহ্বাটা আমাকে চুষতে দাও!'

বেদৌরা বলল, 'তোমার মতো আমিও পিপাসার্ত কিন্তু ওতে পিপাসা মিটবে না, বরং অন্য এক পরিস্থিতি হতে পারে যাতে আমরা দুজনেই তাড়াতাড়ি আরো ক্লান্ত হয়ে যেতে পারি।'

'তাহলে বেদৌরা, আমি নির্লজ্জের মতো বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাকে ক্ষমা করো, তুমি প্রস্রাব করো, আমি তাই পান করব।'

বেদৌরা সহসা একটা চড় মারল হাসানের গালে, বলল, 'ধিক, তোমার বেঁচে থাকায়! হারাম জিনিস খেয়ে বাঁচার চাইতে মৃত্যু ভাল। সাধনার পথ থেকে মন তোমার পৈশাচিক ক্ষুন্নি-বৃত্তিতে নেমে এসেছে। ছিঃ, আমি না তোমাদের মা! চলো শুয়ে পড়বে। আল্লা একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন।'

ওরা দুজনে আসার সময় ফরিদকে দেখল।

বেদৌরা বলল, 'পিপাসায় হাসান পাগল হবার উপক্রম।'

ফরিদ বলল, 'আমিও।'

তিনজনে তাঁবুতে ফেরার পর শুয়ে পড়ল।

বেদৌরার একখানা হাত টেনে নিল ফরিদ তার বুকের ওপর।

বেদৌরা অল্পক্ষণ হাতটা রাখল তারপর ওর মুখে মাথায় সেই হাতটা বুলিয়ে দিয়ে সমব্যথায় আদর করে তাকে কাছে টেনে নিল।

সকাল হল। মরুদ্যানের আশায় তারা আবার তাঁবু তুলে নিয়ে উটের পিঠে উঠল।

দুপুর পর্যন্ত আসার পরও কোনো মরুদ্যান না পেয়ে অত্যন্ত ক্লান্ত আর ছাতি-ফাটা পিপাসায় পাগলের মতো তাঁরা দিকচক্রবালহীন ধু ধু মরুভূমির মধ্যে তাঁবু গাড়ল।

ফরিদ আর হাসান প্রথমেই জ্ঞান হারাল। তারপর বাকি কজনও।

বেদৌরা এবার ভীষণ অসহায় বোধ করল। মৃত্যু তারও আসন্ন। সে কাঁদতে লাগল। হাত তুলে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে আল্লা, তুমি আমাদের বাঁচাও। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। তোমার দয়ায় কত সাধক, কত হজরত অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। হে আল্লা, তুমি বিপদের কাণ্ডারী, তুমি যদি এই আগুন ওগ্‌রানো মরুভূমির মধ্যে পানির ধারা না নামাতে পারো তবে আজ আমি তোমার ওপর থেকে বিশ্বাস তুলে নিয়ে কাফের হয়ে মরব। পিপাসার্ত বিবি হাজেরার আর তাঁর শিশুপুত্র হজরত ইসমাইলের প্রাণ রক্ষা করেছিলে তুমি মরুভূমির মাঝখানে হঠাৎ আবে-জমজম কূপের উৎস-ধারা সৃষ্টি করে। তাহলে, তুমি তো জানো, আমি জ্ঞানত কোনো পাপ করি নি। আমার এই আকুল আহ্বানে তুমি সাড়া দাও।...'

বেদৌরা উঠল। একটি তরবারী নিয়ে গিয়ে তাঁবুর বাইরে মরুভূমির বালির মধ্যে পুঁতে দিল। সহসা আশ্চর্য হয়ে সে দেখল পুব আকাশে ঘন কালো মেঘ ছুটে আসছে।

বেদৌরা চিৎকার করে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে আল্লা, তোমায়

আমি বিশ্বাস করি। মানুষ, পশু, পাখি—পৃথিবীর সব কিছুর কল্যাণের জন্যে যুগে যুগে কত না অসম্ভবকে সম্ভব করেছ তুমি।'

প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠল মরুভূমির ওপরে। ধুলো-বালিতে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল। উটগুলো শুয়ে পড়ল। চোখে হাত চাপা দিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল বেদৌরা।

মেঘ ভেসে এলো মাথার ওপরে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাবার সঙ্গে সঙ্গে বেদৌরা দেখল মরুভূমিতে পুঁতে রাখা তলোয়ারটির মাথায় আগুন জ্বলে উঠল আর তার পরেই প্রচণ্ড শব্দ করে বজ্রপাত হল।

সেই বজ্রপাতে তলোয়ার-পোঁতা-জায়গাটি বিদীর্ণ হয়ে গেল আর মাটির অভ্যন্তর থেকে জলের উৎস উঠে উদ্দাম ছন্দে নৃত্য করতে লাগল।

বেদৌরা হতবাক! আল্লা তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। ছুটে গেল সেই জলোচ্ছ্বাসের কাছে। পাত্র ভরে সে জলপান করল প্রথমে। তারপর সেই জল এনে ফরিদের আর অন্যান্য সকলের মুখে মাথায় ছিটিয়ে দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ খুব হালকা ধরনের বৃষ্টি হল কিন্তু তা উবে গেল মরুভূমির ওপরে পড়তে না পড়তেই।

জলের উৎসধারা তখনো সমান বেগে লাফাচ্ছে। মরুভূমির বালি ভিজে যাচ্ছে ক্রমাগত বেশি জায়গার।

ধীরে ধীরে সকলেরই জ্ঞান ফিরল। তারা দেখল তারা বেঁচে আছে আর বাঁচার উপকরণ যে জল তা তাদের সামনে এক অলৌকিক উপায়ে এখন অজস্র পরিমাণে বিদ্যমান।

বেদৌরা ঘটমান কাহিনীটি তার অনুসঙ্গীদের শোনাল। তারা 'খুশীর-নামাজ' পড়ল সকলে।

সুস্থ হবার পর তারা আবার রওনা হল। ইলাহি পীরের নির্দেশানুসারে আবার বেদৌরা বুড়ো পীর সেজে নিল যাতে বেশি

ঝামেলা না বাধে। বিকেলের শেষে একটি বড় মরুদ্যান পেয়ে গেল তারা। হাটের মতো জায়গাটি।

খোরমা, খেজুর, আখরোট, পেস্তা, বাদাম, খুবানী, তরমুজ, রুটি, মাংস সবই পেল তারা মোহরের বিনিময়ে। অনেকে আবার তাদের সত্যকার পীর ভেবে কিছু কিছু নজরানাও দিল।

ক্রমে তারা ইরাকের পল্লী অঞ্চল ভেদ করে এগোতে এগোতে এক সময় এসে পৌঁছল বসরা নগরীতে। বর্ণাঢ্য নগরী দেখে অবাক হল বেদৌরা। সবাই দেখছে তাদের কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। শেষে রত্নবণিক হেদায়তউল্লার দোকানের সামনে এসে হাজির হল তারা।

বণিক হেদায়তউল্লাহ্ তাদের দলবলকে নিয়ে গেলেন নিজের বাসস্থানে।

ফরিদকে তিনি বললেন, 'কই, আপনি যে আমার কন্যাকে আনবেন বলেছিলেন, তাকে তো দেখছি না!'

বেদৌরা তখন তার মুখের দাড়ি খুলে ফেলল। মাথার পাগ্‌ড়ি ফেলে দিল। তারপর বসে পড়ে বণিকের পায়ে সালাম করে উঠতে বণিক সবিস্ময়ে বললেন, 'তুমি আমার কন্যা! আমার বেদৌরা!'

'জী হ্যাঁ, আব্বাজান।'

ফরিদ আর বেদৌরাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন বণিক হেদায়তউল্লাহ্। অন্যসব পীরভাইদের একটি ঘরে আশ্রয় দিলেন। বাক্স-প্যাঁটরা তুলে আনতে লাগল বণিকের লোকজন। উটগুলোকে জল আর খাবার দিল।

বেদৌরা তার মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদল কিছুক্ষণ। মা নূরবানু বিবিও কাঁদলেন।

খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। অনেক লোক তাদের দেখতে এলো।

ফরিদ তার মণি-মাণিক্যের বাক্সটি নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করা কামরাটিতে এনে হেপাজত করে রাখল।

স্নানাদির পর আহার করতে বসল সকলে।

পীরভাইরা খেয়ে-দেয়ে গিয়ে অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন যখন ফরিদ আর বণিক কথা বলছিলেন গভীর রাতে। ফরিদ তার জীবনের প্রায় সব কাহিনীই শোনাল বণিককে। বাক্স খুলে মণি-মাণিক্য-গুলিও দেখাল তার।

বণিক হীরকখণ্ডটি দেখে বললেন, 'এটির দাম কম পক্ষে পাঁচ লাখ টাকা। দুটি অমূল্য সম্পদ আপনি এনেছেন। একটি আমার কন্যা, অন্যটি এই কোহিনূর হীরক। আপনি বরং আমার আর্জি মতো এই প্রাসাদেই থাকুন। আর আমি বহু ভাগ্য মনে করব যদি পীর ইলাহির ইচ্ছা মতো আপনাকে সোপর্দ করা আমার কন্যা বেদৌরাকে আপনি বিবাহ করেন আর আমার রত্ন-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হন।'

বেদৌরা এসে দাঁড়িয়েছিল তার পিতার একান্ত কাছটিতে।

ফরিদ বণিকের কথাবার্তায় খুশী হল। তবু একবার ভাবল, কোথায় সে রাজার ছেলে রাজ্য করবে, না ঘর বেঁধে ব্যবসা করতে বসছে! তবু বলল, 'ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। নিয়তি কে খণ্ডাতে পারে!—এবার ছবি আঁকব আর গান গাইব। আমার চাইতে সুখী আর কে আছে, কি বলো বেদৌরা—যখন তুমি আমার দিকে তোমার পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিয়েছ।'

ফরিদ হাত বাড়াতেই বেদৌরা তার হাত বাড়িয়ে দিল এগিয়ে এসে।

বণিক খুশী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নূরবানু বিবিও পর্দা সরিয়ে সরে গেলেন স্বামীর পিছু পিছু।

॥ আটাশ ॥

সারা শহর ঘুরে বেদৌরা আর তার বুড়ো জহুরী মামুকে সঙ্গে নিয়ে ফরিদ গান-বাজনার যন্ত্রপাতি, ছবি আঁকবার সাজ-সরঞ্জাম কিনে আনল।

গম্বুজাকারের একটি বালাখানা সম্পূর্ণ একক আলাদা পরিবেশে থাকবার জন্যে ফরিদকে দান করলেন বণিক হেদায়তউল্লাহ্। বুড়ো জহুরী মামু থাকবে শুধু সেখানে আর কয়েকজন দাসদাসী।

ঘরদোর ঝাড়-পোঁছ করে সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়া হল। বণিকের মূল বাড়িটি থেকে বালাখানার দূরত্ব বেশি নয়—একই বাগানের এপ্রান্ত আর ওপ্রান্ত। মাঝখানে পুষ্করিণী, চারপাশে কৃত্রিম ঝর্ণা, পাহাড়, ফুল-ফলের বাগান-বাগিচা। অর্ধনগ্ন পরীদের মর্মর মূর্তি। মনোরম পরিবেশ। বণিকের সন্তানাদি ছিল না কিন্তু মাঝে মাঝে গানের জলসা বসানোর জন্যে তিনি এই বাগান-বাড়িটি সাজিয়ে ছিলেন অতি যত্নের সঙ্গে টাকা-পয়সা খরচা করে।

পড়ন্ত রোদ যখন দেবদারু আর ঝাউ গাছের ছায়া দীর্ঘতর করে দিয়েছে ফরিদ তুলি হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে একাই ভাবছিল কি নিয়ে ছবি আঁকা যায়। নীলোফারের কথা বার বার তার মনে হতে লাগল। সে আঁকতে বসল।

গরম দুধ আর নাস্তাপানি নিয়ে এলো সেবিকাটি। সে দাঁড়িয়ে রইল। ফরিদ তাকালে তার মুখের দিকে। বলল, 'ও বাড়িতে অত হৈ-হল্লা কিসের?'

'হুজুর, মেহমান এসেছে।' বলতে লাগল সুন্দরী সেবিকাটি। গিন্নীমার এক বোন থাকেন এই শহরের উত্তর দিকে—তাঁর এক

ছেলে আর এক মেয়ে আছেন—তাঁরা এসেছেন। ছেলেটি বড় দুষ্টু, হৈ-হল্লা করেন। মেয়েটিও নাচেন-গায়েন, হল্লা করেন। ভগিনী বেদৌরাকে তাঁরা বড় জ্বালাতন করছেন। আজেবাজে কথা বলছেন হুজুর। এই বাগ-বাগিচা, ব্যবসা-পত্তর সবই ঐ বোনপো ইমরাদ হোসেনকে দান করার কথা ছিল। এখন আপনি আর বেদৌরা-ভগিনী এসে সেসব দখল করে বসাতে তাঁদের খুব ঈর্ষা হয়েছে। তাড়াতে চাচ্ছেন। বলছেন, কি প্রমাণ আছে যে তুমি বণিক হেদায়তউল্লার কন্যা ?'

'মা-মণি কি বলছেন ?'

'তিনি রাগ করছেন। বেদৌরা-বোন কপাট বন্ধ করে দিয়ে বোধহয় কাঁদছেন।'

'আচ্ছা, তুমি তাকে আমার কাছে আসতে বলো।' পকেট থেকে একটা আশরফী নিয়ে তার হাতে দিতে খুশী হয়ে সেবিকাটি চলে গেল।

তুলি চালাতে লাগল ফরিদ। নালোফারের দেহ-অবয়ব ফুটে উঠল। তার চুল, নাক, কান, ঠোঁট আর সুন্দর দুটি চোখ দেখা দিল। রংচঙে বড় আকারের তৈলচিত্র। অসমাপ্ত পড়ে রইল। বেদৌরা এখনো কেন আসছে না সেকথা ভাবতে লাগল। তাহলে কি সেবিকার কথায় সে বিশ্বাস করেনি যে ফরিদ তাকে ডাকছে। এবং ভয় পেয়েছে হয়তো কাকের মতো পিছনে লাগবে তার ইমরাদ হোসেন আর তার বোনটি।

দেখতে যাবে নাকি একবার ওদের ?

কি দরকার, ওরাই আসবে। কিন্তু সতর্ক হবার ব্যাপার আছে। বেদৌরা অসাধারণ রূপবতী মেয়ে। তার দিকে চোখ পড়বেই দুষ্টু প্রকৃতির ইমরাদের। যদি তাকে পাবার ইচ্ছে হয় তাহলে ফরিদকেই এখান থেকে সরাতে চাইবে কিন্তু রাত্রে বণিকের না ফেরা পর্যন্ত পরিচয়ের জন্যে অপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হল ফরিদের।

সে আবার তুলি চালাতে শুরু করল। ভাবল, বেদৌরাকে রক্ষা

করবার কে সে? নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে জানে বেদৌরা। নাগরিক সভ্যতার ঈর্ষা-কাতর বিষবাষ্প সম্বন্ধে সে আস্তে আস্তে একটু ওয়াকিবহাল হোক।

সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন নীলোফারের ছবিটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল—যখন আলো জ্বলে উঠল বালাখানায়—তখন বেদৌরা এলো তার মা'র সঙ্গে ম্লান মুখে। তার দিকে তাকিয়ে দেখল মুখখানা তখনো বেশ লাল হয়ে আছে। বোধ হচ্ছে নীরবে কেঁদেছে সে অনেকক্ষণ।

ফরিদ বলল, 'কি হয়েছে তোমার?'

নূরবানু বিবি বললেন, 'জ্বালাতন বাবা! আমার সেই দুষ্টু বোনপো ইমরাদ আর বোনঝি দীলরুবা এসেছে। ওকে জ্বালাচ্ছে। বলে, তুমি যে এবাড়ির মেয়ে তার কি প্রমাণ আছে? এটা সাজানো ব্যাপার। খোঁজ নিয়ে দেখেছে এদের মেয়ে চুরি গেছিল, আর ফরিদ নামের কোনো ভবঘুরে একটা মেয়ে এনে তুলেছে।'

'আচ্ছা, আমি ওসবের মোকাবেলা করবখন, আপনারা উত্তেজিত হবেন না।—যাও, বেদৌরা ভেতরে বসো।'

বেদৌরা ছবিটার দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল। বলল সে অন্যমনস্কভাবে, 'এই হল সংসার! এখানে ঈর্ষা, হিংসা, জটিলতা। সহজ সরল বিশ্বাস এখানে চলে না। বাইরের বাড়তি বিপর্যয় ঠেকাবার জন্যে এখানে অনেক ক্ষমতা ব্যয় করতে হয়। ওই উদ্ধত যুবক আমার দিকে এমন চোখ ফেলতে চায়, যার অর্থ সম্পূর্ণ কাবু করে রাখা। ভয় দেখিয়ে নিজের মুঠোর ভেতরে আনবে। পরে অবশ্য বলছিল, আমি সবই ঠাট্টা করে বলেছি। আমি মানুষকে দুঃখ দিতে চাই না। যদি তাই হয় তবে সুখের কথাই বলতে হবে—আমার বাবা রাজকর্মচারী। সৈন্য বিভাগের ওপর-তলার লোক। আমার জন্যে হাজার সুন্দরী অপেক্ষা করছে। তবু যদি সত্যিই তুমি আমার খালাতো বোন হও, তাহলে তো কথাই নেই, তোমাকে আমার পছন্দ।'

ফরিদ বলল, 'দুষ্টু ছেলেকে জব্দ করতে আমি জানি। সারা

দিল্লী শহরে আমি একসময় নামকরা দুষ্টু ছেলে ছিলাম। যাক গে, ও-নিয়ে মন খারাপ করো না। দেখ তো, ছবিটা কেমন হয়েছে?'

'এটা কার ছবি?' শুধোলে বেদৌরা।

'বলো তো—'

'নীলোফার?'

'ঠিক তাই। কেমন দেখছ, মানে এর চোখের দৃষ্টি—মনের ভাব—চেহারার আকর্ষণ, গায়ের রঙ?'

নূরবানু বিবি পাশের কামরার দিকে গিয়ে কোনো একজন সেবিকাকে কি সব নির্দেশ দিচ্ছিলেন তখন।

বেদৌরা বলল, 'আমি তো তাঁকে দেখিনি। তবু ছবি দেখে অনুমান করতে পারি ইনি খুব জ্ঞানী, লাবণ্যবতী, সৌভাগ্যশালিনী, নিষ্পাপ এবং রুচিসম্পন্ন মহিলা ছিলেন।'

'ঠিক। তোমার একটা ছবি এঁকে দিই এটা তুমি চাও না?'

'নিজের ছবি নিজে দেখব?'

'হ্যাঁ, তাতে কি?',

'কিছু না। আচ্ছা, দিও।'

'কি দেবে?'

'কি চাও? আমার বলতে আর এখানে কি আছে, তুমি ছাড়া?'

নূরবানুর কানে গেল কথাটা। তিনি আহত হলেন একটু। মেয়ে বলে কি! তার নাকি এখানে কিছু নেই। ইমরাদের কথায় রাগ হয়েছে। আর দেখা যাচ্ছে ওর করুণাভরা মন ফরিদের প্রেমে এখন পরিপূর্ণভাবে ভিজে আছে।

'আমি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই, কিছু নেই? পরের কথায় অভিমান করো না। বসো, তোমাকে আমি বিদেশী একটা বাজনা শোনাই। সাহেবদের দেশের বাজনা।'

এ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে শুরু করল ফরিদ। টমাস রো সাহেব এই

বাজনা এনেছিলেন। তাছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের কোনো জায়গায় এই ধরনের বাজনা বাজাতে দেখেছে সে। রো সাহেব বড় আমুদে লোক ছিলেন। তাকে রোজই বাজনা শেখাতেন, আর অসাধারণ ভঙ্গী করে কথা বলার কৌতুককর মজা দেখাতেন। তাসের ধাঁধাঁ দেখাতেন।

বাজনা শুনে বেদৌরা হতবাক। নূরবানু বিবি বললেন, 'যেন সমুদ্রের ওপর ঝড় হচ্ছে। ঢেউয়ের তুফান উঠছে আবার ভেঙে পড়ছে। কি অপূর্ব এই বাজনা!'

বেদৌরা প্রথমে কিছুই বলল না। শুধু তার চোখ যেন আনন্দ-আমেজে ভবে গেল। তারপর বলতে লাগল, 'সেই ভাল, এই সুর আমি শুনতে চাই, এই ঝড়ের বাজনা—ভীম-ভৈরব ঝড়—মনের সঙ্গে যার সমতা—আর কান্নার মতো ভেঙে পড়ুক বেলাভূমিতে—আছড়ে পড়ুক—ভেঙে গুঁড়িয়ে যাক অযুত লক্ষ ঢেউয়ের রাশি।'

একটা বাজনা থামলে নূরবানু বিবি যখন মেয়েকে বলতে শুনলে, 'আবার বাজাও—থামিও না'—তখন তিনি উঠে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, ও-বাড়িতে ওরা আছে, না জানি কি না কি হাত সাফাই করে বসে। নিজেদের বাক্স প্যাঁট্রা এনেছে ওরা সঙ্গে করে। কিছু চুরি করে তার মধ্যে ভরে নিলে তো আর বলতে পারবে না, খুলে দেখাও আমাদের কোনো কিছু নিয়েছ কিনা! কিন্তু মাঝপথেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের দুটি ভাইবোনের সঙ্গে।

ইমরাদ বলল, 'খালা-আম্মা, এমন সুন্দর বাজনা বাজাচ্ছে কে?'

'যুবরাজ ফরিদ। যাও না, আলাপ করো গিয়ে।'

'যুবরাজ! কোন দেশের যুবরাজ রে বাবা! রাজ্য আছে তো—না, তালপুকুর ঘটি ডোবে না!'

'বেশ তো, গেলেই দেখতে পাবে।' নূরবানু বিবি খাস-মহলে চলে গেলেন।

দীলরুবা বলল, 'ভাই, তোর বড় স্বভাব খারাপ। খালা-আম্মা রাগ করেছেন।'

'দেখ, নেড়ি তোকে ঠ্যাঙাব! চুপ করে থাক। যা বললুম, তুই ভদ্রলোককে কাবু করবি, মজা করে খেলা করবি যাতে বেদৌরার মন চঞ্চল হয়, বিষাক্ত হয় আর তাতে অবিশ্বাস আসে। আর আমি সেই ফাঁকে বেদৌরাকে হাত করব। খালুর এত বিষয়, টাকা-কড়ি তো বেহাত হলে চলবে না। মনে রাখিস, আব্বার আমার চারটে বিয়ে—চার সংসারে আমরা চৌত্রিশ ভাগ হয়ে আছি। তোর ধান্ধা তো শুধু গহনা-গাঁটি আর কাপড়চোপড় চুরি করা। বাড়িতে গিয়ে বলিস, খালা-আম্মা তোকে দিয়েছে। যদি আমার মতলব হাসিল না করিস তো সব ফাস করে দোব। বেদৌরার রেশমের পোষাক চুরি করে তো প্যাঁটরায় ভরে এলি।'

'শুনব বাবা, তোর কথাই শুনব।'

ওরা দুজনে দোরগোড়ায় এসে উঁকি মারতেই ফরিদ শক্ত চোখে একবার তাকাল। বাজনা থামিয়ে দিয়ে বললে, 'কি চাই?'

ওরা দুজনে ভেতরে ঢুকে পড়েই বসে পড়ল। ইমরাদ বলল, 'চাইব আবার কি, বাজনা শুনতে এলাম।'

'এলেই তো হয় না! তার জন্যে অনুমতি লাগে। আপনারা কি তেমন বাড়ির ছেলেমেয়ে নন যেখানে এসব স্বাভাবিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।'

ইমরাদ বলল, 'আপনারাই বরং উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। এটা আমার খালুর প্রাসাদ।'

'মিথ্যা একটা স্বপ্নের খোলসের মধ্যে বাস করেছেন, এখন দয়া করে বেরিয়ে যান—আমাদের বিরক্ত করবেন না!'

'যদি না যাই?' বলল দীলরুবা।

'তাহলে অনন্তকাল আপনারা এই ঘরের মধ্যে বাস করুন'—বলে বেদৌরার হাত ধরে বেরিয়ে এসে কপাটে শিকল তুলে দিল ফরিদ।

ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'একি করছেন? দোর খুলুন। ইয়ার্কি নাকি। উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব…'

ফরিদ একটা গাছের তলায় এসে দাঁড়াতেই মালি দুখানা কুরশি এনে দিল। ঝাড়বাতির আলো এসে পড়েছে সেখানে। পাশেই ফুলের গুচ্ছ বাতাসে দোল খাচ্ছে। সুমধুর গন্ধে চারদিকটা ভরপুর।

॥ উনত্রিশ ॥

বেদৌরা বলল, 'এবার খুব জব্দ হয়েছে শয়তানরা। থাকুক অমনি! কিন্তু যদি দামী দামী আসবাব-পত্র বা বাদ্যযন্ত্রগুলো ভেঙে দেয়?'

'হাত-পা মুচড়ে ভেঙে ছেড়ে দোব।'

'আমি যাই মাকে বলি গিয়ে!'

'বসো বসো। দাসীদের দিয়ে বলে পাঠাচ্ছি। তিনি এসে খুলে দিলে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই।'

ফরিদ একজন দাসীকে ডাকল। তাকে বলল ব্যাপারটা। সে গিন্নীমাকে বলতে ছুটল ওদের বন্দী দশার কথাটা।

ফরিদ বলল, 'এমন মধুর সন্ধ্যা। স্নিগ্ধ বাতাস। ঝাড়বাতির বিচিত্র বাহারী আলো পড়েছে আমাদের গায়ে—আপেল পেকে আছে যে গাছে তার নিচে আমরা বসে আছি। চারদিকে ফুলের অপূর্ব সম্ভার। আমরা যেন স্বর্গে বসে আছি।'

'হ্যাঁ সখা, এটা স্বর্গোদ্যানই বটে।'

'তাহলে স্বর্গের দুটো ফুল নাও, ফল খাও।' দুটো গোলাপ তুলে বেণী জড়ানো খোঁপায় গেঁথে দিল ফরিদ। আপেল পাড়ল হাত বাড়িয়ে। দুজনে খেতে লাগল আনন্দে।

ফরিদ ওর চূর্ণ কুন্তল কানের পিছনে তুলে দিয়ে বলল, 'কি অপরূপাই না দেখাচ্ছে গো তোমাকে!'

'ভাল লাগছে!'

'হ্যাঁ। এত ভাল লাগছে যে ভাষায় কুলোচ্ছে না। বলতে ইচ্ছে করছে হাফিজের ভাষায়:

'প্রিয়া মোর মনের মত,
ফুল বুকে মোর, মদ হাতে,
তুনিয়ার স্থলতানেরে
গোলাম গনি এই রাতে।
আজিকে এ মজলিসে
কাজ কি জেলে মোমবাতি ?
সজনী চাঁদবদনী
বেশ বিরাজ জলসাতে !
মদিরা হালাল বটে
মোদের মতে ; কিন্তু তা
হারামই গোলাপ-তনু
বঁধুর বিনি সাক্ষাতে।
কান তু'টি লেগেই থাকে
বীণ বাঁশরী ঝঙ্কারে,
চোখ তু'টি লেগেই থাকে
চুনি ঠোঁট ও পেয়্‌লাতে।
এনো না খোশবু আতর
আমাদের এ মজলিসে,
সতত তোমার বেণীর
সৌরভেতেই মন মাতে॥
ব'লো না চিনি মিছরির
স্বাদের কথা মোর কাছে,
তব যে ঠোঁটের মিঠা
আমার শুধু কাজ তা'তে।
যখনি এলো তোমার
তুখের মণি মোর হৃদে,
হামেশা বসত হ'ল
শরাবখানার কোণটাতে।

ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাতে পারে! ঝড়বৃষ্টি নামাতে, বজ্রপাত ঘটাতে, মাটি বিদীর্ণ করে প্রস্রবণ বানাতে পারে। তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে কিন্তু সে ক্ষমতা কোথায় যে তার মধ্যে সুপ্ত থাকে ভেবে পায় না ফরিদ।

লায়লা ওদের কাছে এলো। বিচিত্রবর্ণ কাঁচ বা চিনেমাটির পাত্রগুলো সে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় বলল, 'আপাজান, মা-মণির ইচ্ছে, আপনি আজ রাত্রে ও-বাড়িতে তাঁর কাছে থাকেন, কেননা এখনো আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। কোনো কিছুতে উত্তেজিত হলেই আপনার রক্তক্ষরণ হতে পারে।'

বেদৌরা আর ফরিদ চোখে চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা হতাশায় বেদৌরার মুখটা ম্লান হয়ে গেল।

ফরিদ মনটা শক্ত করল। বলল, 'সোনামণি, তুমি দুঃখ করো না। সুস্থ হয়ে ওঠো। জানো, যে তোমার মাথায় আঘাত হেনেছিল সেও এখন শয্যাশায়ী! যাবার পথে ওদের ভাইবোনকে দেখলাম। ঘোড়ার চাট মেরে ভাইটাকে যখম করে দিয়েছিলাম আর বোনটাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে গিয়ে শহরে পৌঁছে দিই। যাবার পথে সরাই-খানায় যে বুড়ীর সঙ্গে আলাপ হল পরে গিয়ে দেখি সেই আমার খালাআম্মা! ওষুধ নিয়ে ফিরছি, বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে হঠাৎ কজন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করল ইমরাদ হোসেন। আহত হল ইমরাদ। সৈন্যরা পালাল। লোকজন জুটে গেল। দীলরুবা আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। নাস্তাপানি দিল। দীলুর বাবা খুব ভাল। বদমায়েস ছেলের জন্য তিনি অনুতপ্ত।'

বেদৌরা ফরিদের হাতে হাত বুলোতে লাগল। বলল, 'যদি তুমি দাওয়াই নিয়ে আজো না ফিরতে পারতে হয়তো আমি মারা যেতাম। কী ভীষণ জ্বালা করছিল! রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। এখন জ্বালাটা চলে গেছে। আমি আজ শান্তিতে ঘুমোতে পারব।'

'আমিও। আমি ঠিক ক্লান্ত নই, তবুও ঘুমোনো দরকার। যাও তুমি, দূরে তো নয়—যখন ইচ্ছে যেতে পারি।'

[illegible] তুলে [illegible]দতে সে উঠল। পায়ে সালাম করতে যেতেই ফরিদ বাধা দিল, 'এই এই—একি করছ। তুমি সতীসাধ্বী মেয়ে—আমি কত পাপ করেছি—এসব করলে কিন্তু আমি একদিন ঠিক পালিয়ে যাব।'

'কোথায়? দিল্লীতে?'

'হ্যাঁ।'

'যেতে দিলে তো!' বলে ম্লান হেসে বেদৌরা লায়লার হাত ধরে আস্তে আস্তে ও-বাড়িতে চলে গেল।

॥ তেত্রিশ ॥

নির্জন ঘর। ঝাড়বাতি জ্বলছে। একদিকে অস্ত্রপাতি। গান-বাজনার যন্ত্রপাতি। ছবি আঁকার সরঞ্জাম। বইপত্র। চমৎকার সাজানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। দুগ্ধফেননিভ শয্যা। মখমল মোড়া লেপ মুড়ি দিয়ে পড়েছিল ফরিদ। দোরের পর্দাটা বাতাসে দুলছে।

তন্দ্রা নেমে এলো চোখে।

মাঝরাত্রে একসময় তার ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন কোথায় বাজনা বাজাচ্ছে না? উঠে তলোয়ারটা নিয়ে পর্দা ঠেলে বাইরে এলো। কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না রাত। ঝাউ আর দেবদারু গাছগুলো চূড়োর মতো কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে। বেদৌরার জানলায় আলো জ্বলছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। কোনদিকে বাজনাটা বাজছে?

ফুলবাগানের বাঁধানো পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল সে। গায়ে তার রেশমের নকশাদার লাল রঙের আলখাল্লা। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে হাওয়াখানার মিনারের ওপরে উঠে দেখল সে কে যেন আপাদমস্তক সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে।

এখানে কে শোয়? কোনো পাহারাদার? বাজনাটা তো এই হাওয়াখানা থেকেই বাজছিল?

অনেক লোকজন আছে তার ভাবী শ্বশুর হেদায়তউল্লাহ্ বণিকের। চাকর-নফররা কোথায় থাকে কোনো খোঁজ-খবর রাখে নি সে। প্রয়োজনও হয়নি। কিন্তু লায়লাটা কে? কোথা থেকে এলো? এত সুন্দরী সুশ্রী পূর্ণ যুবতী মেয়ে দাসীর কাজ করতে এলো কেন? নাকি এঁদের কোনো দরিদ্র আত্মীয়া?

কে লোকটি শুয়ে আছে? চাদরের নিচে রহস্যময় কোনোকিছু নেই তো?

পর্দাটা তলোয়ারের ডগা দিয়ে একটু সরিয়ে দিতেই ফরিদ চমকে উঠল। একি! এটা যে একটা নর-কংকাল!

পর্দা চাপা দেওয়া আছে কেন? আবার চাপা দিয়ে দিল ফরিদ।

পিছন ফিরে খানিকটা হাঁটতেই হঠাৎ মিশ্র স্বরের বাজনা বেজে উঠল। ফরিদ দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে তাকাতে লাগল। তেমনি কংকালটা পড়ে আছে।

নিচে নেমে এলো সে। দেখল হাওয়াখানার ঘরের মধ্যে কেউ নেই—কিছু নেই!

হাওয়াখানার সোপান নেমে গেছে বৃহৎ পুষ্করিণীর জলের তলায়। আলো অন্ধকারে রহস্যময় চারদিক। পরিষ্কার দেখা যায় না সব কিছু।

ফরিদ ফিরে এলো আস্তে আস্তে। বাজনাটা বাজছে তখনো। নিজের কামরায় ঢোকার পর হঠাৎ মনে হল কেউ যেন দোরের পাশ দিয়ে চলে গেল। আলখাল্লাটা খুলে ফেলেছিল সে। পরণে ছিল একটা খাটো বস্ত্র। হঠাৎ প্রায় নগ্নবেশে তরবারী হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো সে। দেখল, কেউ কোথাও নেই! তাহলে কি সবই ভ্রম? অন্য কাউকে ডেকে শোনাবে বাজনাটা? দাসদাসীরা কোথায় থাকে? বড় বাড়ির সিংহদ্বারে প্রহরী আছে রুস্তম পালোয়ান। ভেতরে এসে শুয়ে পড়ল এবার সে।

বাজনাটা থেমে গেল তো এবার শোনা যেতে লাগল সুললিত নারী কণ্ঠের কোরআন শরীফ পাঠ! মনে হচ্ছে যেন পাশের কামরাতেই।

এটা কি তাহলে ভূতের বাড়ি! ঘুমিয়ে পড়লে সে কোনোকিছুই জানতে পারত না। রাতের নিজস্ব একটা রহস্যময়তা আছে। তার নিজের মাথাটাও ভাল করে একবার ধুয়ে ফেলা দরকার।

গোসলখানায় গিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলে চুলগুলো ঘষে মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসার সময় দোরের ফাঁক দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে দেখতে পেল। দোরটা একটু ঠেলতেই খুলে গেল খানিকটা। দেখল, ঘরের মেঝেয় মাদুরী পেতে কাকের মতো কালো পোষাক পরে সুন্দরী লায়লা পবিত্র কোরআন পাঠ করছে।

ডাকল ফরিদ, 'লায়লা!'

'জী!' সাড়া দিয়ে চকিতে উঠে এলো লায়লা। ফরিদকে এখন মাথা ধুয়ে গোসলখানা থেকে বের হতে দেখে বলল, 'এখনো আপনি ঘুমোননি হুজুর?'

'ঘুম আসছিল না, তাই মাথাটা ধুতে এলাম। তুমি এখনো জেগে আছ কেন?'

'এটা তো আমার কর্তব্য। রাত্রে যদি আমাকে আপনার দরকার হয়?'

'তোমাকে আমার দরকার হয়! কেন?'

'বারে! যদি পিপাসা পায়, পানি চান অথবা শিল্পী মানুষ, যদি আঁকতে বসেন, তাহলে গরম পানীয় কিছু দিতে হবে, তুলি-কালি যোগান দিতে হবে। আপাজানের কাছে থাকার জন্যই আমাকে আনা হয়েছে তার সখী রূপে কিন্তু আপনি একা থাকবেন বলে তিনি আমাকে এ-বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

কথা বলতে বলতে লায়লা পিছু পিছু এলো ফরিদের। ফরিদ এসে শুয়ে পড়ল। লায়লাকে বসবার জন্য ইংগিত করল। একটা তেপায়া এনে লায়লা বসল ফরিদের পায়ের দিকটাতে। বলল, 'আমি আপনার পদসেবা করব একটু, তাহলে হয়তো তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যাবে।'

ফরিদ বাধা দিল না।

বলল, 'তুমি কোথা থেকে কেমন করে এখানে এলে?'

'আমার কেউ নেই হুজুর। কর্তাবাবার দোকানে আমার বৃদ্ধ পিতা আজীবন চাকরি করতেন। তিনি মারা গেছেন। বাড়িঘরের

অবস্থা ভাল ছিল না। কর্তাবাবা আমাকে মাসে মাসে সাহায্য করতেন। তারপর গিন্নীমার কথা মতো আমাকে এনে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছেন।'

'তোমার মতো গুণবতী সুন্দরী মেয়ের বিয়ে-সাদী হল না কেন?'

লজ্জা পেলে লায়লা। বলল, 'আমার নামে অপবাদ রটেছিল, তাই চেষ্টা করেও বাবাজী সাদী দিতে পারেন নি যারা আমাকে দেখে যেত তারা আর সংবাদ দিত না।'

'তোমার নামে অপবাদ রটল কেন?. কি করেছিলে?'

'আমার বাবা যেখানে বাস করতেন সেই পাড়ার পাশের গ্রামের মোড়ল ভয়ঙ্কর দুশ্চরিত্র ছিল। তার ছেলেরা আরো খারাপ ছিল। আমি মাদ্রাসায় পড়তে যেতাম। একদিন মোড়লের একটি ছেলে আমাকে ডাকে। আমি সাড়া না দিয়ে চলে যেতে থাকি। তখন সে আমাকে শুনিয়ে একটা অশ্লীল মন্তব্য করে।'

'কি মন্তব্য, শুনিই না?'

'না হুজুর, সেকথা বলতে আমার লজ্জা করে।'

তাকিয়া ঠেস দিল ফরিদ। বলল, 'বলো বলো, লজ্জা করো না। আর আমাকে তুমি হুজুর হুজুর করবে না। বেদৌরার সখি যখন তখন আমারও। তুমি তো ঠিক দাসী নও। এখন এ-বাড়ির পালিত কন্যা বলতে পার। তোমার বিয়ে-সাদী হবে। ভবিষ্যৎ আছে। বলে ফেলো, কি অপমানজনক কথা বলেছিল?'

'আমি মাদ্রাসা থেকে ফিরে এসে মাকে সেকথা জানাতে তিনি আবার আব্বাকে বলে দেন। আব্বা তখন দু-চারজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে বিষয়টা বললে তাঁরা বলেন কাজীর আদালতে জানাতে। আব্বা ছেলেটিকে যখন শুধোয় সে স্বীকার করে নি। তখন আব্বা বলেছিলেন, আমি যদি আদালতে জানাই তোমার শাস্তি হতে পারে। ছেলেটি তখন আব্বাকে বলে, আদালতে যাবে তো আমার কাছে কিসের ইয়ে করতে এসেছ।—শুনে আব্বার খুব রাগ হয়। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে কাজীর কাছে যান এবং বিবরণটা

লিখিত ভাবে জানান। পরে একদিন দু-তিনজন সিপাই আসে মোড়ল আর তার অন্য একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে আমাদের বাড়িতে। সিপাই দেখে চারপাশের লোকজন ছুটে আসে। তাদের সামনে মোড়ল আর তার ছেলেকে সিপাই খুব কড়া শাসন করে আদালতে বেঁধে নিয়ে যাবার কথা বলে। মোড়ল জীবনে কখনো এমন কথা শোনেনি। সে তখন ছিল অসুস্থ। কিন্তু কাজীর দরবারে অনেক টাকা-পয়সা বা মুরগী-খাসী দিয়ে মোড়ল তার ছেলের বিষয়ে অব্যাহতি পেলেও গ্রামে ফিরে অপবাদ ছড়িয়ে দিল, আমি নাকি তার ছেলের দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছি। মোড়লের লোকজন ছিল, টাকা ছিল, আব্বা আর কিছুই করতে পারলেন না। এই দুঃখে তিনি ক্রমেই যেন ভেঙে পড়তে লাগলেন। পাঁচমাস তিনি বিছানায় পড়েছিলেন। কর্তাবাবা সাহায্য পাঠাতেন। রাত্রে আমাদের বাড়িতে ঢিল পড়ত। আব্বা শেষ পর্যন্ত আমাকে একা রেখে মারা গেলেন।'

চোখ মুছতে লাগল লায়লা। বলল, 'ভাইজান, আমি বড় অনাথ, বড় অসহায়! কর্তাবাবা না দেখলে পেটের দায়ে নিশ্চয়ই ভেসে যেতাম, ভিক্ষে করতাম, অথবা মন্দ জীবন যাপন করতে হত। আমার ভাগ্য ভাল যে আমি এই রাজপ্রাসাদে জায়গা পেয়েছি। আমার কোনো কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে নিজগুণে মাফ করবেন হুজুর।'

'আবার হুজুর!' জোরে ধমক দিয়ে বলতেই সহসা চমকে উঠল লায়লা। হেসে ফেলল সে। বলল, 'আপনাকে আমি ভাইজান বলব।'

'তাই বলবে কিন্তু তোমাদের গাঁয়ের সেই মোড়লটা এখনো বেঁচে আছে কি?'

'না হুজুর, এই থুড়ি, ভাইজান! সে মারা গেছে। মরবার সময় সে বক্‌রীর মতো ব্যা-ব্যা করে চিৎকার করছিল। তার ছেলেরা তখন টাকা-কড়ির বখরা নিয়ে মারামারি করছে। বুড়ো মোড়ল

তখনো চেঁচাচ্ছে: 'ব্যা—কাজীর কাছে যাব। ব্যা—ব্যা—শালারা, তোদের গারদে ঢোকাব—ব্যা ব্যা ব্যা—সব টাকা কাজীকে দোব। গরিব লোকদের বিষয় সম্পত্তি আমি গ্রাস করেছিলাম—এখন আজরাইল এসে আমার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরেছে—ব্যা ব্যা ব্যা...'

হাসল ফরিদ লায়লার সরলতা দেখে। ব'ল, 'আচ্ছা, লাইলী, তুই ভয় করিস না?'

'কেন? কিসের ভয়?'

'এই মানে আমিও তো একজন পুরুষ—এখন মাঝরাত—তুমি একা সুন্দরী মেয়ে...'

'আপনি তো ভদ্রলোক। তাছাড়া আম্মাজান বা আপাজান যখন বলেছেন তখন অবিশ্বাস করব কেন? আর কবলেই বা কী, আমার জীবনের এখন আর কী দাম আছে!'

ফরিদ আর কিছু বলল না। চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ! আবার সেই বাজনাটা বাজতে লাগল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কাওয়ালী গান। অনেক লোকের ধুয়োধরা কণ্ঠস্বর আর তাদের তালি মারার শব্দ।

'ঐ বাজনা; আর এখন শুনছি গানটা—ওটা কোথা থেকে হয় তুই জানিস লাইলী?'

'গতকালও আমরা শুনেছি। ভয়ে ঘুমুতে পারিনি আপাজান আর আমি। রুস্তম দেখে এসেছে হাওয়াখানার মিনারে একটা পর্দা চাপা নরকংকাল এসে কোথা থেকে নাকি জুটেছে। কর্তাবাবাও শুনেছেন। তিনিও নাকি রহস্যভেদ করতে পারেন নি। প্রতি বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার রাত্রে এরকম বাজনা বাজে। কাওয়ালী গান হয়। ভয়ে কেউ বাইরে বের হয় না।'

'আমিও কিছুক্ষণ আগে তলোয়ার হাতে নিয়ে গিয়ে মিনারের ওপরের নর-কংকালটা দেখে এসেছি।'

'কর্তাবাবা বলেছেন, বোধহয় কোনো পাজী লোক এসব কীর্তি করেছে।'

'হু! আচ্ছা যা, তুই শুয়ে পড় গিয়ে। আয়, এদিকে আয়।'

কাছে গেল লায়লা। হাতটা তার ধরল ফরিদ। শুঁকে দেখল। বলল, 'কই, কোনো গন্ধ নেই তো অপবাদের! মোড়লটা আজ বেঁচে নেই যে তার মাথাটা কেটে এনে ধড়াস্ করে ফেলে দোব তোর পায়ের কাছে। তুই আমার একটা আদুরে বেড়াল! যা এখন তুই।' গাল টিপে দিতে হাসল লায়লা। নিজের কামরায় এসে দোর এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ফরিদও দোর এঁটে দিল। ঘুমুল সে।

॥ চৌত্রিশ ॥

সকালে নিদ্ ভাঙতে দেরি হল ফরিদের।

লায়লা অপেক্ষা করে বসেছিল। বলল, 'ও-বাড়িতে আপনার নাস্তাপানির ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই অপেক্ষা করে আছেন। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নিন।'

লায়লার সঙ্গে এ-বাড়িতে এসে প্রথমে বেদৌরার ঘরে গেল ফরিদ। হাসল বেদৌরা, বলল, 'নিশ্চয় ভাল ঘুম হয়নি। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে।'

ফরিদ বলল। 'মোগলদের চোখ একটু লালই হয়!'

'না হুজুর, সেটা পাঠানদের।'

'হিন্দুস্তানের পাঠানদের কিন্তু মোগলরা হারিয়ে দিয়েছিল যতই লাল চোখ তাদের হোক।'

নাস্তাপনি খেতে বসল ফরিদ। হেদায়তউল্লাহ্ সাহেবও এসে বসলেন। বললেন, 'মোস্লুলের গুণীন বুড়ীর দাওয়াইটা খুব কাজে লাগল বাবা ফরিদ।'

'গুণীন বুড়ী বলবেন না, তিনি খুব পরহেজগার, জ্ঞানী, বিদুষী আর গুণবতী মহিলা। বড় বড় রাজ-পরিবারের তিনি চিকিৎসা করেন। তিনি অদ্ভুত একটা দর্পণ করতে জানেন। তাতে যাকে দেখতে চান, তাকে দেখতে পাবেন এবং তার কলঙ্কময় জীবন হলে মুখে বা শরীরে কালো কালো ছাপ পড়ে। তিনি পারশ্যের রাজ-বাড়িতে চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর অবস্থা খুবই ভাল। পাকা দালান-কোঠা, বাগান, জমি ইত্যাদির সঙ্গে একটি মাত্র নাংড়া নাৎনী আছে, তার বিয়ে দিতে পারছেন না। কেউ তাকে বিয়ে করতে চায় না।'

'লায়লার সঙ্গে আশা করি তোমার আলাপ হয়েছে। ওরও দুর্ভাগ্য ঘটেছে মিথ্যা অপবাদে, গ্রামের দুর্বৃত্ত ছেলেরা পিছনে লেগে। মেয়েটি বড় ভাল। ও-ও আমার মেয়ের মতো। ওর বাবা বড় বিশ্বাসী জহুরী ছিল। তুমি তাকে দেখেছ বোধহয়। সেই প্রথম যেবার দোকানে এসে আমাকে পাঁচটা রত্ন বেচে গেলে, যে বুড়ো জহুরীটা রত্ন পরীক্ষা করে দেখেছিল সে-ই ছিল লায়লার বাবাজী! আমার বহুদিনের বন্ধু। মাইনে ছাড়া সে যদি চুরি করত তাহলে বাড়ি আর আলাদা ব্যবসা করতে পারত। তার চেয়ে ভাল জহুরী আর এদেশে কেউ ছিল না। অনেক রত্ন-বণিক তাকে বেশি মাইনে দিয়ে আমার দোকান থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু লায়লার বাপ যায় নি। যাক, লায়লা আমার বাড়িতে থাক। বেদৌরার ও সখি হয়ে থাকবে। যদি বিয়ে দিতে পারি তো ওর বাবার বন্ধুত্বের ঋণ আমি শোধ করব।'

লায়লার একটা হাত ধরে শুয়েছিল বেদৌরা। লায়লা অন্য হাতে ময়ূরের পাখা নিয়ে মৃদুমন্দ বাতাস দিচ্ছিল বেদৌরার মাথায়।

নূরবানু ওঁদের আহারাদি পরিবেশন করছিলেন।

পরোটা, কিছু দুম্বার মাংস, ফিরনি, ফল আর গরম দুধ খেলে ফরিদ। বলল, 'মোসুলের গুণীন মহিলাটি কিন্তু আমার খালাআম্মা হন।'

'তাই নাকি! তাহলে তোমাদের বিয়ের সময় তাঁকে এনো।'

লায়লা বলল, 'চাচাজান, বেদৌরা-আপার কবে সাদির দিন ধার্য করছেন তাহলে?'

'হ্যাঁ, এইতো হবে, বেদৌরা-মা সুস্থ হয়ে উঠুক।'

ফরিদ বলল, 'আমার মাকে হিন্দুস্তান থেকে আনার পর।'

বেদৌরা যেন সহসা চমকে উঠল। তাহলে ফরিদ কি বিয়ের আগেই হিন্দুস্তানে চলে যাবে? আর বাদশা শাহজাহান যদি ওকে চিরকালের জন্য বন্দী করে রাখেন পাথরের অন্ধকার পাতালপুরীর মধ্যে?

হেদায়েতউল্লার মনে পড়ল ফরিদের আনা বৃহৎ হীরকখণ্ডটির কথা—যেটি সে বিনামূল্যেই ভেট দিতে চায় বাদশা শাহজাহানকে তার মায়ের মুক্তির জন্য। যদি গিয়ে দেখে যে তার মা বেঁচে নেই? যদি অন্য কোথাও ওই অনিন্দ্যসুন্দর রাজকুমার বাঁধা পড়ে যায়? তাই তিনি বললেন, 'বিয়ের পর নাহয় দিল্লীতে যেও—তোমার আম্মাজানকে নিয়ে এসো।'

ফরিদ মাথা নাড়ল। না, তা হয় না। সে যাবেই। মা না থাকলে তার আনন্দ হবে না। তাছাড়া মাকে দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে এসে আনন্দ করবে এখানে? সে এত বড় দুর্বল অসহায় যে বাদশা শাহজাহান তার শত্রু জেনেও মাকে তার অন্তঃপুর থেকে উদ্ধার করে আনতে পারেনি। হায় দুর্ভাগ্য!

ফরিদ অন্যমনস্কভাবে চলে আসছিল। হঠাৎ আবার ফিরে গেল। দেখল, বণিক পোশাক-আষাক পরে দোকানে বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন।

ফরিদ বলল, 'গতরাত্রে বাজনা বাজাচ্ছিল কারা, কাওয়ালী গাইছিল আর হাওয়াখানার মিনারের মধ্যে নর-কংকাল শোয়ানো আছে কেন?'

বণিক বললেন, 'এর রহস্যভেদ করতে পারছি না বাবা। সম্ভবত কোনো জীন ঐ হাওয়াখানায় আশ্রয় নিয়েছে। জানি না আমার লাভ করবে না ক্ষতি করবে!'

ফরিদ বলল, 'আজ রাতেও যদি সেই রকম বাজনা বাজে তবে আমি ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি ঘটাব।'

'কেমন করে! না বাবা ওখানে যেও না। ভয়েই তোমার মৃত্যু ঘটতে পারে!'

হঠাৎ অট্টহাসি করে উঠল ফরিদ। মিশরের পিরামিডের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তার। কত প্রেতাত্মার উদ্ধার করল সে। জীতেন্দ্র যাদুকর, বিজ্ঞানী যাদুবীর আবু ইসহাক ইবনে ইমামের

অতৃপ্ত আত্মারা কোথায় গেল? পীরচেঙ্গির মায়াকাননের বন্দী পাষাণ রাজকুমাররা কোথায় গেল?

গুলবাগের মধ্যে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল ফরিদ। মার কথা ভাবতে লাগল। অন্তঃপুর, রাজদরবার, দিল্লীর বাজার, নিয়াজীর সরাইখানা, তাঁর মেয়ে আসমার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সেই সৎ ব্রাহ্মণের কথা—যিনি মন্ত্রবলে তাঁর ছিন্ন-প্রায় বাহু জুড়ে দিয়েছিলেন। কত মেয়ে তার জীবনে এলো গেল!...

বেদৌরার যৌবনভরা চেহারার কথা সে ভাবল। কাল সে মরুভূমির যে চিত্রটার কথা বলেছিল, ভেবে দেখল একবার। তারপর রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসল।

কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে লায়লা এসে বসল তার পাশে। ফরিদ কিছু বলল না। হয়তো একটু বিরক্ত হল, অন্যমনস্ক হল একটু।

বলল, 'ছবি আঁকা শিখবে?'

'জী হ্যাঁ।'

ফরিদ হাসল একটু। ওর মুখটা ধরে তুলি দিয়ে অলঙ্কৃত করতে লাগল। লম্বা টিপ দিল। গণ্ডে রক্তিম আভা ফুটিয়ে দিল। একটা তিল আঁকল। চুলগুলোকে কানের পাশে নামিয়ে দিল। ঠোঁটে রং দিল। বলল, 'যাও, এবার বেদৌরাকে দেখাও গিয়ে।'

'হাসবে না?'

'না, খুব ভালই দেখাচ্ছে।'

লায়লা খুব খুশী হয়ে তার নিজের ঘরে গেল, সাজপোষাক করল। আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখল। সত্যি, কি অপূর্বই না দেখাচ্ছে তাকে! হঠাৎ খেয়াল হল ফরিদের কাছে আর একবার যাবে? না, তার লজ্জা করছে! কেমন যেন ভয় করছে!

সোজা চলে এলো বেদৌরার কাছে। এসে তার মুখের ঢাকা খুলল।

বেদৌরা অবাক হয়ে তাকাল। বলল, 'বাঃ! চমৎকার! আম্মাজান দেখে যান, লায়লা কেমন সেজেছে।'

নূরবানু বিবি এসে দেখলেন। বললেন, 'বেশ দেখিয়েছে!'

তারপর তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন।

লায়লা বলল, 'আমি কি সেজেছি, উনি তো সাজিয়ে দিলেন। ছবি আঁকতে বসেছিলেন। আমি কাছে যেতে উনি তুলি দিয়ে এই রকম অবতার করে দিলেন।'

বেদৌরা এবার চুপ করে গেল। নখ খুঁটতে লাগল।

'রাগ করলে আপা?'

'না রে! রাগ করব কেন?'

'তবে মনটা এমন ভারী হয়ে গেল কেন? আমি হতভাগী ঈর্ষার পাত্রী হব এত বড় ভাগ্য আমার হবে? তাঁকে আমি ভাইজান বলি। তিনি বলেন, তুই আমার একটা আছুরে বেড়াল!'

লায়লা চলে গেলে বেদৌরা কিছুক্ষণ তার কথা চিন্তা করল। তার মনের মধ্যে কি ঈর্ষা আসছে, সন্দেহ করছে সে ফরিদকে? রাজপুত্র সে, বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছে। যদিও তার রুচি আছে তবু লায়লার সহজ সতেজ শ্রী আছে। তবে এটাও ঠিক যে লায়লা তার পথের বাধা হতে পারবে না। দৈনন্দিন জীবনের সাময়িক উঞ্ছবৃত্তিব উপাদান সে হতে পাবে কিন্তু ফরিদের সামগ্রিক জীবনকে বাঁধার রশদ কোথায় তার?

বেদৌরা উঠল। হাঁটতে হাঁটতে তার মা'র কাছে এলো। বলল, 'আম্মাজান, লায়লা কি আমার চেয়েও সুন্দরী?'

নূরবানু বিবি হাসলেন। বললেন, 'না মা, তোমার চেয়ে সুন্দরী এই বসরা শহরে আর কেউ নেই বোধহয়। তোমার চোখ ছুটো দেখলে মায়া হয়! কি অপূর্ব্ব ভুরু, নাক, ঠোঁট আর গায়ের রঙ। সারা পৃথিবীর মধ্যে বসরার মেয়েরাই গড়-পড়তা বেশি সুন্দরী তারপর কাশ্মীরের নাম আছে। একটা গোপন খবর তোকে বলি মা, কাউকে যেন বলিস না। তোর আব্বাজান গত রাত্রে আমাকে বলেছেন, জানো বেগম সাহেবা, আমার কি সৌভাগ্য, স্বয়ং বাদশা এসেছিলেন ঠিক মগরেবের পর আমার দোকানে। সাধারণ

পোষাকে এসেছিলেন। সঙ্গে দুজন ছদ্মবেশী সুপুরুষ সান্ত্রী। বাদশার তীক্ষ্ণ মিষ্টি চাহুনি, মধুর বাক্য শুনে বোঝা গেল তিনি খুব উঁচু খানদানী মানুষ। কয়েকটি হীরকের আংটি দেখলেন তিনি। একটি পছন্দ করার পর তোর আব্বা দাম বললেন, পঁচিশ হাজার টাকা—শুনেই তো তিনি কটমট করে তাকালেন। বললেন, বণিক সাহেব, বসরা নগরের আপনি শ্রেষ্ঠ রত্নাকর, আপনার কাছে কেউ ঠকে না কিন্তু আমি গরিব বেচারা আমার প্রেমিকার জন্য একটি হীরকের আংটি কিনতে এসে নিরাশ হয়ে কি ফিরে যাব?'

'আপনি গরিব! জঁাহাপনা আমাকে লজ্জা দেবেন না।'

'তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছেন!' বাদশা মৃদু হাসলেন। খানাপিনা সরবৎ দেওয়া হল। তিনি আংটিটা আঙুলে পরলেন। একটা কাগজে পঁচিশ হাজার টাকার রশিদ লিখে নিজের নাম দস্তখত করে দিলেন। সেই রশিদ নিয়ে সালাম জানালেন তোর বাবাজী। কিন্তু যাবার সময় বাদশা আরিফ আংটিটা আঙুল থেকে খুলে তাঁর হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'বাদশার তরফ থেকে এটা আপনার নবাগতা সুন্দরী কন্যা বেদৌরাকে উপহার দিলাম।' বলে হেসে তিনি চলে গেলেন। এখন কি হবে মা? বাদশার কানে উঠে গেছে তোমার সংবাদ। ইমরাদের বাবা হয়তো জানিয়েছেন। অথবা এই শহরের অন্য কেউ। বাদশা থাকেন বাগদাদে—এত তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে সংবাদটা পৌঁছে গেল!'

বেদৌরা বসে পড়ল। না, তার কপালে সুখ নেই। শিশুকাল থেকেই সে দুর্ভাগিনী!

বেদৌরা বলল, 'কি হবে তাহলে আম্মাজান?'

'সেইটাই তো ভাবনার কথা!'

'ফরিদের কোনো ক্ষতি করবেন না তো?'

'উঁ! না, ক্ষতি করবেন কেন? তবে বাদশা আরিফ যখন ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছেন, তখন একজন সান্ত্রী তোমার আব্বার হাত ধরে হঠাৎ কাছে টেনে বললেন, 'বহুৎ ভাগ্য আপনার, বাদশার

শ্বশুর হবেন কিন্তু সাবধান, বিদেশী ছদ্মবেশী কোনো রাজশত্রুকে আশ্রয় দেবেন না।'

বেদৌরা উঠে পড়ল। বলল, 'ফরিদকে এসব এখনি জানানো দরকার! সে রাজপুরুষ। এসব ব্যাপারে কি করতে হয় নাহয় তারই বেশি জ্ঞান আছে। আব্বাজান যেন হতবুদ্ধি হয়ে রশিদটা ভাঙাতে না যান এখনি। অথবা যাবেন কিনা ফরিদের সঙ্গে যুক্তি করা দরকার। নাহয় এই সভ্যতাব পীঠস্থান বসরা ত্যাগ করে আবার আমবা আববের সেই মরুস্থানে পীরেব দরগায় চলে যাব। নতুবা হিন্দুস্তানের দিকে। পথে পথে আমরা ভিক্ষা করব। রাজার আংটি আমি চাই না।'

'উত্তেজিত হয়ো না মা। কাউকে এসব কথা বলো না এখন। তোমার আব্বাজান ফিরে আসুন, তার সঙ্গে যুক্তি কবে দেখি, কি করা যায়।'

'না আম্মাজান, দেরি করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রতিটি মুহূর্তের দাম এখন অনেক। দেরি করলে আমাকে তলব পাঠাবে আর হয়তো ফরিদ বিদেশী গুপ্তচর বলে বন্দী হয়ে যাবে। ফরিদকে সাবধান হবার সময়টুকু পর্যন্ত আমরা দেবো না? কালই নাহয় আমাদের সাদীর ব্যবস্থা করে দিন।'

'তা হয় না মা। বাদশা স্বয়ং যখন প্রস্তাব করে গেছেন তখন তোমার আব্বাজানের ধড়ে কি দুটো মুণ্ডু আছে যে একটা দিয়ে নিস্তার পাবেন?'

'আমি পাগল হয়ে যাব আম্মাজান, এই সংসার জীবনের জটিল সংঘাতের মধ্যে বেঁচে থাকার চাইতে আমার সেই সন্ন্যাসিনীর জীবন ভাল ছিল। হায় আল্লা! আমাকে বাঁচাও, কেন তুমি আমাকে প্রলোভন ভরা চেহারার সুন্দরী নারী তৈরি করলে? আমি ফরিদের কাছে যাচ্ছি আম্মাজান।'

বেদৌরার মনে হল তার মাথার আহত স্থানের যন্ত্রনাদি সমস্তই সেরে গেছে এখন।

সে ইচ্ছে করলেই ফুঁ দিয়ে সেই অত্যাচারী কুলাঙ্গার ভাইবোন দুটিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারত! সে যে বড় সতী-সাধ্বী মেয়ে, জীবনে কোন কিছু পায় নি এখনো। হায় তার দুর্ভাগ্য!'

ফরিদের বিলাপ শুনে বৃদ্ধা সালেমা বেগম একটি রুপোর পাত্রে জল আনালেন। তার মধ্যে বাঁ হাত ডুবিয়ে রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ আরবীতে কি সব মন্ত্র পড়তে লাগলেন। জাহেদা একটা চার কোণা কালো কুচকুচে মসৃণ পাথর হাতে করে নিয়ে বসেছিল পাশেই।

সালেমা বেগম ইসারা করতে পাথরটাকে আস্তে আস্তে জাহেদা ডুবিয়ে দিলে রুপোর পাত্রটার মধ্যে।

জলটার রঙ কিছুক্ষণের মধ্যে কালো হয়ে গেল। বৃদ্ধা বললেন, 'ফরিদ, এবার তুমি উপরোপরি দুটো হাত রেখে ভাবো তোমার সেই মানসী বা ভাবী পত্নী বেদৌরাকে। ভাবো, সে যেন তোমার সামনে এই জলতর্পণের মধ্যে এসে প্রতিভাত হয়।'

কিছুক্ষণ পরে মনো-সংযোগ করতে পারল ফরিদ। তার আগে তার মনে যেসব ছবি ভেসে গেল দ্রুত গতিতে তার ছবি ফুটতে লাগল সামনের জলতর্পণের ওপরে। খুবই আশ্চর্য তো! কখনো জাহেদা, কখনো সেই মোটা হাবসী, কখনো খালাআম্মা, হঠাৎ নীলোফার, তারপর তার ঘোড়া, শেষে বেদৌরাকে দেখা গেল। তার মাথায় বাঁধন। শয্যায় শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে সে।

জাহেদা বলল, 'এই বেদৌরা?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ সুন্দরী তো!'

সালেমা বেগম হাত নেড়ে নেড়ে পাত্রটার ওপরে কিছুক্ষণ কি যেন বলতেই বেদৌরার শরীর থেকে আলো বের হতে লাগল। ঘরের বাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন তিনি। বেদৌরার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখা গেল। অপরূপ সুন্দরী নারী!

খালাআম্মা বললেন, 'না, খ্যাঁচ আসে নি। আসবে না মনে

হচ্ছে। দেখো বাছা ফরিদ, তুমি ভাগ্যবান। এই মেয়ে আদৌ অসতী নয়। অসতী হলে ওর জ্যোতির্ময়ী রূপ দেখা যেত না—মাঝে মাঝে কালো কয়লার মতো ছাপ পড়ত। আমি এবারের আগের বারে পারশ্যের রাজবাড়িতে যাই। রাজকুমার শাহ পারভেজ তাঁর নবতমা পত্নী সারার জীবনে কলঙ্ক আছে কিনা জানতে চেয়ে আমাকে জলতর্পণ করতে অনুরোধ করেন। আমি সারার চোখ-মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখে ঘাবড়ে যাই এবং জলতর্পণ করতে নিষেধ করি। বলি যে এতে সারার ক্ষতি হবে। কেননা সে গর্ভবতী হয়েছে।'

'সারা মা হতে চলেছে?'

'হ্যাঁ, তুমি তাকে জানো মনে হচ্ছে?'

'জানি মানে? সে যে আমার শালী! আগের স্ত্রী নীলোফারের যমজ বোন।'

'নীলোফার কোথায়?'

'সে মারা গেছে! একটু আগেই তাকে দেখা গিয়েছিল! তাহলে বেদৌরা ভাল আছে খালাআম্মা? কোনো কিছু হবে না তার?'

'মনে হচ্ছে, না, তেমন ভয় নেই। তবে জাগ্রত অবস্থায় তো দেখতে পাচ্ছি না। তবু আমি ওষুধ দেবো।'

জলতর্পণ ভেঙে ফেললেন সালেমা বেগম।

নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে গেল ফরিদ। খালাআম্মা কিছুক্ষণ তার মাথায় হাত বুলোলেন। তারপর বললেন, 'পাশের কামরাতেই জাহেদা রইল, রাত্রে যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় ডেকো। একা বের হয়ো না। গোপন পাতকোঁয়া আছে। পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য।'

'কোথাও আমার যাবার প্রয়োজন হবে না বোধহয়। আপনি ঘুমোন গিয়ে, পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরেছেন।' কোমর থেকে তবিলটি খুলে পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রা দিলে সে খালাআম্মার হাতে—তিনি তা আদৌ নিলেন না।

অনেক রাত্রে হঠাৎ কার যেন স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল ফরিদের। চোখ মেলে দেখল, জাহেদা। তার মাথার ধারে বসে আছে। মাথায় হাত বুলোচ্ছে। তার হাত ধরল। বলল, 'কিরে বুড়ী! তুই ঘুমুস নি?'

'ঘুম পাচ্ছে না! আপনার মাথায় হাত বুলোই, আপনি ঘুমোন।'

ফরিদ বলল, 'তোর এবার একটা বিয়ে দেওয়া দারকার। এমন একটা ছেলে দেখে আনব, দেখিস, দেখে তোর চক্ষুস্থির হয়ে যাবে।'

কাঁধের ওপরে একমাথা চুল সমেত মুখ লুকোল জাহেদা। গালে গাল চেপে শুধোল, 'কবে?'

'দুষ্টু মেয়ে! যা, শুয়ে পড় গিয়ে। নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা হবে। এই বাগ-বাগিচা, ঘরবাড়ি সব পাবি, তোর একটু পায়ের দোষ তো কি হবে?'

'আশায় থাকব। যাচ্ছি আমি। দোহাই, দাদীকে যেন বলবেন না।'

জাহেদা চলে গেল।

ঘর অন্ধকার প্রায়। ক্ষীণ একটু আলো জ্বলছে দূরে—কুলুঙ্গির ওপরে।

জাহেদার কথা কিছুক্ষণ ভাবল ফরিদ।

বেচারা!

ঘুমিয়ে পড়েছিল ফরিদ।

ভোরের দিকে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হল। জাহেদা জানলাগুলো বন্ধ করে দিতে এলো। বেশ শীত করতে লাগল। লাল রঙের একটা পশমী কম্বল এনে দিতে আপাদমস্তক মুড়ি দিল ফরিদ।

কিছুক্ষণ পরে গরম রুটি, হালুয়া, দুধ এনে দিতে মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল ফরিদ। জাহেদা তাকে খাইয়ে দিতে লাগল।

মাসী এসে বসলেন। বললেন, 'বাবা ফরিদ, আজ তুমি থেকে যাও, আকাশে বড় দুর্যোগ।'

'হ্যাঁ চাচাজী, আজ থাকুন।'

'অসম্ভব। আমি একটা উদ্বেগ নিয়ে আছি। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।—এই মেয়েটা বড় লক্ষ্মী, খালাআম্মা এর এবার বিয়ে দিন।'

'দেখো না বাবা একটা ছেলে। সবই ও' পাবে, কে আর আমার আছে? ও জনম-হ্যাংড়া, রোগ থেকে তো হয় নি।—এই সাদা সাদা গুঁড়ো ওষুধগুলো খাইয়ে দেবে। যদি খ্যাঁচ নাও আসে তো কিছু হবে না। এটা খেলে পাঁচ বছরকাল আর কাটাকুটি থেকে ধনুসটঙ্কার রোগ হবে না।'

বেলা আটটার পর ঝড়বৃষ্টি কমে গেল।

ফরিদ বের হতে চাইল। খালাআম্মা তাকে খেযে যেতে বললেন। মোরগ-পোলাও তৈরি হচ্ছে। ভারতের সরু দেরাদুন চাল ছিল, খাঁটি ঘি আছে আর বাড়ির তাজা মোরগ।

কাজেই আরো দু'ঘণ্টা কাটল। ফরিদ জানলা দিয়ে বৃষ্টি-ধোয়া চকচকে-রোদে-হাসা খেজুরকুঞ্জ দেখতে দেখতে আহার সমাধা করল। উটের কাফেলা চলেছে পথ দিয়ে।

বিদায় নেবার আগে একটা ঝোলার মধ্যে অনেক কিস্‌মিস, খোরমা আর ডালিম, আপেল দিয়ে দিলেন মাসীমা।

ঘোড়ায় ওঠার পর জাহেদা কাছে এসে ফরিদের পায়ের ওপরে গাল রাখল। তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করল ফরিদ।

মাসীমা বললেন, 'তোমার মাকে দেখার আশা রইল ফরিদ। আমার কথা বলো, সম্ভব হলে তাকে এখানে একবার আনবে। আর বিয়ের সময় তোমার খালাকে মনে থাকবে তো?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়। চলি এখন খালাআম্মা।' ঘোড়াকে চলার জন্যে ইংগিত করল ফরিদ। পট পরিবর্তন হয়ে চলল। পথে-ঘাটে মানুষ। তার দিকে তাকায়। বোরখা ঢাকা মেয়েরা যাচ্ছে

পাড়াগাঁয়ের পথে। কোথাও দ্রাক্ষাকুঞ্জ খেজুরকুঞ্জে চাষীরা কাজ করছে। ফল সংগ্রহ করছে কেউ কেউ।

মোসুল শহর পার হয়ে বাগদাদে আসতে তার পরদিন দুপুর হয়ে গেল।

ঘোড়াটার এবং তারও একটু বিশ্রাম দরকার। ইমরাদ হোসেনদের বাড়ি যাওয়া যায় কিনা ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। বর্ণাঢ্য শহর। লোকজন। যানবাহন। দোকান-পাট। কেনাকাটা। ভিড় এড়িয়ে সে যখন শহরের প্রান্তদেশে ইমরাদদের পাড়াতে এসে পৌঁছল প্রধান সড়ক দিয়ে সহসা দশ-বারোজন সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে ইমরাদ তাকে ঘিরে ফেলল। অনেকটা নির্জন পল্লী এদিকে। দূরে দূরে সবুজ বাগানের মধ্যে অট্টালিকা। পাহাড়ী অসমতল জায়গা।

দাঁড়িয়ে গেল ফরিদ। যদিও সে ক্লান্ত, তবু ইমরাদ হঠাৎ যেন তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে এনে দিল। ইমরাদ হেঁকে বলল, 'এবার কোথায় যাবে বন্ধু! পথে আমাকে একাকী পেয়ে বড় নির্যাতন করেছিলে! আমার বোনটাকে নিয়ে চলে এলে কিন্তু জানতে কি আমার কত দুর্দশা হয়েছিল পাগলের মতো আহত অবস্থায় ফিরে আসতে?'

ফরিদ চুকচুক করে শব্দ করল, 'জ্ঞানবুদ্ধি আর হল না!' হঠাৎ চিৎকার করে শুধোল অন্যান্য অশ্বারোহীদের, 'তোমরা কি এর ভাড়াটে গুণ্ডার দল?'

'আমরা ওর বন্ধু, ওর অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাই।'

'তাহলে এসো, কার আগে মরার প্রয়োজন আছে? বাদশার দরবারে আমি জানাব যে তাঁর রাজ্যে পথে-ঘাটে আরোহী যাত্রীদের আক্রমণ করে ইমরাদ হোসেন অশান্তি ঘটাবার একজন বড় দরের পালোয়ান হয়ে উঠেছে...'

চারদিক থেকে কৌতুক দেখবার জন্যে লোকজন বেরিয়ে পড়ল।

ইমরাদ তলোয়ার হানতে ফরিদ বাধা দিল। কিন্তু মুহূর্ত না যেতেই দেখা গেল ইমরাদের তলোয়ার ছিটকে পড়ে গেছে। আর তলোয়ারের উল্‌টো পিঠের জোর আঘাত পেয়ে মাথা চেপে ধরে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে।

জনসাধারণ তখন উল্লাস জানিয়ে ফরিদকে বাহবা দিয়ে উঠল। তারা যেন এই অত্যাচারী ছোকরার দলবলটাকে একেবারে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারলেই আনন্দ পায় বেশি এমন ভাব-ভঙ্গী করতে লাগল।

ফরিদ এদের উচিত শিক্ষা দেবে। ঘোড়া ছোটাল সে। ঘোড়াটাও বেশ শিক্ষিত। শত্রুর আক্রমণ বাঁচাতে এবং তাকে চাট মেরে জখম করতে সে বেশ ওস্তাদ। তলোয়ার ছোটানোর গতিভঙ্গী দেখে আহত কয়েকজন ভোঁ দৌড় দিল। আসলে ওরা ছিল সব ক'জনই আনাড়ী, যুদ্ধবিগ্রহ তেমন ভাল করে শেখেনি।

মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল। ফরিদ ঘোড়া নিয়ে চক্কোর দিয়ে মানুষ-জনদের কাছে গেল। বলল, 'আপনারা আমার অপরাধ নেবেন না, এই অত্যাচারী ছোঁড়া এবং তার দলবলটা কি এমনি করে পথচারীদের আক্রমণ করে? তাদের আপনারা শায়েস্তা করতে পারেন না?'

হঠাৎ দীলরুবা ছুটে বেরিয়ে এলো। তার ভাইয়ের দুরবস্থা দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'ভাইয়া, একি তোমার দুর্মতি! আসুন ফরিদ ভাই, আমাদের বাড়ি আসুন।'

নেমে পড়ল ফরিদ। ঘোড়াটাও তার পিছনে পিছনে চলতে লাগল। ফরিদ এসে ইমরাদের হাত ধরে টেনে তুলল। দীলুও ধরল তাকে। কানের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে ইমরাদের।

ফরিদ বলল, 'দেখলে তো, আমি একজন প্রকৃত যোদ্ধা এবং দশ হাজার সৈন্যকে আমি পরিচালনা করবার ক্ষমতা রাখি। আমি ইচ্ছে করলেই সেনাবাহিনী গড়ে নিয়ে গিয়ে ভারতের সিংহাসন থেকে শাহজাহানকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাদশা হয়ে বসতে পারি।'

দীলরুবা হাত ধরে অনুনয় করল ফরিদের তাদের বাড়ি যাবার জন্য।

লোকজন এসে পড়ল প্রচুর।

'আব্বাজান, এই যে ভাইয়া, চোট খেয়ে গেছে, ইনি যুবরাজ ফরিদ, কাল আমি এর ঘোড়ায় এসেছি, খালাআম্মার জামাই হবেন ইনি।'

ফরিদ দেখল দামী পোষাকপরিচ্ছদ-পরা সুদর্শন একজন বৃদ্ধ তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। ফরিদ শুনেছিল, ইমরাদের বাবা খেতাবী রাজকর্মচারী, বোধহয় সৈন্যবাহিনীর কি যেন একজন।

তিনি বললেন, 'খুকীর কাছে আপনার পরিচয় ইতিপূর্বেই পেয়েছি। আমার দুষ্টু ছেলেটাকে শায়েস্তা করে ভাল কাজই করেছেন। ও একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বাপ ওর বড় রাজচাকুরে বলে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আসুন, আমার আশ্রমে একটু বিশ্রাম করে যান।'

ফরিদ কি ভয় পেয়েছে? যাবে না ওদের বাড়ি? খাদ্যে তার বিষ দিতে পারে? অথবা তালে পেয়ে মেরে দেবে? বন্দী করবে?

এদিকে তাড়াতাড়ি যাওয়াও তো দরকার।

তবু গেল সে ইমরাদদের বাড়িতে। বর্ণাঢ্য চকচকে বৈঠকখানা। আরামকেদারা। দেওয়ালে হরিণের শিং, ঢাল, তলোয়ার আর চিত্রপট। আলমারীতে বইপত্র। দীলরুবা দারুণ খুশী। দৌড়াদৌড়ি করে সে ফরিদের জন্য নাস্তাপানি আনল।

তার মা একবার মাত্র দেখে গেলেন ফরিদকে চিকের আড়াল থেকে। ইমরাদকে নিয়ে তিনি অন্তঃপুরেই রয়ে গেলেন।

দুপুরের আহারাদি করতেই হল ফরিদকে।

একসঙ্গে খেতে বসলেন ইমরাদের বাবা আলীজান বিন আবুবকর। তিনি তাঁর পুরোনো জীবনের অত্যন্ত দরিদ্র দশার কথা

বলতে লাগলেন। তাঁর বাবা নাকি তাঁর হাত ধরে একদা ভিক্ষা করতেন। তিনি মারা গেলে ভিক্ষালব্ধ সঞ্চিত টাকাগুলো বালিশের মধ্যে থেকে ঢেলে নিয়ে তিনি তরমুজ ব্যবসা করতে লাগলেন—তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর। অন্ধ আতুর মা-ও মারা গেলেন কিছুদিন পরে।

তারপর টাকা হল। এরা হল। বাগান কিনলেন! আঙুর-খেজুব-ডালিম বিক্রি হতে লাগল তাঁর বাগা॰ থেকে। তারপর ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশটি বাগানের মালিক হয়ে গেলেন তিনি। শুধু কড়ারী বন্ধকে তিনি বাগান নিতেন—আর ছাড়াতে পারত না লোকে। বললেন, 'সময় পার হবার আগে যদি কেউ বাগান অন্যের কাছে বেচে টাকা এনে ছাড়াতে যেত তাহলে আমি আমাব এক উজির বন্ধুর সাহায্য নিয়ে তাকে জেলে ঢোকানোব ভয় দেখাতাম। আমি বিয়ে করলাম বড় বাড়িতে। তারপর রাজপুরুষদের সঙ্গে উজির বন্ধু পরিচয় করিয়ে দেয়। আমার চেহারা ছিল ভাল। কিন্তু বাদশা আমার সব বৃত্তান্ত শোনার পর ফরমান দিলেন ওটাকে একটা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে দাও—যদি মরে, ওর সম্পত্তি ওর স্ত্রীকে মাত্র সিকি ভাগটা দিয়ে সমস্ত রাজদখলে আনার পর বিলি করে দেবে ভিখারীদের। আর ঐ ভিখারীব পুত্র যদি তিন ঘণ্টা লড়াইয়ের পর প্রাণে বাঁচে তবে ওকে পাঁচ হাজারী সৈন্যের কর্তা করে দেবে।—তাই ব্যবস্থা হল।—খাও বাবা, খাও। আমি ভাগ্যহত মানুষকে ভালবাসি, জানি তুমি বাদশা শাহজাহানের বৈমাত্রেয় ভাই, এবং বোধহয় বিতাড়িত। তোমাকে কান্দাহার রাজ্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু সে শাসনভার তুমি নাওনি, নিলে বোধহয় পারশ্য সম্রাট শাহ আব্বাস কান্দাহার দখল করতে পারতেন না।'

'সে যাক, আপনি আপনার সেই ষাঁড়ের লড়াইয়ের ঘটনাটি বলুন।'

'শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে, না? দেখো মা দীলু, একজন বীর শ্রোতা আজ আমি পেয়েছি। আমার দুর্ভাগ্য, বুনো ষাঁড়কে আমি ক্লান্ত,

পর্যুদস্ত করেছিলাম কিন্তু ঘরের কুঁড়ে ছোকরা, আমার নিজের ছেলেটাকে জব্দ করতে পারছি না। পারি না আর, পারি, ওর মা-ই ওর মাথাটা খেয়েছে, আর ওর বাজে ছেলের দল বন্ধুগুলো। হ্যাঁ, শোনো তবে, খাও খাও, ভেড়ার মাংসের কাবাবটা ভালই লাগছে। এই মুরগীর রানটা নাও—দুপুরে ঠিক যোগ্য মেহমান এলো। তা হল কি জানো বাবা, যদি সুযোগ হত মেয়েটাকে আমি তোমাকে দান করতাম, কিন্তু নীলুর মুখে তো শুনেছি আমার শালীর মেয়ে নাকি অপরূপা সুন্দরী আর ভাইরা ভায়েরও অনেক আছে। তুমি উত্তম কিছু পেলে আমি অসুখী হব কেন? আর এক হিসাবে তুমি তো আমার জামাই-ই।'

ফরিদ হেসে ফেলল। আর খাবে না জানাতে বৃদ্ধ আলীজান বললেন, 'তুমি রাজপুরুষ, তোমাকে আয়ত্তে পাওয়া কঠিন। তোমরা তো খেয়ালা। আজ আছ, কাল নেই। হঠাৎ খেয়াল হল তো সৈন্যবাহিনী গড়লে। যুদ্ধে আমাদের লেলিয়ে দিলে। নইলে একজন রাজা হঠাৎ এই ভিখারীর ছেলেকে বুনো ষাঁড়ের খাঁচার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে রগড় দেখেন? তা, প্রচুর লোকজন জুটলেন। সবাই বড় বড় মানুষ। বর্ণাঢ্য পোষাক; কয়েক হাজার দর্শক। এমন লড়াই প্রায়ই নাকি হয়! আমিও দু-একটা দেখেছি। এক বন্ধু ছিল—সে প্রায় যখনই গল্প করত ঐ ষাঁড়ের লড়াইয়ের গল্প। কি করে ষাঁড় শিং বাগিয়ে তেড়ে এলো, কেমন করে লড়িয়ে তার শিং ধরে গড়িয়ে গেল পিঠের ওপর দিয়ে। কি রকম দর্শকদের হাসি আর হাততালি! তা যাক, আমি ষাঁড় দেখেই ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। বাদশা গোঁফে মোচড় দিচ্ছেন। বন্ধু উজির এগিয়ে এসে সাহস দিতে লাগল। ষাঁড়টা ছুটে তেড়ে এসে আক্রমণ করল আমাকে। আমি তার শিং ধরলাম। তাকে বীর বিক্রমে ঠেলে নিয়ে গেলাম খাঁচার শেষ পর্যন্ত। আবার সে আমাকে ঠেলে আনল এ মাথা পর্যন্ত। দুজনে দুজনের বল কষাকষি করে বুঝলাম যদি বেতালে চোট-চাট্ না হয়ে যাই তো লড়াই চলবে।'

ফরিদ উল্লসিত হয়ে উঠল। বলে উঠল, 'হ্যাঁ, লড়াই চলবে। উঃ! আমি যদি একবার ঐ রকম লড়তে পেতাম। তারপর বলুন খালুজী, শুনতে খুব আগ্রহ লাগছে।'

'লাগবেই তো! সৌভাগ্য আমার যে তোমাকে সুস্থ অবস্থায় পেয়েছি। যদি ছেলেটা তোমার ক্ষতি করত—এক তো বিনা অপরাধে বেদৌরার মাথায় তলোয়ারের কোপ বসিয়ে এসেছে। দেখো, তোমার ক্ষমতা ছিল, ওকে তখনি মেরে ফেলতে পারতে। ওটা একটা কুত্তা—ছেলে হলে কি হবে! আমার দুর্নাম! জীবনে ও একটা ভাল কাজ করেছে বলে শুনিনি। ও হল চোর, বদমাস। ওর নামে রাজদরবারে অনেক অভিযোগ গেছে—শুধু আমি ওকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছি। আমি অপরাধী। ওকে এত বলি কিন্তু শোধরায় না। তা তুমি যদি এক তলোয়ার মেরে…যাক গে, হ্যাঁ, ষাঁড়টা হঠাৎ এক ঝোনা মেরে আমাকে ছাড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করল। আমি মরণপণ ধরে আছি, হঠাৎ ছেড়ে দিলাম। তারপর ঝুল কাটাকাটি। আমি শব্দ করছি। বু-বু বু—আও-আও-আও—হঠাৎ তার ল্যাজ ধরলাম তারপর ছুটোছুটি। লোক হাসছে। বাহবা বাহবা। ষাঁড়টা হঠাৎ লাথি ছুড়ল। বললাম, এই শালা, বেআইনী, রাজার ষাঁড় অশিক্ষিত! এবার বোধহয় ছ্যারাবে। গল গল করে গোবর বার করবে! আমার বাবার হাত ধরে ভিক্ষা করতাম। পরে তরমুজ কিনলাম বালিশের ভেতরের টাকা বার করে নিয়ে। একটা বাগান কিনলাম। অনেক গরিব লোকের বাগান বন্ধকে রেখে আত্মসাৎ করলাম। এখন আমি বউ করেছি। সুন্দরী বউ। বড়লোকের মেয়ে। যদি মরে যাই সে বিধবা হবে। আর রাজা সদয় হয়ে হয়তো তাকে এই ষাঁড়ের সেবা করাবেন। আমি হেঁকে হেঁকে কেটে কেটে বলছিলাম আর হঠাৎ ষাঁড়ের পিঠের ওপরে উঠে বসলাম। সবাই হাততালি দিল। রাজা চুপ! ষাঁড়টা শিং মারতে যেতে আমি উল্টে যেই না পিছন দিকে পড়ে গেলাম মারল এক লাথি। এবার আমাকে মোক্ষম জোর লাগল।

কেটে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। আমিও ক্ষেপে গেলাম। যুদ্ধ এবার! কে কাকে মারতে পারে। শিং ধরে আমি ঠেলে নিয়ে যাই তো ষাঁড় আমাকে ঠেলে এনে লোহার খাঁচার গায়ে চেপে ধরে নিকেষ করে দেবার কল্। হঠাৎ কোনোক্রমে টেনেটুনে বের হয়ে পড়েই ষাঁড়টার মুখ ধরে জোরে তুলে ধরলাম ওপর দিকে। ষাঁড়টা পাক খেয়ে পড়ল ধড়াম করে মাটিতে। আমি তার মাথাটা মুড়ে ধরে রইলাম। ষাঁড় আর উঠতে পারে না। রাজা হাত তুললেন। অর্থাৎ আলীজানের জিত! আমাকে বাইরে আনা হল। বহু লোক দেখল। করমর্দন করল। কিন্তু রাজকন্যা তার ওড়না দিয়ে আমার ঘাম আর রক্ত মুছিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা একবার হাওয়াও করল না। আমি পাঁচ হাজারী সৈন্যবাহিনীর নায়ক হয়ে গেলাম।—এবার আমার ছুটি হবে। কিন্তু ছেলে কই এখনো যোগ্য হল?'

আলীজানকে খুব ভাল লাগল ফরিদের।

দুপুরে বিশ্রাম করার পর বিকেলে বেরুবার সময় সে ইমরাদের কাছে গেল। তার মাথায় হাত দিল। ইমরাদ হাত চেপে ধরল। বলল, 'আর শত্রুতা নয়, শপথ করছি।'

'তুমি আমার ভাই, ভাল হও, মানুষ হও। তোমাকে আমার দরকার হতে পারে। আজ আমি চলি খালাআম্মা।'

'এসো বাবা!' বললেন ইমরাদের মা।

দীলরুবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো ফরিদ।

বসরায় পৌঁছতে তার সকাল হয়ে গেল।

॥ বত্রিশ ॥

দাসী ছুটে এসে জানাল বেদৌরাকে, 'আম্মাজান, উনি ফিরেছেন —ওবাড়িতে—ঘোড়া আর উনি ঘামে ভিজে গেছেন!'

বেদৌরা 'এসেছেন'—বলে উত্তেজিত হয়ে উঠে বসতে গেলে নূরবানু বিবি তাকে চেপে ধরে শুইয়ে দেন। বলেন, 'ওকে আসতে দাও—উত্তেজিত হয়ো না মা।'

মাথার কাটা ঘা-টা যেন সহসা চিড়িক মেরে উঠল। নূরবানু বিবি গায়ে-মাথায় কাপড় দিয়ে সংযত হয়ে বসলেন।

জানালা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন রুস্তম ঘোড়ার লাগাম ধরে সসম্মানে এগিয়ে আনছে ফরিদকে।

ফরিদ বীরমূর্তিতে সোজা বসে আছে ঘোড়ার পিঠে।

বাগানবাড়ির সামনে এসে ঘোড়া দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দ্রুত নেমে পড়ে বেদৌরাকে দেখার জন্য রক্তবর্ণ সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠতেই নূরবানু বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

কুর্নিশ জানাল ফরিদ। শুধোল, 'আম্মাজান, বেদৌরা কোথায়, কেমন আছে সে? আমার যথেষ্ট দেরি হয়ে গেল। বেশ দূর পথ…'

'এসো বাবা, তোমার ঘরেই ও এখনো আছে। একটু সুস্থ, তবে রাত্রে ঘুমোতে পারে না। ব্রহ্মতালুর মধ্যে নাকি আগুন ফুটছে। এই যে মা বেদৌরা, আমার সোনামণি, চোখ তুলে দেখ তো, কে এসেছে!'

বেদৌরা আস্তে আস্তে তার অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটোর পাতা খুলল। প্রথমে দেখতে পেল ফরিদের জুতো তারপর আস্তে আস্তে

দেখল তার মলমলের ইজের। আর বর্ণাঢ্য রেশমের আচকান। কোমরে তরবারী। প্রশস্ত. বুক। দুধে-আলতা রঙের হাত। গলায় কত ঘাম। সুন্দর চিবুক আর রক্তবর্ণ পরিপূর্ণ নিটোল ঠোঁট। নিখুঁত গঠনের কলাকুশল নাক। তারপর সেই চোখ। নীলাভ যার কোরক আর ঈষৎ পিঙ্গল অত্যুজ্জ্বল তারা। তারপর সবই কাঁপতে লাগল অশ্রুধারার মধ্যে। চোখ বন্ধ করল বেদৌরা।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখের জল মুছিয়ে দিতে গেলে নূরবানু বিবি হাত তুলল। যেন বাধা দিতে চান।

বললেন, 'ফরিদ তুমি আগে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও। বিশ্রাম করো।'

ফরিদ বুঝল, হ্যাঁ, নিশ্চয়, ঘোড়ার সাহচর্যে ছিল সে, গায়ে তার ঘোড়ার ঘামের গন্ধ। যা বিষাক্ত হতেও পারে।

ঝোলাটা নামিয়ে খালাআম্মার দেওয়া ওষুধগুলো বার করতে গেলেও নূরবানু বিবি বাধা দিলেন, 'ঠিক আছে। তুমি শান্ত হও। গোসলখানায় যাও। কাপড়চোপড় ছাড়ো।'

হাসল ফরিদ। হঠাৎ দেখল বেদৌরাকে। চোখে চোখ পড়তেই সে শিশুর মতো মুখ লুকোল।

গোসলখানায় আসতে তার জামাকাপড় খুলে দিতে এলো একজন নতুন সুন্দরী মতো যুবতী দাসী। বেদৌরার সেবাযত্নের জন্যে আনা হয়েছে বোধহয় ওকে।

ফরিদ শিষ দিয়ে উচ্চতানে কি একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে গোসলখানায় যাবার আগে হঠাৎ দেখল তার শোবার ঘরের বিছানার ওপরে পশ্চিম জগতের বিদেশী একটা বাজনা।

সেটা তুলে নিয়ে দেখল। রিড টিপল তার সব একসঙ্গে। অকস্মাৎ সমুদ্রগর্জনের মতো শব্দে দাসীটা ভয় পেয়ে গেল।

হাসল ফরিদ।

বেলো টেনে বাজাতে লাগল সে। এই বাজনা সে রো সাহেবের ঘরে দেখেছিল। সাহেব শিখিয়েছিলেন তাকে বাজাতে।

দাসীটা আড়াল থেকে দেখতে লাগল।

নূরবানু বিবিও দেখতে এলেন। দেখলেন, ফরিদ অল্প একটু অন্তর্বাস পরে প্রায় নগ্ন শরীরে একাই অঙ্গভঙ্গী করে সারা ঘরখানায় ঘুরে ঘুরে অপূর্ব সুন্দর এক সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে নাচছে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সরে এসে মাথা নিচু করে সুরধ্বনিটা শুনতে লাগলেন তিনি।

হঠাৎ দেখলেন, বেদৌরা উঠে এসেছে। তাকে জড়িয়ে ধরলেন নূরবানু বিবি। বললেন, 'উঠে এলি মা এই ছাখ। পটিটা আবার কাঁচা রক্তে ভিজে গেল!'

বেদৌরার দাসী লায়লার মিটিমিটি হাসি দেখে মুখ বাড়াল জানলার মধ্যে দিয়ে। অপরূপ লাস্যভঙ্গী দেখতে পেল সে, ফরিদের প্রায় নগ্ন সুগঠিত সুপুরুষ চেহারা।

হঠাৎ বাজনাটা বন্ধ করে দিয়ে গোসলখানায় চলে গেল ফরিদ। ফোয়ারার নিচে দাঁড়িয়ে সে ভিজতে লাগল। শরীর শীতল হল। সে পাগলের মতো বকতে লাগল: 'ইমরাদ হোসেনের বাবা—যাচ্চলে, কি নামটা যেন, ভুলেই গেলাম, লোকটা ভাল, ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচল? স্পেন দেশে যে ষাঁড়ের লড়াই হয় সে ষাঁড়ের বিদ্যুৎগতি! শিং মেরে তলপেট ফাটিয়ে দেয়। খালু বেঁচে গেল! শেষে একটা তলোয়ার দিতে সেটা নিয়ে তারবেগে, সেও ছুটল, ষাঁড়ও ছুটে এলো। ষাঁড়টা পড়ে গেল আর উঠল না। শত শত লোকের হাততালি! বীর বটে! আর সেই লোকের ছেলে ইমরাদ! ফুঃ! খালুর মতো যদি আমি হতাম? এমনি করে তলোয়ার ধরে গুঁজে দিতাম! উরে শালা! লাগল হাতটায়। ভাবী শ্বশুর আমার শ্বেত পাথর দিয়ে গোসলখানা গেঁথেছেন!...'

বাইরে এসে পোষাক পরে বেদৌরার কাছে এলো ফরিদ। তার হাতে হাত দিল। বলল, 'বেদৌরা, কেমন আছ এখন?'

'ভাল। তোমার খুব কষ্ট হল অতদূর যেতে।'

'ইস্! রক্তে যে ভিজে যাচ্ছে। দাঁড়াও, আমি আগে দাওয়াই লাগিয়ে দিই।'

'তুমি আগে নাস্তা করে নাও—এখানে আমার সামনে বসে।'

লায়লা খাবার আনল। নূরবান্নু বিবিও এলেন।

ফরিদ দাওয়াই দিল। খাওয়াতে এবং লাগাতে বলল। খেতে বসল ফরিদ।

নূরবান্নু বিবি পটি খুলতে ফরিদ কাটা জায়গাটা দেখল। গুঁড়োগুলো বসিয়ে দিলেন নূরবান্নুবিবি।

'ইস্, জ্বালা করছে যে!' বলল বেদৌরা।

'মনে পড়ে চিতাবাঘে কামড়ানো ক্ষতস্থানে তুমি কি দাওয়াই লাগিয়ে দিয়েছিলে, জ্বালায় আমি ছটকে ছিলাম সেই পীরের মাজারের হোজরায়!' বলল ফরিদ।

'সেই ওষুধটা যদি থাকত এখানে!' হতাশ স্বরে বলল বেদৌরা, 'সাপে কাটলে, বাঘে কামড়ালে কিম্বা কেটে-ছিঁড়ে গেলে আমরা ওষুধটা দিতাম। বাহুপীর তৈরি করেছিলেন।'

'তোমার মন কেমন করে না সেই মাজারের জন্যে?'

ফরিদের চোখের দিকে তাকাল বেদৌরা। মৃদু হাসল সে। তারপর জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল সে বাগানের দিকে।

ফরিদ বুঝল, শুধুই ওর গোলাপ, ঝাউ আর দেবদারু কুঞ্জের দিকে দৃষ্টি; চোখে কিন্তু শূন্যতা; মন খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই পটভূমি—দূর বিস্তৃত মরুভূমি, বালির ঢেউ লাগা পাহাড়, মরুদ্যান, খেজুরবন' দ্রাক্ষাকুঞ্জ, পীরের মাজার আর নিভৃত হোজরা।

'তোমার ঘরে সেই ছবি একটা টাঙিয়ে দেবো বেদৌরা, সেই মরুদ্যান, পীরের মাজার।'

'দেবে। তুমি তো খুব ভাল আঁকতে পারো, দাও না গো এঁকে!' হাত ধরল বেদৌরা।

'পারবে তুমি আঁকতে? মরুভূমিতে সন্ধ্যা নামছে, পাক-খাওয়া বালির ঝড় উঠল, ঘোড়া ছুটিয়ে কোনো এক শেখজাদা 'বেদুইন

সর্দারকে ঘায়েল করে তার হাত ধরে টেনে তাঁবুতে আনল। শেখজাদার তরুণী স্ত্রী আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। স্বামীকে আলিঙ্গনপাশে বেঁধে তার কাঁধে মাথা রেখে যখন বলছে, কি হত, যদি ঐ দস্যুটা আমাকে লুটে নিয়ে যেত, তখনি হঠাৎ চোখ পড়ে সে চমকে উঠল, একি! এযে সেই সারোয়ার—যার কাছে তার মন বাঁধা পড়েছিল এক সময়!'

ফরিদ বেদৌরার হাতখানায় ঠোঁটের স্পর্শ দিল। বলল, 'চমৎকার তোমার পরিকল্পনা। আমি আঁকব। খুব অনুপ্রেরণা পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, তুমি আঁকবে কিন্তু খণ্ডচিত্র নয়। ধর, একটা যেন বই, একটা উপন্যাস যেমন হয়, চিত্রে কাহিনী চলবে। এক দুই করে সংখ্যা দিয়ে যাবে। বলো আঁকবে?'

'কিন্তু কাহিনী তোমার। আর সেসব আমাদের পবিত্র সাদীর পর।'

'কিন্তু কথা দাও, তুমি পালাবে না? তোমাকে পাবার পর কেবলই আমার মন বলে, তুমি কোথাও একদিন চলে যাবে, কেন এমন মনে হয় বলো তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফরিদ। নীলোফারের কথা তার মনে পড়ল। সেই নীল মেঘের দেশের সোনার ডানা মেলা রুপোর পরীটা আজ কোথায় গেল কে জানে!

'কি ভাবছ! আমার কাছে চিরকাল থাকবে?'

ফরিদ অন্যমনস্ক। তার গত জীবনের অনেক ছবি ভেসে গেল মনের পর্দায়। সবই যেন অবাস্তব অলৌকিক!

এই বেদৌরাও কি বাস্তব?

এও তো একটা রুপোর পরী। জ্যোৎস্নার পুঞ্জীভূত প্রতিমূর্তি। কোমল কঠিনের সমন্বয়। বেদৌরার চোখে আর ঠোঁটে যখন প্রেমের হাসি তখন যেন সে লাস্যময়ী কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে পুরুষ বেশে যখন তলোয়ার ঘুরোয় তখন বোধহয় অন্য মূর্তি।

বেদৌরা চমৎকার গান গাইতে পারে। বাজনা বাজাতে পারে।

ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাতে পারে! ঝড়বৃষ্টি নামাতে, বজ্রপাত ঘটাতে, মাটি বিদীর্ণ করে প্রস্রবণ বানাতে পারে। তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে কিন্তু সে ক্ষমতা কোথায় যে তার মধ্যে সুপ্ত থাকে ভেবে পায় না ফরিদ।

লায়লা ওদের কাছে এলো। বিচিত্রবর্ণ কাঁচ বা চিনেমাটির পাত্রগুলো সে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় বলল, 'আপাজান, মা-মণির ইচ্ছে, আপনি আজ রাত্রে ও-বাড়িতে তাঁর কাছে থাকেন, কেননা এখনো আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। কোনো কিছুতে উত্তেজিত হলেই আপনার রক্তক্ষরণ হতে পারে।'

বেদৌরা আর ফরিদ চোখে চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা হতাশায় বেদৌরার মুখটা ম্লান হয়ে গেল।

ফরিদ মনটা শক্ত করল। বলল, 'সোনামণি, তুমি দুঃখ করো না। সুস্থ হয়ে ওঠো। জানো, যে তোমার মাথায় আঘাত হেনেছিল সেও এখন শয্যাশায়ী! যাবার পথে ওদের ভাইবোনকে দেখলাম। ঘোড়ার চাট মেরে ভাইটাকে যখম করে দিয়েছিলাম আর বোনটাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে গিয়ে শহরে পৌঁছে দিই। যাবার পথে সরাই-খানায় যে বুড়ীর সঙ্গে আলাপ হল পরে গিয়ে দেখি সেই আমার খালাআম্মা! ওষুধ নিয়ে ফিরছি, বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে হঠাৎ কজন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করল ইমরাদ হোসেন। আহত হল ইমরাদ। সৈন্যরা পালাল। লোকজন জুটে গেল। দীলরুবা আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। নাস্তাপানি দিল। দীলুর বাবা খুব ভাল। বদমায়েস ছেলের জন্য তিনি অনুতপ্ত।'

বেদৌরা ফরিদের হাতে হাত বুলোতে লাগল। বলল, 'যদি তুমি দাওয়াই নিয়ে আজো না ফিরতে পারতে হয়তো আমি মারা যেতাম। কী ভীষণ জ্বালা করছিল! রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। এখন জ্বালাটা চলে গেছে। আমি আজ শান্তিতে ঘুমোতে পারব।'

'আমিও। আমি ঠিক ক্লান্ত নই, তবুও ঘুমোনো দরকার। যাও তুমি, দূরে তো নয়—যখন ইচ্ছে যেতে পারি।'

বেদৌরাকে ধরে তুলে দিতে সে উঠল। পায়ে সালাম করতে যেতেই ফরিদ বাধা দিল, 'এই এই—একি করছ! তুমি সতীসাধ্বী মেয়ে—আমি কত পাপ করেছি—এসব করলে কিন্তু আমি একদিন ঠিক পালিয়ে যাব।'

'কোথায়? দিল্লীতে?'

'হ্যাঁ।'

'যেতে দিলে তো!' বলে ম্লান হেসে বেদৌরা লায়লার হাত ধরে আস্তে আস্তে ও-বাড়িতে চলে গেল।

॥ তেত্রিশ ॥

নির্জন ঘর। ঝাড়বাতি জ্বলছে। একদিকে অস্ত্রপাতি। গান-বাজনার যন্ত্রপাতি। ছবি আঁকার সরঞ্জাম। বইপত্র। চমৎকার সাজানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। দুগ্ধফেননিভ শয্যা। মখমল মোড়া লেপ মুড়ি দিয়ে পড়েছিল ফরিদ। দোরের পর্দাটা বাতাসে দুলছে।

তন্দ্রা নেমে এলো চোখে।

মাঝরাত্রে একসময় তার ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন কোথায় বাজনা বাজাচ্ছে না? উঠে তলোয়ারটা নিয়ে পর্দা ঠেলে বাইরে এলো। কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না রাত। ঝাউ আর দেবদারু গাছগুলো চূড়োর মতো কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছে। বেদৌরার জানলায় আলো জ্বলছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। কোনদিকে বাজনাটা বাজছে?

ফুলবাগানের বাধানো পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল সে। গায়ে তার রেশমের নকশাদার লাল রঙের আলখাল্লা। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে হাওয়াখানার মিনারের ওপরে উঠে দেখল সে কে যেন আপাদমস্তক সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে।

এখানে কে শোয়? কোনো পাহারাদার? বাজনাটা তো এই হাওয়াখানা থেকেই বাজছিল?

অনেক লোকজন আছে তার ভাবী শ্বশুর হেদায়তউল্লাহ্ বণিকের। চাকর-নফররা কোথায় থাকে কোনো খোঁজ-খবর রাখে নি সে। প্রয়োজনও হয়নি। কিন্তু লায়লাটা কে? কোথা থেকে এলো? এত সুন্দরী সুশ্রী পূর্ণ যুবতী মেয়ে দাসীর কাজ করতে এলো কেন? নাকি এঁদের কোনো দরিদ্র আত্মীয়া?

কে লোকটি শুয়ে আছে? চাদরের নিচে রহস্যময় কোনোকিছু নেই তো?

পর্দাটা তলোয়ারের ডগা দিয়ে একটু সরিয়ে দিতেই ফরিদ চমকে উঠল। একি! এটা যে একটা নর-কংকাল!

পর্দা চাপা দেওয়া আছে কেন? আবার চাপা দিয়ে দিল ফরিদ।

পিছন ফিরে খানিকটা হাঁটতেই হঠাৎ মিশ্র সুরের বাজনা বেজে উঠল। ফরিদ দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে তাকাতে লাগল। তেমনি কংকালটা পড়ে আছে।

নিচে নেমে এলো সে। দেখল হাওয়াখানার ঘরের মধ্যে কেউ নেই—কিছু নেই!

হাওয়াখানার সোপান নেমে গেছে বৃহৎ পুষ্করিণীর জলের তলায়। আলো অন্ধকারে রহস্যময় চারদিক। পরিষ্কার দেখা যায় না সব কিছু।

ফরিদ ফিরে এলো আস্তে আস্তে। বাজনাটা বাজছে তখনো। নিজের কামরায় ঢোকার পর হঠাৎ মনে হল কেউ যেন দোরের পাশ দিয়ে চলে গেল।. আলখাল্লাটা খুলে ফেলেছিল সে। পরণে ছিল একটা খাটো বস্ত্র। হঠাৎ প্রায় নগ্নবেশে তরবারী হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো সে। দেখল, কেউ কোথাও নেই! তাহলে কি সবই ভ্রম? অন্য কাউকে ডেকে শোনাবে বাজনাটা? দাসদাসীরা কোথায় থাকে? বড় বাড়ির সিংহদ্বারে প্রহরী আছে রুস্তম পালোয়ান। ভেতরে এসে শুয়ে পড়ল এবার সে।

বাজনাটা থেমে গেল তো এবার শোনা যেতে লাগল সুললিত নারী কণ্ঠের কোরআন শরীফ পাঠ! মনে হচ্ছে যেন পাশের কামরাতেই।

এটা কি তাহলে ভূতের বাড়ি! ঘুমিয়ে পড়লে সে কোনোকিছুই জানতে পারত না। রাতের নিজস্ব একটা রহস্যময়তা আছে। তার নিজের মাথাটাও ভাল করে একবার ধুয়ে ফেলা দরকার।

গোসলখানায় গিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলে চুলগুলো ঘষে মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসার সময় দোরের ফাঁক দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে দেখতে পেল। দোরটা একটু ঠেলতেই খুলে গেল খানিকটা। দেখল, ঘরের মেঝেয় মাদুরী পেতে কাকের মতো কালো পোষাক পরে সুন্দরী লায়লা পবিত্র কোরআন পাঠ করছে।

ডাকল ফরিদ, 'লায়লা।'

'জী!' সাড়া দিয়ে চকিতে উঠে এলো লায়লা। ফরিদকে এখন মাথা ধুয়ে গোসলখানা থেকে বের হতে দেখে বলল, 'এখনো আপনি ঘুমোননি হুজুর?'

'ঘুম আসছিল না, তাই মাথাটা ধুতে এলাম। তুমি এখনো জেগে আছ কেন?'

'এটা তো আমার কর্তব্য। রাত্রে যদি আমাকে আপনার দরকার হয়?'

'তোমাকে আমার দরকার হয়! কেন?'

'বারে! যদি পিপাসা পায়, পানি চান অথবা শিল্পী মানুষ, যদি আঁকতে বসেন, তাহলে গরম পানীয় কিছু দিতে হবে, তুলি-কালি যোগান দিতে হবে। আপাজানের কাছে থাকার জন্যই আমাকে আনা হয়েছে তার সখী রূপে কিন্তু আপনি একা থাকবেন বলে তিনি আমাকে এ-বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

কথা বলতে বলতে লায়লা পিছু পিছু এলো ফরিদের। ফরিদ এসে শুয়ে পড়ল। লায়লাকে বসবার জন্য ইংগিত করল। একটা তেপায়া এনে লায়লা বসল ফরিদের পায়ের দিকটাতে। বলল, 'আমি আপনার পদসেবা করব একটু, তাহলে হয়তো তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যাবে।'

ফরিদ বাধা দিল না।

বলল, 'তুমি কোথা থেকে কেমন করে এখানে এলে?'

'আমার কেউ নেই হুজুর। কর্তাবাবার দোকানে আমার বৃদ্ধ পিতা আজীবন চাকরি করতেন। তিনি মারা গেছেন। বাড়িঘরের

অবস্থা ভাল ছিল না। কর্তাবাবা আমাকে মাসে মাসে সাহায্য করতেন। তারপর গিন্নীমার কথা মতো আমাকে এনে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছেন।'

'তোমার মতো গুণবতী সুন্দরী মেয়ের বিয়ে-সাদী হল না কেন?'

লজ্জা পেলে লায়লা। বলল, 'আমার নামে অপবাদ রটেছিল, তাই চেষ্টা করেও বাবাজী সাদী দিতে পারেন নি। যারা আমাকে দেখে যেত তারা আর সংবাদ দিত না।'

'তোমার নামে অপবাদ রটল কেন? কি করেছিলে?'

'আমার বাবা যেখানে বাস করতেন সেই পাড়ার পাশের গ্রামের মোড়ল ভয়ঙ্কর দুশ্চরিত্র ছিল। তার ছেলেরা আরো খারাপ ছিল। আমি মাদ্রাসায় পড়তে যেতাম। একদিন মোড়লের একটি ছেলে আমাকে ডাকে। আমি সাড়া না দিয়ে চলে যেতে থাকি। তখন সে আমাকে শুনিয়ে একটা অশ্লীল মন্তব্য করে।'

'কি মন্তব্য, শুনিই না?'

'না হুজুর, সেকথা বলতে আমার লজ্জা করে।'

তাকিয়া ঠেস দিল ফরিদ। বলল, 'বলো বলো, লজ্জা করো না। আর আমাকে তুমি হুজুর হুজুর করবে না। বেদৌরার সখি যখন তখন আমারও। তুমি তো ঠিক দাসী নও। এখন এ-বাড়ির পালিত কন্যা বলতে পার। তোমার বিয়ে-সাদী হবে। ভবিষ্যৎ আছে। বলে ফেলো, কি অপমানজনক কথা বলেছিল?'

'আমি মাদ্রাসা থেকে ফিরে এসে মাকে সেকথা জানাতে তিনি আবার আব্বাকে বলে দেন। আব্বা তখন দু-চারজন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে বিষয়টা বললে তাঁরা বলেন কাজীর আদালতে জানাতে। আব্বা ছেলেটিকে যখন শুধোয় সে স্বীকার করে নি। তখন আব্বা বলেছিলেন, আমি যদি আদালতে জানাই তোমার শাস্তি হতে পারে। ছেলেটি তখন আব্বাকে বলে, আদালতে যাবে তো আমার কাছে কিসের ইয়ে করতে এসেছ।—শুনে আব্বার খুব রাগ হয়। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে কাজীর কাছে যান এবং বিবরণটা

লিখিত ভাবে জানান। পরে একদিন দু-তিনজন সিপাই আসে মোড়ল আর তার অন্য একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে আমাদের বাড়িতে। সিপাই দেখে চারপাশের লোকজন ছুটে আসে। তাদের সামনে মোড়ল আর তার ছেলেকে সিপাই খুব কড়া শাসন করে আদালতে বেঁধে নিয়ে যাবার কথা বলে। মোড়ল জীবনে কখনো এমন কথা শোনেনি। সে তখন ছিল অসুস্থ। কিন্তু কাজীর দরবারে অনেক টাকা-পয়সা বা মুরগী-খাসী দিয়ে মোড়ল তার ছেলের বিষয়ে অব্যাহতি পেলেও গ্রামে ফিরে অপবাদ ছড়িয়ে দিল, আমি নাকি তার ছেলের দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছি। মোড়লের লোকজন ছিল, টাকা ছিল, আব্বা আর কিছুই করতে পারলেন না। এই দুঃখে তিনি ক্রমেই যেন ভেঙে পড়তে লাগলেন। পাঁচমাস তিনি বিছানায় পড়েছিলেন। কর্তাবাবা সাহায্য পাঠাতেন। রাত্রে আমাদের বাড়িতে ঢিল পড়ত। আব্বা শেষ পর্যন্ত আমাকে একা রেখে মারা গেলেন।'

চোখ মুছতে লাগল লায়লা। বলল, 'ভাইজান, আমি বড় অনাথ, বড় অসহায়! কর্তাবাবা না দেখলে পেটের দায়ে নিশ্চয়ই ভেসে যেতাম, ভিক্ষে করতাম, অথবা মন্দ জীবন যাপন করতে হত। আমার ভাগ্য ভাল যে আমি এই রাজপ্রাসাদে জায়গা পেয়েছি। আমার কোনো কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে নিজগুণে মাফ করবেন হুজুর।'

'আবার হুজুর!' জোরে ধমক দিয়ে বলতেই সহসা চমকে উঠল লায়লা। হেসে ফেলল সে। বলল, 'আপনাকে আমি ভাইজান বলব।'

'তাই বলবে কিন্তু তোমাদের গাঁয়ের সেই মোড়লটা এখনো বেঁচে আছে কি?'

'না হুজুর, এই থুড়ি, ভাইজান! সে মারা গেছে। মরবার সময় সে বক্‌রীর মতো ব্যা-ব্যা করে চিৎকার করছিল। তার ছেলেরা তখন টাকা-কড়ির বখরা নিয়ে মারামারি করছে। বুড়ো মোড়ল

তখনো চেঁচাচ্ছে: 'ব্যা—কাজীর কাছে যাব। ব্যা—ব্যা—শালারা, তোদের গারদে ঢোকাব—ব্যা ব্যা ব্যা—সব টাকা কাজীকে দোব। গরিব লোকদের বিষয় সম্পত্তি আমি গ্রাস করেছিলাম—এখন আজরাইল এসে আমার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরেছে—ব্যা ব্যা ব্যা...'

হাসল ফরিদ লায়লার সরলতা দেখে। বলল, 'আচ্ছা, লাইলী, তুই ভয় করিস না?'

'কেন? কিসের ভয়?'

'এই মানে আমিও তো একজন পুরুষ—এখন মাঝরাত—তুমি একা সুন্দরী মেয়ে...'

'আপনি তো ভদ্রলোক। তাছাড়া আম্মাজান বা আপাজান যখন বলেছেন তখন অবিশ্বাস করব কেন? আর করলেই বা কী, আমার জীবনের এখন আর কী দাম আছে!'

ফরিদ আর কিছু বলল না। চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ! আবার সেই বাজনাটা বাজতে লাগল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কাওয়ালী গান। অনেক লোকের ধুয়োধরা কণ্ঠস্বর আর তাদের তালি মারার শব্দ।

'ঐ বাজনা, আর এখন শুনছি গানটা—ওটা কোথা থেকে হয় তুই জানিস লাইলী?'

'গতকালও আমরা শুনেছি। ভয়ে ঘুমুতে পারিনি আপাজান আর আমি। রুস্তম দেখে এসেছে হাওয়াখানার মিনারে একটা পর্দা চাপা নরকংকাল এসে কোথা থেকে নাকি জুটেছে। কর্তাবাবাও শুনেছেন। তিনিও নাকি রহস্যভেদ করতে পারেন নি। প্রতি বৃহস্পতিবার আর শুক্রবার রাত্রে এরকম বাজনা বাজে। কাওয়ালী গান হয়। ভয়ে কেউ বাইরে বের হয় না।'

'আমিও কিছুক্ষণ আগে তলোয়ার হাতে নিয়ে গিয়ে মিনারের ওপরের নর-কংকালটা দেখে এসেছি।'

'কর্তাবাবা বলেছেন, বোধহয় কোনো পাজী লোক এসব কীর্তি করেছে।'

'হু। আচ্ছা যা, তুই শুয়ে পড় গিয়ে। আয়, এদিকে আয়।'

কাছে গেল লায়লা। হাতটা তার ধরল ফরিদ। শুঁকে দেখল। বলল, 'কই, কোনো গন্ধ নেই তো অপবাদের। মোড়লটা আজ বেঁচে নেই যে তার মাথাটা কেটে এনে ধড়াস্ করে ফেলে দোব তোর পায়ের কাছে। তুই আমার একটা আদুরে বেড়াল। যা এখন তুই।' গাল টিপে দিতে হাসল লায়লা। নিজের কামরায় এসে দোর এঁটে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ফরিদও দোর এঁটে দিল। ঘুমুল সে।

॥ চৌত্রিশ ॥

সকালে নিদ্ ভাঙতে দেরি হল ফরিদের।

লায়লা অপেক্ষা করে বসেছিল। বলল, 'ও-বাড়িতে আপনার নাস্তাপানির ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই অপেক্ষা করে আছেন। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নিন।'

লায়লার সঙ্গে এ-বাড়িতে এসে প্রথমে বেদৌরার ঘরে গেল ফরিদ। হাসল বেদৌরা, বলল, 'নিশ্চয় ভাল ঘুম হয়নি। চোখ দুটো লাল হয়ে আছে।'

ফরিদ বলল। 'মোগলদের চোখ একটু লালই হয়!'

'না হুজুর, সেটা পাঠানদের।'

'হিন্দুস্তানের পাঠানদের কিন্তু মোগলরা হাবিয়ে দিয়েছিল যতই লাল চোখ তাদের হোক।'

নাস্তাপনি খেতে বসল ফরিদ। হেদায়তউল্লাহ্ সাহেবও এসে বসলেন। বললেন, 'মোস্লুলের গুণীন বুড়ীর দাওয়াইটা খুব কাজে লাগল বাবা ফরিদ।'

'গুণীন বুড়ী বলবেন না, তিনি খুব পরহেজগার, জ্ঞানী, বিদুষী আর গুণবতী মহিলা। বড় বড় রাজ-পরিবারের তিনি চিকিৎসা করেন। তিনি অদ্ভুত একটা দর্পণ করতে জানেন। তাতে যাকে দেখতে চান, তাকে দেখতে পাবেন এবং তার কলঙ্কময় জীবন হলে মুখে বা শরীরে কালো কালো ছাপ পড়ে। তিনি পারশ্যের রাজ-বাড়িতে চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর অবস্থা খুবই ভাল। পাকা দালান-কোঠা, বাগান, জমি ইত্যাদির সঙ্গে একটি মাত্র নাংড়া নাৎনী আছে, তার বিয়ে দিতে পারছেন না। কেউ তাকে বিয়ে করতে চায় না।'

'লায়লার সঙ্গে আশা করি তোমার আলাপ হয়েছে। ওরও দুর্ভাগ্য ঘটেছে মিথ্যা অপবাদে, গ্রামের দুর্বৃত্ত ছেলেরা পিছনে লেগে। মেয়েটি বড় ভাল। ও-ও আমার মেয়ের মতো। ওর বাবা বড় বিশ্বাসী জহুরী ছিল। তুমি তাকে দেখেছ বোধহয়। সেই প্রথম যেবার দোকানে এসে আমাকে পাঁচটা রত্ন বেচে গেলে, যে বুড়ো জহুরীটা রত্ন পরীক্ষা করে দেখেছিল সে-ই ছিল লায়লার বাবাজী! আমার বহুদিনের বন্ধু। মাইনে ছাড়া সে যদি চুরি করত তাহলে বাড়ি আর আলাদা ব্যবসা করতে পারত। তার চেয়ে ভাল জহুরী আর এদেশে কেউ ছিল না। অনেক রত্ন-বণিক তাকে বেশি মাইনে দিয়ে আমার দোকান থেকে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু লায়লার বাপ যায় নি। যাক, লায়লা আমার বাড়িতে থাক। বেদৌরার ও সখি হয়ে থাকবে। যদি বিয়ে দিতে পারি তো ওর বাবার বন্ধুত্বের ঋণ আমি শোধ করব।'

লায়লার একটা হাত ধরে শুয়েছিল বেদৌরা। লায়লা অন্য হাতে ময়ূরের পাখা নিয়ে মৃদুমন্দ বাতাস দিচ্ছিল বেদৌরার মাথায়।

নূরবানু ওঁদের আহারাদি পরিবেশন করছিলেন।

পরোটা, কিছু দুম্বার মাংস, ফিরনি, ফল আর গরম দুধ খেলে ফরিদ। বলল, 'মোসুলের গুণীন মহিলাটি কিন্তু আমার খালাআম্মা হন।'

'তাই নাকি! তাহলে তোমাদের বিয়ের সময় তাঁকে এনো।'

লায়লা বলল, 'চাচাজান, বেদৌরা-আপার কবে সাদির দিন ধার্য করছেন তাহলে?'

'হ্যাঁ, এইতো হবে, বেদৌরা-মা সুস্থ হয়ে উঠুক।'

ফরিদ বলল, 'আমার মাকে হিন্দুস্তান থেকে আনার পর।'

বেদৌরা যেন সহসা চমকে উঠল। তাহলে ফরিদ কি বিয়ের আগেই হিন্দুস্তানে চলে যাবে? আর বাদশা শাহজাহান যদি ওকে চিরকালের জন্য বন্দী করে রাখেন পাথরের অন্ধকার পাতালপুরীর মধ্যে?

হেদায়েতউল্লার মনে পড়ল ফরিদের আনা বৃহৎ হীরকখণ্ডটির কথা—যেটি সে বিনামূল্যেই ভেট দিতে চায় বাদশা শাহজাহানকে তার মায়ের মুক্তির জন্য। যদি গিয়ে দেখে যে তার মা বেঁচে নেই? যদি অন্য কোথাও ওই অনিন্দ্যসুন্দর রাজকুমার বাঁধা পড়ে যায়? তাই তিনি বললেন, 'বিয়ের পর নাহয় দিল্লীতে যেও—তোমার আম্মাজানকে নিয়ে এসো।'

ফরিদ মাথা নাড়ল। না, তা হয় না। সে যাবেই। মা না থাকলে তার আনন্দ হবে না। তাছাড়া মাকে দুরবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে এসে আনন্দ করবে এখানে? সে এত বড় দুর্বল অসহায় যে বাদশা শাহজাহান তার শত্রু জেনেও মাকে তার অন্তঃপুর থেকে উদ্ধার করে আনতে পারেনি। হায় দুর্ভাগ্য!

ফরিদ অন্যমনস্কভাবে চলে আসছিল। হঠাৎ আবার ফিরে গেল। দেখল, বণিক পোশাক-আষাক পরে দোকানে বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন।

ফরিদ বলল, 'গতরাত্রে বাজনা বাজাচ্ছিল কারা, কাওয়ালী গাইছিল আর হাওয়াখানার মিনারের মধ্যে নর-কংকাল শোয়ানো আছে কেন?'

বণিক বললেন, 'এর রহস্যভেদ করতে পারছি না বাবা। সম্ভবত কোনো জীন ঐ হাওয়াখানায় আশ্রয় নিয়েছে। জানি না আমার লাভ করবে না ক্ষতি করবে।'

ফরিদ বলল, 'আজ রাতেও যদি সেই রকম বাজনা বাজে তবে আমি ঐ মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি ঘটাব।'

'কেমন করে! না বাবা ওখানে যেও না। ভয়েই তোমার মৃত্যু ঘটতে পারে!'

হঠাৎ অট্টহাসি করে উঠল ফরিদ। মিশরের পিরামিডের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তার। কত প্রেতাত্মার উদ্ধার করল সে। জীতেন্দ্র যাদুকর, বিজ্ঞানী যাদুবীর আবু ইসহাক ইবনে ইমামের

অতৃপ্ত আত্মারা কোথায় গেল? পীরচেঙ্গির মায়াকাননের বন্দী পাষাণ রাজকুমাররা কোথায় গেল?

গুলবাগের মধ্যে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল ফরিদ। মার কথা ভাবতে লাগল। অন্তঃপুর, রাজদরবার, দিল্লীর বাজার, নিয়াজীর সরাইখানা, তাঁর মেয়ে আসমার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সেই সৎ ব্রাহ্মণের কথা—যিনি মন্ত্রবলে তাঁর ছিন্ন-প্রায় বাহু জুড়ে দিয়েছিলেন। কত মেয়ে তার জীবনে এলো গেল!...

বেদৌরার যৌবনভরা চেহারার কথা সে ভাবল। কাল সে মরুভূমির যে চিত্রটার কথা বলেছিল, ভেবে দেখল একবার। তারপর রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসল।

কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে লায়লা এসে বসল তার পাশে। ফরিদ কিছু বলল না। হয়তো একটু বিরক্ত হল, অন্যমনস্ক হল একটু।

বলল, 'ছবি আঁকা শিখবে?'

'জী হ্যাঁ।'

ফরিদ হাসল একটু। ওর মুখটা ধরে তুলি দিয়ে অলঙ্কৃত করতে লাগল। লম্বা টিপ দিল। গণ্ডে রক্তিম আভা ফুটিয়ে দিল। একটা তিল আঁকল। চুলগুলোকে কানের পাশে নামিয়ে দিল। ঠোঁটে রং দিল। বলল, 'যাও, এবার বেদৌরাকে দেখাও গিয়ে।'

'হাসবে না?'

'না, খুব ভালই দেখাচ্ছে।'

লায়লা খুব খুশী হয়ে তার নিজের ঘরে গেল, সাজপোষাক করল। আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখল। সত্যি, কি অপূর্বই না দেখাচ্ছে তাকে! হঠাৎ খেয়াল হল ফরিদের কাছে আর একবার যাবে? না, তার লজ্জা করছে! কেমন যেন ভয় করছে!

সোজা চলে এলো বেদৌরার কাছে। এসে তার মুখের ঢাকা খুলল।

বেদৌরা অবাক হয়ে তাকাল। বলল, 'বাঃ! চমৎকার! আম্মাজান দেখে যান, লায়লা কেমন সেজেছে।'

নূরবানু বিবি এসে দেখলেন। বললেন, 'বেশ দেখিয়েছে।'

তারপর তিনি নিজের কাজে চলে গেলেন।

লায়লা বলল, 'আমি কি সেজেছি, উনি তো সাজিয়ে দিলেন। ছবি আঁকতে বসেছিলেন। আমি কাছে যেতে উনি তুলি দিয়ে এই রকম অবতার করে দিলেন।'

বেদৌরা এবার চুপ করে গেল। নখ খুঁটতে লাগল।

'রাগ করলে আপা?'

'না রে! রাগ করব কেন?'

'তবে মনটা এমন ভারী হয়ে গেল কেন? আমি হতভাগী ঈর্ষার পাত্রী হব এত বড় ভাগ্য আমার হবে? তাঁকে আমি ভাইজান বলি। তিনি বলেন, তুই আমার একটা আদুরে বেড়াল।'

লায়লা চলে গেলে বেদৌরা কিছুক্ষণ তার কথা চিন্তা করল। তার মনের মধ্যে কি ঈর্ষা আসছে, সন্দেহ করছে সে ফরিদকে? রাজপুত্র সে, বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছে। যদিও তার রুচি আছে তবু লায়লার সহজ সতেজ শ্রী আছে। তবে এটাও ঠিক যে লায়লা তার পথের বাধা হতে পারবে না। দৈনন্দিন জীবনের সাময়িক উঞ্ছবৃত্তির উপাদান সে হতে পারে কিন্তু ফরিদের সামগ্রিক জীবনকে বাঁধার রশদ কোথায় তার?

বেদৌরা উঠল। হাঁটতে হাঁটতে তার মা'র কাছে এলো। বলল, 'আম্মাজান, লায়লা কি আমার চেয়েও সুন্দরী?'

নূরবানু বিবি হাসলেন। বললেন, 'না মা, তোমার চেয়ে সুন্দরী এই বসরা শহরে আর কেউ নেই বোধহয়। তোমার চোখ দুটো দেখলে মায়া হয়! কি অপূর্ব্ব ভুরু, নাক, ঠোঁট আর গায়ের রঙ। সারা পৃথিবীর মধ্যে বসরার মেয়েরাই গড়-পড়তা বেশি সুন্দরী তারপর কাশ্মীরের নাম আছে। একটা গোপন খবর তোকে বলি মা, কাউকে যেন বলিস না। তোর আব্বাজান গত রাত্রে আমাকে বলেছেন, জানো বেগম সাহেবা, আমার কি সৌভাগ্য, স্বয়ং বাদশা এসেছিলেন ঠিক মগরেবের পর আমার দোকানে। সাধারণ

পোষাকে এসেছিলেন। সঙ্গে দুজন ছদ্মবেশী সুপুরুষ সান্ত্রী। বাদশার তীক্ষ্ণ মিষ্টি চাহুনি, মধুর বাক্য শুনে বোঝা গেল তিনি খুব উঁচু খানদানী মানুষ। কয়েকটি হীরকের আংটি দেখলেন তিনি। একটি পছন্দ করার পর তোর আব্বা দাম বললেন, পঁচিশ হাজার টাকা—শুনেই তো তিনি কটমট করে তাকালেন। বললেন, বণিক সাহেব, বসরা নগরের আপনি শ্রেষ্ঠ রত্নাকর, আপনার কাছে কেউ ঠকে না কিন্তু আমি গরিব বেচারা আমার প্রেমিকার জন্য একটি হীরকের আংটি কিনতে এসে নিরাশ হয়ে কি ফিরে যাব?'

'আপনি গরিব! জাঁহাপনা আমাকে লজ্জা দেবেন না।'

'তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছেন!' বাদশা মৃদু হাসলেন। খানাপিনা সরবৎ দেওয়া হল। তিনি আংটিটা আঙুলে পরলেন। একটা কাগজে পঁচিশ হাজার টাকার রশিদ লিখে নিজের নাম দস্তখত করে দিলেন। সেই রশিদ নিয়ে সালাম জানালেন তোর বাবাজী। কিন্তু যাবার সময় বাদশা আরেফ আংটিটা আঙুল থেকে খুলে তাঁর হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'বাদশার তরফ থেকে এটা আপনার নবাগতা সুন্দরী কন্যা বেদৌরাকে উপহার দিলাম।' বলে হেসে তিনি চলে গেলেন। এখন কি হবে মা? বাদশার কানে উঠে গেছে তোমার সংবাদ। ইমরাদের বাবা হয়তো জানিয়েছেন। অথবা এই শহরের অন্য কেউ। বাদশা থাকেন বাগদাদে—এত তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে সংবাদটা পৌঁছে গেল!'

বেদৌরা বসে পড়ল। না, তার কপালে সুখ নেই। শিশুকাল থেকেই সে দুর্ভাগিনী!

বেদৌরা বলল, 'কি হবে তাহলে আম্মাজান?'

'সেইটাই তো ভাবনার কথা।'

'ফরিদের কোনো ক্ষতি করবেন না তো?'

'উঁ! না, ক্ষতি করবেন কেন? তবে বাদশা আরিফ যখন ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছেন, তখন একজন সান্ত্রী তোমার আব্বার হাত ধরে হঠাৎ কাছে টেনে বললেন, 'বহুৎ ভাগ্য আপনার, বাদশার

শ্বশুর হবেন কিন্তু সাবধান, বিদেশী ছদ্মবেশী কোনো রাজশত্রুকে আশ্রয় দেবেন না।'

বেদৌরা উঠে পড়ল। বলল, 'ফরিদকে এসব এখনি জানানো দরকার! সে রাজপুরুষ। এসব ব্যাপারে কি করতে হয় নাহয় তারই বেশি জ্ঞান আছে। আব্বাজান যেন হতবুদ্ধি হয়ে রশিদটা ভাঙাতে না যান এখনি। অথবা যাবেন কিনা ফরিদের সঙ্গে যুক্তি করা দরকার। নাহয় এই সভ্যতার পীঠস্থান বসরা ত্যাগ করে আবার আমরা আরবের সেই মরুদ্যানে পীরের দরগায় চলে যাব। নতুবা হিন্দুস্তানের দিকে। পথে পথে আমরা ভিক্ষা করব। রাজার আংটি আমি চাই না।'

'উত্তেজিত হয়ো না মা। কাউকে এসব কথা বলো না এখন। তোমার আব্বাজান ফিরে আসুন, তার সঙ্গে যুক্তি করে দেখি, কি করা যায়।'

'না আম্মাজান, দেরি করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। প্রতিটি মুহূর্তের দাম এখন অনেক। দেরি করলে আমাকে তলব পাঠাবে আর হয়তো ফরিদ বিদেশী গুপ্তচর বলে বন্দী হয়ে যাবে। ফরিদকে সাবধান হবার সময়টুকু পর্যন্ত আমরা দেবো না? কালই নাহয় আমাদের সাদীর ব্যবস্থা করে দিন।'

'তা হয় না মা। বাদশা স্বয়ং যখন প্রস্তাব করে গেছেন তখন তোমার আব্বাজানের ধড়ে কি দুটো মুণ্ডু আছে যে একটা দিয়ে নিস্তার পাবেন?'

'আমি পাগল হয়ে যাব আম্মাজান, এই সংসার জীবনের জটিল সংঘাতের মধ্যে বেঁচে থাকার চাইতে আমার সেই সন্ন্যাসিনীর জীবন ভাল ছিল। হায় আল্লা! আমাকে বাঁচাও, কেন তুমি আমাকে প্রলোভন ভরা চেহারার সুন্দরী নারী তৈরি করলে? আমি ফরিদের কাছে যাচ্ছি আম্মাজান।'

বেদৌরার মনে হল তার মাথার আহত স্থানের যন্ত্রনাদি সমস্তই সেরে গেছে এখন।

বেদৌরা এসে দেখল, লায়লা তুলি ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর ফরিদ ছবি এঁকে চলেছে। মরুভূমিতে ঝড়ের দৃশ্য। যুদ্ধ চলেছে দুই ঘোড় সওয়ারের মধ্যে। পিছনে তাঁবু।

বেদৌরা বলল, 'হায় রে দুর্ভাগ্য তোমার রাজপুত্র! যুদ্ধ আবার যুদ্ধ!'

'যুদ্ধ!' সহসা তলোয়ার টেনে বার করল ফরিদ। 'কার সঙ্গে?' বেদৌরাকে হাত বাড়িয়ে কোমর বেড় দিয়ে তুলে ধরে ঘুরপাক খেতে লাগল ফরিদ।

লায়লা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বেদৌরা কিন্তু হাসল না। বলল, 'এখন আমোদ করার সময় নয়, গুরুতর সংবাদ আছে। চলে এসো অন্যঘরে।'

'তাই নাকি, কি সংবাদ? লাইলী, আদুরে বিড়ালটা, তুই এখন যা।'

লায়লা চলে যেতে দোর বন্ধ করে দিয়ে এসে বসল বেদৌরা। তাকে কোলের ওপর টেনে তুলে নিয়ে চুম্বন করতে লাগল ফরিদ। বেদৌরা বলল, 'আরে এই, এই, এখন থামো, ছেলেমানুষী করো না। জীবন-মরণের সমস্যা এখন।'

ফরিদ এবার শান্ত হল। গম্ভীর মেজাজে সব কথা শুনল। তারপর সে হতাশ সুরে বলল, 'আজ নীলোফারের জাদুদণ্ড নেই আমার কাছে, কি করব আমি?'

ফরিদ পায়চারি করল। বলল, 'তাহলে বিদায় বেদৌরা, বিদায়। আমি আবার মুসাফির বেশে হিন্দুস্তানে চলে যাই কিন্তু রত্নগুলো? সেখানেও তো শাহজাহান আমার শত্রু!'

'তুমি আমাকে ফেলে রেখে পালাবে?'

'কি নিয়ে আমি রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়ব বলো? কোথায় পাবো দশ-পনেরো হাজার সৈন্য? পারস্যের যুবরাজ আমার ভায়রা-ভাই, সে কি আমাকে সাহায্য করবে, নাকি তার কাছেই আমরা দুজনে আশ্রয় নেবো?'

'আব্বাজানের জান যাবে না? তাছাড়া বাঘের ভয়ে কুমীরের আশ্রয়ে স্থান নেবো?'

'তাহলে!' কপালে করাঘাত করতে লাগল ফরিদ।

'ঠিক আছে, আজ রাতটা আমাকে ভাবতে দাও। কালকেই তো আর তোমাকে নিয়ে পালাচ্ছে না?'

'আমার ও-বাড়িতে থাকতে ভয় করছে। আমি তোমার কাছে থাকব!' শিশুর মতো সরল মনে বলল বেদৌরা।

ফরিদ বলল, 'আরে ব্যাস! তাতে আরো বিপদ! হঠাৎ যদি রাত্রে আমি ঘেরাও হই?'

'তোমার সঙ্গে লড়াই করে মরব!'

'পাগলী!' চুম্বন করে ছেড়ে দিয়ে বাইরে এলো ফরিদ। হঠাৎ তার হাওয়াখানার মীনারটা চোখে পড়ল। সেই কংকালটার কথা মনে পড়ল···

" বাদশা আরিফ নাকি তরুণ ছোকরা। বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছেন। নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। সুরা আর নারী তাঁর পরম প্রিয়। প্রজারা বাদশার দরবারে যেতে ভয় পায়। রাজসভাতেই একজন বৃদ্ধ সাধক পীরকে তিনি হত্যা করেছিলেন তরবারীর আঘাতে। সাধক নাকি সমুচ্চস্বরে বলেছিলেন, 'যে কুলাঙ্গার তার সৎ ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করে সে দেশের বাদশা হলেও তাকে আমি কুর্ণিশ করি না।'

এমন সাহসী সাধকের কথা বড় বেশি শোনে নি ফরিদ। তাঁকে দেশজোড়া মানুষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। তিনি প্রাণ দিয়ে বাদশা আরিফের নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ফরিদ ভাবল, কেমন করে এই বাদশাটাকে খতম করা যায়? কোন বুদ্ধিতে? বেদৌরাকে সে হারাতে পারবে না। সে কি এই বসরা নগরী থেকে চোরের মতো পালাবে?

ভাবতে ভাবতে দিন ফুরল। রাত এলো। রাত্রে খানার আসরে সব কথাই হেদায়তউল্লাহ্ বললেন। শেষে সাশ্রু নয়নে

বললেন, 'বাবা ফারিদ, বেদোরাকে আল্লা রক্ষা করুন। দুঃসময় যদি সত্যই আসে তবে যেন সে পরিত্রাণের জন্য আল্লার দেওয়া ক্ষমতার ব্যবহার করে।'

ফরিদ চলে এলো গুলবাগের মধ্যে।

মধ্য রাত্রির পর সেই বাজনাটা বাজতে শুরু করল।

ফরিদ লায়লাকে ডাকল। বলল, 'বেদৌরাকে অজু করে কোরআন শরীফখানা নিয়ে আসতে বলো এখনি।'

লায়লা চলে গেল।

বেদৌরা সাদা পোষাক পরে কোরআন শরীফখানা বুকে চেপে নিয়ে হাজির হওয়ার পর দেখল তার পিছনে রুস্তম পালোয়ান।

'আমার সঙ্গে এসো তোমরা।'

সবাই দেখল ফরিদ আচকান পায়জামা পরে টুপি মাথায় দিয়ে মৌলবী সেজেছে।

হাওয়াখানার মীনারের ওপরে উঠে এসে ফরিদ বলল, 'আমি ঐ মড়ার আত্মার মুক্তির জন্য সারারাত পবিত্র কোরআন তেলায়াত করব। তুমিও ঐ দ্বারের মুখে বসে কোরআন শরীফ পড়বে খুব মৃদুস্বরে।'

বেদৌরা রাজী হয়ে দোরগোড়ায় বসে গেল। গোটা কোরআন শরীফ তার মুখস্থ আছে—দেখে পড়ার প্রয়োজন নেই।

বাজনার গাম্ভীর্য আর ভূতুড়ে আবহাওয়া!

কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না চারদিকে। বাজনাটা এই ঘর থেকেই বাজছে যেন অত্যন্ত দ্রুতলয়ে।

রুস্তম নিচে দাঁড়িয়ে আছে বর্শা হাতে নিয়ে।

ফরিদ মড়ার বুকের ওপরে হাত রেখে পবিত্র কোরআন পাঠ শুরু করতেই ধীরে ধীরে বাজনাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর ফরিদ দেখতে পেল সমুদ্রের দোল খাওয়া ঢেউয়ের মধ্যে থেকে পবিত্র

কোরআনের এক একটা আয়াত উঠে আসছে তার সামনে। দ্রুততালে সে পড়তে লাগল। অত্যন্ত দ্রুত—ঝড়ের বেগে।

ভোর রাত্রে যখন কোরআন শরীফ সাঙ্গ হল অমনি মৃত আত্মা কথা বলতে শুরু করলেন, 'আস্ সালামো আলায় কুম।'

'ও আলায়কুম আস্ সালাম।' উত্তর দিল ফরিদ! তারপর প্রশ্ন করল, 'আপনি কে, এখানে কেন এসেছেন?'

'আমি সেই পীর বাহরাম আল্-বায়াত—যাকে এই দেশের বাদশা পাপিষ্ঠ আরিফ অন্যায়ভাবে নিহত করেছিল। একজনও ধার্মিক কি ছিল না যে আমার জন্য পবিত্র কোরআন 'খতম' করে? এখন আমি সন্তুষ্ট। আমাকে এই পুণ্যবান বণিকেব গুলবাগের মধ্যে সমাধিস্থ করো। আমার কবরে দু-চারজন ভক্ত জুটে ফুল-আগরবাতি দেওয়াতে বাদশা আরিফ তাদের দণ্ড দিয়েছে আব কবরের মধ্যে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করার পর উঠে এসেছি এই মীনারে। আমি একটা অবলম্বন চাই এই কুলাঙ্গার বাদশাটাকে ধ্বংস করার জন্য। রাজপুত্র ফরিদ, তুমি পীরচেঙ্গির ভক্ত। তাঁর অসীম ক্ষমতা, আর তোমাকে কেউ নিহত করতে পারবে না। তুমি যুদ্ধ করো। আর তুমি এদেশের রাজা হবে।'

'আমি সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পাব হুজুর?'

'সবই আল্লা দেবেন। আর ঐ বেদোরা মা-জননীর মুখাগ্নি সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারে শত্রুদের। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না।'

সকাল হয়ে গেল একটু পরে।

দোকানের ছুটি দিয়ে খুব জাঁক-জমক করে পীরের সমাধি দিলেন বণিক হেদায়তউল্লাহ্।

ছোট মতো সুন্দর একটি মাজার গড়ে দিলেন।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

বড় হীরক খণ্ডটি ছাড়া সমস্ত রত্নগুলি বাজারে বেচে দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করার পর ফরিদ একরাত্রে সহসা আত্মগোপন করল।

সে চলে যাবার পরই পাঁচজন রাজসৈন্য এসে হাজির হল ফরিদের খোঁজে।

হেদায়তউল্লাহ্ দেখলেন এই সৈনিকদের মধ্যে স্বয়ং বাদশাও আছেন। তিনি যেন চিনতে পারলেন না। বললেন, 'একজন ভারতীয় যুবক দরবেশ ছিলেন আমার মেহমান হয়ে। তিনি গতকাল দেশে চলে গেছেন।'

'আপনার কন্যারত্নটিকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন তো?'

'জী না, সে অসুস্থ।'

বাদশা ঘোড়া থেকে নামলেন।—'চলুন, দেখে আসি তাকে'—বলে অন্দর মহলে ঢুকে গেলেন।

বণিক হেদায়উল্লাহ্ নূরবানু বিবিকে ইসারা করে জানিয়ে দিলেন বেদৌরাকে সরিয়ে দিতে। তিনি লায়লাকে ঘর থেকে বার করে এনে বললেন, 'এই মেয়ে হুজুর! একটু অসুস্থ আছে।'

বাদশা লায়লাকে দেখলেন। এই মেয়ে এতই সুন্দরী? লায়লার বোরখার নেকাবটা তিনি তুলে ধরলেন। দেখলেন, সুন্দরই বটে! তিনি তার হাত ধরলেন।—'এসো, আমার সঙ্গে, রাজ-অন্তঃপুরে তোমার স্থান হবে আজ থেকে।'

'আব্বাজান!' বলে একবার কাতর চিৎকার করল লায়লা।

বণিক বললেন, 'যাও মা, ভয় বা লজ্জা করো না। এত বড় ভাগ্য ক'জনেরই বা হয়!'

লায়লাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে রাজা আর রাজ-সৈনিকরা চলে গেলে বণিক চাকর-বাকরদের ডেকে সাবধান করে দিলেন কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও না জানায় যে এই বাড়িতে বেদৌরা নামের কোনো মেয়ে আছে। সবাই যেন বলে বেদৌরাকে বাদশা নিয়ে গেছেন, যে আছে সে লায়লা!

মাসখানেক পরে একরাত্রে ফরিদ এলো ঘোড়ায় চড়ে। সঙ্গে তার দশজন অশ্বারোহী সৈন্য। হাতে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র।

বেদৌরাকে ফরিদ নিয়ে এলো নিজের ঘোড়ার ওপরে তুলে। বলল, 'রাজা বোধহয় জানতে পেরেছে যে-বেদৌরাকে সে নিয়ে গেছে তা নকল। কাজেই সাবধান হওয়া দরকার।'

পার্বত্য এক গুহার অভ্যন্তরে নেমে গেল ফরিদ। বেদৌরা সেখানে গিয়ে দেখল অনেক সৈন্য-সামন্ত। অস্ত্রপাতি। বেদৌরা বলল, 'এত তাড়াতাড়ি এত সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রপাতি তুমি কেমন করে যোগাড় করলে গো!'

'হে হে, আমি হলাম রাজপুত্র! পীরের দয়ায়, আল্লাতালার ইচ্ছায় এরা এসেছে। সৈন্যবিভাগে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছি—বাদশা এদের মাইনে বা আহারাদি দিচ্ছিল না।—এই তোমাদের রাণী বেদৌরা।'

'রাণী বেদৌরা, জিন্দাবাদ!' সেনাপতি আস্তে ধ্বনি দিল। গুহার অভ্যন্তর গমগম করতে লাগল।

পরদিন ভোর হবার আগেই হঠাৎ বিপদসূচক শিঙ্গাধ্বনি বেজে উঠল। ফরিদ আর সেনাপতি ছুটে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিল।

সৈন্যরা হুড় হুড় করে গড়ের বাইরে বেরিয়ে এসে উপত্যকা দিয়ে বারোটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল চারদিকে। সামনে পিছনে পর্বত। মালভূমি ধরে উঁচুতে উঠে গেল চারটি দল। দেখল বাদশার বাহিনী ছুটে আসছে সামনের ময়দানে। অজস্র সৈন্য। ঘোড়ায় চড়ে, তলোয়ার-বর্শা হাতে। উটের পিঠেও অনেক সৈন্য। অনেক পদাতিক।

সহসা ওরা আক্রমণ করল না। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে ঘোড়-সওয়াররা।

ফরিদ ছিল অনেক পিছনে, গড়ের মুখে। বেদৌরা শিরস্ত্রাণ বর্ম পরে পুরুষবেশে ঘোড়ায় চড়ে নাংগা তলোয়ার হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল ফরিদের পাশে। ফরিদ হাসল একটু। তার দলগুলো কেটে কেটে দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে।

রাজার পক্ষ থেকে পতাকাধারী একজন দূত এগিয়ে এসে বলল, 'দেশদ্রোহীরা যখন একজন বিদেশী শত্রুর হাতে হাত মিলিয়ে এই পার্বত্য গড়ের মধ্যে দুর্গ গড়ে তুলে ক্ষমতা সঞ্চয় করেছে তখন তাদের সমূলে ধ্বংস করার ফরমান এসেছে বাদশার কাছ থেকে। যদি আপনারা মহামান্য বাদশা আরিফ খান খানন আলম-এর বশ্যতা চান তবে এই পতাকা গ্রহণ করুন—নচেৎ শত্রুতা চাইলে এই তরবারী গ্রহণ করুন। হিন্দুস্তানের যুবরাজ ফরিদকে আমরা এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি।'

ফরিদ এগুতে গেলে বেদৌরা তাকে ইংগিতে নিষেধ করল। নিজেই এগিয়ে এসে দূতের হাত থেকে প্রথমে পতাকাটা গ্রহণ করল।

দুই দলই হতবুদ্ধি হয়ে গেল। রাজসৈন্যদের মধ্যে মারহাবা ধ্বনি শোনা গেল।

'বাদশাকে এগিয়ে আসতে বলুন।' বলল বেদৌরা।

রাজদূত হাত তুলে ইসারা করতেই রাজা আরিফ এগিয়ে এলেন সামনে। বর্মের ওপর তাঁর দুদিকে দুটি সোনার তারা।

শিরস্ত্রাণের ওপর তিনটে। জ্বলজ্বল করছে সেগুলো।

বাদশা আরিফ শুধোলেন, 'তাহলে আপনি সেই যুবরাজ ফরিদ?'

'না। আমি বেদৌরা।'

বেদৌরার নীলাভ চোখের দিকে তাকালেন রাজা আরিফ। হাসলেন তিনি। হাত বাড়িয়ে আহ্বান করলেন। তখন বেদৌরা

পতাকাটি তাঁর হাতে তুলে দিলে। বললে, 'বাদশা আরিফ, তোমার মতো কুলাঙ্গার বেদৌরাকে স্পর্শ করতেও পারবে না। তুমি লায়লাকে পেয়ে এতদিনেও জানতে পার নি যে বেদৌরা তোমার জীবননাশ করার জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ পিতাকে স্বহস্তে হত্যা করেছ সিংহাসনের লোভে। তুমি দেশমান্য পীর বাহরাম আল-বায়াতকে নিহত করেছ। সতীসাধ্বী বেদৌরার দিকে লোভের হাত বাড়িয়েছ—বহু কুমারীর জীবন নষ্ট করো প্রতিদিন। রাজ্যে তোমার বিশৃংখলা। দরিদ্ররা হাহাকার করছে। সৈন্যদের পালন করার অর্থ বা সামর্থ নেই তোমার। যে বেদৌরাকে কামনা করেছ তার ক্ষমতা দেখতে চাও তুমি? দেখ, তোমার পতাকা তোমার হাতেই জ্বলে উঠবে এখনি।' বেদৌরা ফুঁ দিতেই বাদশা আরিফেব হাতের পতাকাটিতে আগুন ধরে গেল। জ্বলতে লাগল হু হু করে। সেটা বাদশা তুলে ধরে অকস্মাৎ বেদৌরার গায়ের ওপরে নিক্ষেপ করে দিলেন। চকিতে তরবারীর আঘাতে সেটা ফেলে দিলে বেদৌরা। পেটে পা মেরে ইংগিত করতেই ঘোড়াটা নাচতে লাগল সেই পতাকার ওপরে।

রাজা তাঁর পতাকার অবমাননা দেখে ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, 'তবে রে জাদুকরী, পরদেশী ডাইনী, তোর এইবার জীবনান্ত হোক।' বাদশা তলোয়ার তুলে জোরে আঘাত হানতেই বেদৌরা চকিতে পেছিয়ে এসে এক আঘাত হেনে রাজার শিরস্ত্রাণ উড়িয়ে দিলে। রাজা তখন দু-হাত তুলতেই যুদ্ধ বেধে গেল।

প্রথমেই রাজসৈন্যের বিপুল বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ফরিদের বাহিনীর দিকে। বেদৌরা আর সেনাপতি খালেদ তাদের বাহিনী নিয়ে পর্বতের দুই দিকে পালাতে শুরু করল। তাদের পিছু ধাওয়া করে এসে গড়ের নিম্নভূমির মধ্যে পড়ল রাজসৈন্যরা। কিন্তু ফরিদের দুটি দলই উধাও হয়ে গেল!

আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল পর্বতের ওপর থেকে। এমন ভীম গর্জন কখনো কেউ শোনেনি আগে। দলটা ছিন্নভিন্ন আহত মৃত

পলাতক হয়ে গেল। আবার ছুটি পলাতক দলের পিছনে ধাওয়া করে এসে গড়ের খাদের নিচে পড়ে মার খেল রাজার বাহিনী। যারা যায় তারা আর ফেরে না! বাদশা দেখলেন, এভাবে তো বেশি সৈন্যক্ষয় চলে না। অনেকেই আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ে দলে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ হাজারখানেক সৈন্য ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ময়দানের শেষ প্রান্তের রাজসৈন্যদের ওপরে। তলোয়ারে তলোয়ারে যুদ্ধ বাধল, বর্শায় বর্শায়। বারুদের পটকা ফাটতে লাগল।

আবার সেই আগ্নেয়াস্ত্রধারী জনপঞ্চাশ সৈন্য এসে গুলি চালাতে শুরু করল। প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের জনপঞ্চাশ জালে জড়িয়ে ধরে পাকড়াও করে ফেলল তারা।

ছত্রভঙ্গ পরাজিত বিপুল সংখ্যক রাজসৈন্যের অনেক নিহত, আহত, বন্দী হয়ে, অবশিষ্ট সকলে পলাতক হল।

তাঁবু লুটপাট করে রশদ সংগ্রহ করতে লাগল ফরিদের বাহিনী।

রাজাকে ধরা গেল না। তার অর্থ, এখনো রাজার হার হয়নি। পালিয়ে গেছেন রাজধানীতে। সেখানে গিয়ে তিনি আরো ক্ষমতা সঞ্চয় করবেন।

দেরি করলে চলবে না। গড়ের মধ্যে বন্দীদের পুরে রেখে বাইরে পাহারা বসিয়ে দিয়ে ফরিদ তার বাহিনীকে হুকুম দিল রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করতে। 'হো-হো-হো—হো-হো-হো—নারায়ে তক্‌বীর—আল্লাহু আকবর'—এত সৈন্য কোথায় ছিল কে জানে! গ্রাম শহর ঝেঁটিয়ে সাধারণ মানুষরাও অস্ত্রপাতি নিয়ে ধাওয়া করেছে দুরাচার বাদশার রাজধানী আক্রমণ করতে। অনেকের হাতে লাঠি, বঁটি, কাটারী, ছোরা, তলোয়ার, বর্শা!

ফরিদ হেঁকে বলল, 'পীর বাহ্‌রামের অপমানের বদলা চাই। নইলে এ রাজ্যে শান্তি আসবে না। ভাইসব, এগিয়ে যাও। রাজধানী আক্রমণ করো। আমি তোমাদের অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি দেবো। দারিদ্র্য আমি দূর করে দেবো দেশ থেকে। এগিয়ে যাও।

আমাকে সাহায্য করলে পীর বাহ্‌রামকেই সাহায্য করা হবে—আল্লার রাহেই সাহায্য করা হবে। যারা এই ধর্মযুদ্ধে মরবে, তারা শহীদ হবে।'

বাগদাদ নগরীতে যখন ফরিদের লক্ষাধিক বাহিনী এসে পড়ল, দেখল, শহরের কোথাও কোনো মানুষজন নেই। দোকানপাট, ঘরবাড়ি সব বন্ধ! রাজপ্রসাদ, দুর্গ আক্রান্ত হল। দুর্গের ওপর থেকে আগুনের তীর এসে পড়তে লাগল। দুর্গের সিংহদ্বার ভেঙে বন্যার স্রোতের মতো সৈন্য আর জনসাধারণ ঢুকে গেল।

রাজপ্রাসাদের মধ্যেও ফরিদের বাহিনী ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল। তারপর ভেতরের সৈন্যরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল। রাজঅন্তঃপুরের বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, নারী এবং শিশুদের গায়ে যেন কেউ হাত না তোলে আদেশ দিল ফরিদ।

সৈন্যরা লুটতরাজ শুরু করতে ফরিদ নিষেধ করতে পারল না।

অবশেষে রাজা আরিফকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বেদৌরা কান ধরে টেনে আনল—লায়লা যখন তাকে চিনতে পেরে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আর সে দেখিয়ে দিল মহিলা বেশধারী রাজাকে!

বেদৌরা বলল, 'এই যে কুত্তা! কোথায় তোমার সিংহাসন, লোভ, লালসা—এই, বন্দী করে নিয়ে চলো টানতে টানতে। মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দাও।'

এবার উল্টো দিকে স্রোত বইতে লাগল। জনসাধারণ আর সৈন্যরা যে যার মতো ধনরত্ন লুটপাট করে নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ফরিদকে নিয়ে জয়োল্লাস করছে প্রধান প্রধান সেনারা। ফরিদ কয়েকজন সৈন্যের হাতে রাজবাড়ির ভার দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠল এসে। পাশে তার বেদৌরা। গাড়ির পিছনে কোমরে দড়ি বাঁধা রক্তাক্ত দেহ রাজা আরিফ। তাকে টানতে টানতে চলল ঘোড়ার গাড়ি। ফরিদের সামনে পিছনে পাশে ঘোড়-সওয়ার-বাহিনী এগিয়ে চলেছে।

খুব আস্তে আস্তে চলল গাড়ি।

পার্বত্য গড়ের মুখে এসে পৌছল সকলে।

বহু মানুষ। মানুষের মিছিল। কত লক্ষ মানুষ কে তার হিসাব করে।

যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকরা ফল-রুটি-খেজুর খেতে লাগল—কোথা থেকে আসছে সে তারাই জানে!

অগণিত মানুষ জমছে।

সন্ধ্যা সমাগত।

ফরিদ একটা উঁচু পাথরের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম জানানোর পর বললে, 'আপনারা এখন সকলে অবনত মস্তকে পীর বাহ্‌রাম আল্‌-বায়াতের পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ মৌন থেকে দোওয়া-দরুদ পড়ুন।'

জনসাধারণ সকলেই বাধ্য হয়ে অবনত মস্তকে প্রার্থনা শুরু করল।

ফরিদ আল্লার কাছে হাত তুলে তার জলদ গম্ভীর সুরেলা গলায় পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ করতে শুরু করল।

প্রার্থনা শেষ হলে ফরিদ সকলকে শুধোল, 'এই রাজমুকুট আর রাজদণ্ডের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করার বাসনা আপনাদের মধ্যে কারো আছে কি? থাকলে হাত তুলুন। নির্ভয়েই হাত তুলুন, আমি তাঁর মাথাতেই রাজমুকুট পরিয়ে দেবো। তাঁকেই রাজদণ্ড দান করব।'

কেউ হাত তুলল না। সবাই বলল, 'আপনিই আমাদের রাজা।'

'আপনিই মুকুট পরুন, রাজদণ্ড ধারণ করুন। রাণী বেদৌরাই আপনাকে রাজদণ্ড দান করুন।'

সেনাপতি খালেদ-বিন-আমিন একথা বললে সকলে মারহাবা বলে ধ্বনি দিয়ে উঠল।

বেদৌরা রাজমুকুট ধরে জন সাধারণের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হাসতে লাগল। নিজের শিরস্ত্রাণ আর বর্ম সে তখন খুলে

ফেলেছিল। সবাই হাততালি দিতে লাগল। বেদোরা ফরিদের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিল। ফরিদ মস্তক অবনত করল।

লক্ষ লক্ষ জনতা ফরিদের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

তারপর তাকে রাজদণ্ড দান করা হল।

আবার জয়ধ্বনি, উল্লাস চলল কিছুক্ষণ।

এরপর ছোট্ট একটি মুকুট—যা রাণীর মাথা থেকে খুলে আনা হয়েছিল—সেটি নিজের হাতে ফরিদ বেদৌরার মাথায় পরিয়ে দিতে আরো জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা।

মশাল জ্বলে উঠল হাজার হাজার।

ফরিদ বলল, 'প্রথমে রাজা হয়েই আমার পদাধিকার বলে আমি প্রাক্তন রাজা আরিফকে আগামীকাল সকাল সাতটার সময় ফাঁসী দেবার হুকুম দিলাম।'

আবার জয়ধ্বনি দিল সকলে।

তারপর সভা ভঙ্গ করা হল। সাধারণ লোকরা যেযার বাড়ির দিকে চলে গেল।

সৈন্যরা ময়দানে, গড়ের খাদে, উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে সুরাপান করে নাচতে-গাইতে লাগল।

বেদৌরাকে নিয়ে এলো ফরিদ পাষাণপুরীর নিভৃত কক্ষের মধ্যে।

বলল, 'ইরাকের রাণী, এই আমার শয্যাকক্ষ।'

॥ ছত্রিশ ॥

শূন্য রাজপ্রাসাদ।

অলঙ্কার, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড়, থালাঘটি, আসবাব-পত্র---সবই লুট হয়ে গেছে। সামলানো যায় নি। ফরিদ তখন তেমন করে ভাবে নি যে সে-ই এই মুলুকের রাজা হবে আর সব সম্পদই তার ভোগ-দখলে আসবে। সে ভেবেছিল অত্যাচারী রাজা ধ্বংস হোক, লুট হয়ে যাক তার যথা-সর্বস্ব। সাধারণ মানুষরা পাক কিছু কিছু সম্পদ। যেমন হঠাৎ ছোটখাটো একটা বন্যা হয়ে নদী-খাল-বিল-পুকুর সব একাকার হয়ে যায় আর মাছেরা তীর বেগে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে-ঘাটে-পথে মানুষের জালে-ফাঁদে-কৌশলে ধরা পড়ে, এও তাই। তবে সাধারণ মানুষ যেসব দামী দামী অলঙ্কার মণিমাণিক্য পেয়েছে তা সবই আবার ঘুরে ঘুরে রাজ-প্রাসাদেই ফিরে আসবে। কেননা গরিব লোক পেটের দায়ে তা বিক্রি করবে সাধারণ ব্যবসায়ীকে। সে বেচবে শহরের বাঁধা দোকানীকে। তারপর আসবে বড় মহাজনের হাতে। শেষ পর্যন্ত রাজাই বেশি দাম দিয়ে তা প্রাসাদে এনে ঠাঁই দেবে।

ফরিদ ভাবছিল, কাল তার অভিষেক! বেদৌরা তাই নিয়ে মহা ব্যস্ত! লোকজন নিয়ে সে বসরায় গেছে তার বাপ-মাকে আনার জন্যে। অভিষেকের পরেই তাদের বিয়ে হবে, সেই রকম কথা হয়েছে দুজনের মধ্যে।

কিন্তু ফরিদ যেন তা চাইছিল না। রাজা হলে তাকে এই দেশের ভাল-মন্দর কথা ভেবে ভেবে পাগল হতে হবে—কোথাও যেতে পারবে না। বিচরণশীল মন তার কি করে এই প্রাসাদ-কুক্ষির

মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবে? দরবার থেকে প্রাসাদ এইটুকুই তার জগৎ হবে। তারই মধ্যে চুল পাকবে—হাত-পা পড়ে যাবে! বসে বসে হুকুম চালাবে শুধু। সোনার সিংহাসনে বসে গোলাপ ফুল শুকবে রাজমুকুট পরে—বাঁ-পাশে থাকবে সুন্দরী নারী, ডানপাশে সুরা!

না, তার একহাতে থাকবে কোরআন শরীফ, অন্যহাতে তলোয়ার। খলিফা ওমর ফারুকের মতো।

উঠে পায়চারী করতে লাগল সে। ঝাড়বাতি জ্বলছে। যদি হঠাৎ ঘেরাও হয়? অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে কারা যেন সব নড়াচড়া করছে? ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি!

ফিসফিস কথাবার্তা! রহস্যময় রাত। প্রহরীরা জাগছে। বেদৌরা যদি নিহত হয় পথেই? না, অসম্ভব। আসবেই সে।

তার সব মণিমাণিক্যগুলোই গেল সৈন্য আর অস্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে—মিশরের পিরামিড থেকে এনেছিল সে কত কষ্ট করে। যুদ্ধের পোষাক পরে তরবারী হাতে নিয়ে ফরিদ রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে দেখল সান্ত্রীরা পাহারায় জাগ্রত। বলল, 'আমি বাইরে একটু ঘুরে দেখি। বানী বেদৌরা আসবেন তাঁর দলবল নিয়ে বোধহয় ভোর রাতে?'

'জী হুজুর, জাঁহাপনা!'

ফরিদ মশাল নিল না। একটু যেতেই চিৎকার শুনল, 'কে যায়—দাঁড়াও—নইলে বিপদ হবে।'

ফরিদ দাঁড়াতে প্রহরী সরদার এগিয়ে এসে মশাল তুলে তাকে দেখল। তারপর কুর্নিশ করতে করতে সরে গেল। হঠাৎ শিঙ্গা বাজতে লাগল: বাদশা বের হয়েছেন নিজে—অতএব সাবধান!

ফরিদ আর বাধা পেল না। কত দূর আসার পর নির্জন মাঠ, পাহাড়ী উপত্যকা পেল—ভোরের জ্যোৎস্নায় সে একটি চেরিকুঞ্জের নিচে এসে বসল। ভাবতে লাগল, কেন তার মধ্যে এই বিষণ্ণতা? এখন যদি তার শূন্য সিংহাসন কেউ দখল করে নেয়? নিক গে।

যে কেউ বসে গেলেই কি তাকে লোকে মানবে? তার সেনাপতিও বসতে পারে? সেনাপতি তো আসলে বেদৌরা।

আচ্ছা, এমন কীর্তি করলে হয় না, অভিষেকের আগেই সে আবার ছদ্মবেশে চলে গেল ভারতে তার মাকে দেখতে, অথবা সঙ্গে করে আনতে। নিয়াজীর সরাইখানায় উঠবে, আসমার কি বিয়ে হয়ে গেছে? শুধু বড় হীরকখণ্ডটাই যা আছে এখন তার কোমরে—একটা থলির মধ্যে—দিয়ে দেবে শাহজাহানকে? চলেই যাবে সে। কি হবে বিষয়-সম্পদ। স্বার্থপর হবে সে? জমির জন্যে, নারীর জন্যে, টাকার জন্যে, এই মরজীবনের ক্ষণিক সুখের জন্যে কি সে সাধারণ মানুষের মতো স্বার্থপর হবে। কিছু দরকার নেই। বেদৌরাই ওসব দেখবে। রাজ্যটা জিতে তাকে দিয়ে গেল। কিন্তু বেদৌরার দৈহিক সুখের আকাঙ্খা যে তাকে পাগল করে রেখেছে···

এখানে বড় নির্জন। শুধু ঝিরিঝিরি হাওয়া আর নির্মল জ্যোৎস্না। সাদা ঘোড়াটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছবির মতো। একটুও নড়ছে না। শিক্ষিত ঘোড়া! টুসকি মেরে ডাকতেই এগিয়ে এলো। পিঠের জিন খুলে মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ফরিদ। লাগাম খুলে ঘোড়াকে চরে খেতে ইংগিত করল।

নিজের ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল ফরিদ চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তারপর তার ঘুম এসে গেল। ইচ্ছে করেই সে ঘুমিয়ে পড়ল এই নিরাপদ নির্জনতা দেখে।

কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ মুখের ওপরে কি যেন চরে বেড়াচ্ছে না তার? শিউরে উঠছে শরীর!

ঘুম ভেঙে যেতে দেখল, বেদৌরা! গোলাপ ফুল নিয়ে মুখের ওপর বুলোচ্ছে। হাসছে সে। ভোরের আলোয় তার মুখখানা কি চমৎকার উদ্ভাসিতই না দেখাচ্ছে! ফরিদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে বুকের ওপর টানল।

'কেন এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? যদি তোমাকে খুঁজে

না পেতাম? আজ তোমার অভিষেক, আজ তোমার সাদী মোবারক।'

'আর তোমার?

'আমি কে, আমি তো উপলক্ষ মাত্র।'

'তাই থাকো। কে তোমাকে বলল, আমি এদিকে এসেছি।'

'আমি পাহারাদারদের বলে রেখেছি, তোমাদের রাজাকে একটু চোখে চোখে রাখবে।'

'কেন?'

'বাহা রে, রাজা বলে কথা! তার ওপর কবি, খেয়ালী, ভবঘুরে —যদি আমার আকর্ষণ হারিয়ে যায় তো তুমি কি মড়া আঁকড়ে সংসারে চিরকাল পড়ে থাকবার জীব নাকি?'

'বুঝেছ তাহলে!'

'চলো। বাবাজী, আম্মাজান, লায়লা, রস্তম পালোয়ান সবাই এসেছেন।' ফরিদকে টেনে তুলল বেদৌরা। ঘোড়ায় জিন দিল— লাগাম পরাল।

দুজনে ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি চলল। বেদৌরার মাথার মুকুটের ওপরের পালকের উষ্ণীষটা অপূর্ব দেখাচ্ছে!

'জানো বেদৌরা, তোমাকে পেয়ে আমার জীবন সার্থক, কেন না হঠাৎ আমি কোথাও যদি চলে যাই, জানি, এ রাজ্যের মানুষরা তাদের যোগ্য প্রতিনিধির অভাব বোধ করবে না।'

'কি এমন করলাম গো আমি—এখনো তো তবু কারো ফাঁসীর হুকুম দিই নি। চারটে রাস্তা, পুষ্করিণী, বিশটা পান্থশালা, একশোটা মসজিদ গড়ে দিই নি।'

'দেবে, তুমি দেবে। জানি, তুমি এই রাজ্যের খুবই আদরের মনিব হবে। সেই জন্যেই সাধক জীবন কেটেছে তোমার নিষ্পাপ আশ্রমে।'

ওরা দুজনে এসে গোসল করল।

তাগাদা লাগাচ্ছেন বণিক হেদায়তউল্লাহ্। হাজার হাজার লোক

আসছে দরবারে। বাজি - বাজনা বাজতে শুরু করল। পট্‌কা ফাটতে লাগল। রাজপ্রসাদের চারপাশ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

ফরিদকে রাজপোষাক পরানো হল। দরবারে এনে রাজকীয় কায়দায় মুকুট আর রাজদণ্ড দান করা হল। জয়ধ্বনিতে প্রাসাদ ফেটে যাবার উপক্রম।

বেদৌরার মাথায় মুকুট দেওয়া হল।

বণিক হেদায়তউল্লাহ্ কন্যার হাত ধরে ফরিদকে সম্প্রদান করলেন। রাজ্যের বিখ্যাত মৌলানা সাদী পড়ালেন। এরপর সোনাদানা জড়োয়া-জহরত বখশিস দিলেন বণিকরা। হাতীর পিঠে করে সেসব এসেছে। রাজপ্রাসাদ আবার ভরে যাবে এত উপঢৌকন আসতে লাগল। বেদৌরা হাত পেতে গহনা, কাপড়, ফুলের তোড়া নিতে লাগল। রাজ্যের বড় বড় বণিক, রত্নাকররা তাঁদের বহুমূল্য হার, আংটি, মুকুট, চূড়া কত কি দিতে লাগলেন।

সিংহাসন, পালঙ্ক, বিছানা, আসবাব সবই এলো।

খানাপিনা শুরু হল। রাতভর এসবের আয়োজন হয়েছে প্রাসাদের পিছনের বাগানে, বেদৌরার হুকুমে। আমোদ-স্ফূর্তি খানাপিনা চলল মাঝরাত পর্যন্ত।

ফরিদ সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অন্তত লাখখানেক লোকের সঙ্গে করমর্দন করেছে। এখন ক্লান্ত, অসুস্থ সে।

ফুলের শয্যায় পড়ে সে যেন নিহত পক্ষীশাবকের মতো ঘুমিয়ে পড়ল মুহূর্তেই।

বেদৌরা এসে শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে বসে বসে রাত কাটাল। হায়! আজ তাদের ফুলশয্যা!

স্তব্ধ বিস্ময়ে ক্লান্ত হতচেতন ফরিদের দিকে অপলকে তাকিয়ে বসে রইল বেদৌরা। চারদিকে তার ফুলের সুবাসে বাসর-কক্ষ মোহিত।

বিচিত্রবর্ণ ঝাড়ের আলো রামধনু রঙ ছড়িয়ে স্বর্গলোক তৈরি করেছে যেন। ফরিদের সুন্দর মুখখানার ওপরে সেই রঙ খেলা,

করছে। বাইরে তখনো অপূর্ব সুন্দর দ্রুততালের বাজনা বাজছে গমকে গমকে। তালি বাজিয়ে নাচছে কিছু লোক। মেয়েরা তাম্বুরা বাজিয়ে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নেচে আসর গুলজার করে রেখেছে।

কিন্তু ফরিদের চোখে হঠাৎ এতো ঘুম এলো কেন? নাসারন্ধ্রে গোলাপের সুড়সুড়ি দিয়ে কি জাগিয়ে দেবে ওকে? যদি বিরক্ত হয়? পদ্মপলাশ চোখে বিরক্তি বা ক্রোধ অথবা তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে যদি? এখন যে তার ফরিদ—রাজা! রাজার কথাই আইন। হয়তো বলবে এই মরুকন্যাটির কোনো সহবত শিক্ষা হয়নি—একে আবার সেই পীরের দরগায় রেখে এসো। অথবা বসরায় এর বাবা বণিক হেদায়তউল্লার কাছে পাঠিয়ে দাও!

তার রাজা এখন ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক, ক্লান্তি দূর হোক। ক্লান্তির মধ্যে যে পাওয়া তা তো বিকলাঙ্গ দুর্বলতা।

লক্ষ টাকার জড়োয়া, মণি-মুক্তা, চুনিপান্না, সূর্যকান্তমণি, নীলকান্তমণির গহনা পরানো হয়েছে রত্নাকরের কন্যা ইরাকেশ্বরী বেদৌরাকে। বহুমূল্য পোষাক তার পরণে। লোধ্রফুলের রেণু তার কপোলে। অধরে লোহিত আভা।

আয়নায় নিজের বেশ দেখলে বেদৌরা। এই বেশ দেখেছে ফরিদ। সে একচোখ দেখে মৃদু হেসেছিল শুধু। তাতেই বেদৌরার বুকের ভেতরে যেন সমুদ্র-তোলপাড়-করা ঢেউ উঠল।

সাদী মোবারকের পর একবার কিছুক্ষণের জন্য তাদের আড়ালে একটা ফুলের তোড়া ঘেরা জায়গার মধ্যে পরস্পরকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। ফরিদ রাজবেশে, দুলহাবেশে ফুলের মালা পরে দাঁড়িয়েছিল শুধু তার দিকে তাকিয়ে। তারপর হাত তুলে তার চিবুক ধরে মুখটা একটু উঁচু করল। লজ্জায় আর আবেশে যেন চক্ষু মুদে এলো বেদৌরার।

কোমল আর উষ্ণ কম্প্রমান, আকাঙ্খিত, বিহ্বল অধরে অধর দুটি ধীরে নামিয়ে দিল।

তারপর দুটি চোখে চুম্বন করল। তার হাতে, গলায়, বুকে, মাথায়।

ফরিদ ঘনস্বরে বলল, 'রাণী, তুমি দাও।'

বেদৌরা বলল, 'রাজা! আজ আমার কেন এত লজ্জা, এত বিহ্বলতা। রাজা, আমি নিবেদিতা। তুমি যেমন খুশী তেমন ভাবে আমাকে লও কিন্তু আমি আগে পারি না।'

লায়লা তাগাদা লাগাল, 'না না, এখানে বেশিক্ষণ নয়। ফুল-শয্যার রাত আছে।'

সেই রাতে যখন আসমান থেকে জ্যোৎস্নার গলা-সোনা গলে গলে ঝরছে গোলাপকুঞ্জে, ঝাউশাখায়, খেজুর-বীথিতে—যখন বিচিত্রবর্ণ ঝাড়ের আলোয় মখমল মোড়া বিছানায় স্বর্গ খেলা করছে—ফুলের সুঘ্রাণে প্রেমকাতর হৃদয় যখন বিহ্বল—রাজা তখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

বেদৌরার মনে হল সে অভিশপ্ত। নইলে এমন সময়ে ফরিদ ঘুমিয়ে পড়বে কেন? তার কোমল গোলাপী পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিল বেদৌরা মাথার চুলের সোনার কাঁটা দিয়ে। ফরিদ একটু নড়ল। ঠোঁট দুটো মৃদু কাঁপল। চোখ মেলল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপোলে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে পালঙ্ক থেকে নেমে এলো বেদৌরা।

পাশের ঘর ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকার করা।

মাঝখানে একটি মোমবাতি বসানো। মেঝেতে শীতলপাটি বিছানো। রেহেলে কোরআন শরীফ পাতা।

স্নানাগার থেকে অজু করে এসে পবিত্র কোরআন পড়তে বসল বেদৌরা। মৃদু কণ্ঠে নয়, গানের মতো সুরের লহরা তুলে। তার সেই স্বরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল প্রাসাদের অভ্যন্তরে। কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভেঙে গেল ফরিদের। গান শুনতে পেল সে পাশের ঘরে। না, গান তো নয়, কোরআন শরীফ পাঠ করছে বেদৌরা। এত তার কণ্ঠের তেজ! সমস্ত বাড়িটা সেই প্রতিধ্বনিতে মুখরিত।

ফরিদ দোরের পর্দা সরিয়ে দেখল। কিছুক্ষণ দেখল, অপরূপা বেদৌরা! কিন্তু এখন কেন এই অনুশাসন? এটা কি আনন্দের প্রশস্তি, না তপস্যার একাকীত্ব রক্ষা? নারীদেহভোগের স্বাদ, সুখ,

শিহরণ নিশ্চয়ই স্বর্গীয় কিন্তু ফরিদের মনে একটা খেলা শুরু হল, যে নারী কখনো পুরুষ সাহচর্য বা সহবাস ভোগ করেনি, যে প্রতিটি রোমকূপে রোমকূপে এখন আকাঙ্খিতা, তাকে আরো বিরোহিনী করে তোলার মধ্যে একটা করুণ কিছু বা নির্মম সুখ আছে।

তবে কি ফরিদ দুঃখবাদী? অনেক সুখ সে চায় না, না সহ্য হয় না?

তার কণ্ঠের মধ্যে একটা নির্বোধ অভিমান ফেনিয়ে উঠল। নীলোফারের কথা মনে পড়ল। এমন সময় ছিল তার জন্যই সঠিক। সে ছিল লাস্যময়ী কিন্তু জটিল মনের গহনে ছিল তার কত দুর্ভেদ্য পথের রেখা—সে পথে কত মায়াজাল অথবা আকাশ-চেরা বিদ্যুৎ, অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ করতে পারত না।

নীলোফারের কথা, সারার কথা, আসমার কথা, মায়াকাননের এলিজা, হাসনু, শিরিনদের কথা মনে পড়ে?

থাক, ও-ও থাক! কেন তার শয্যাতলে অপেক্ষা করল না! কেন ছল করে অন্তত ঘুমিয়ে পড়ল না তার জাগার অপেক্ষায়। সে ঘুমিয়ে পড়েছিল ক্লান্তিতে। পড়বে না? লক্ষাধিক লোক তার সঙ্গে হাতে হাতে মিলিত হয়েছে। প্রত্যেকে ইনাম দিয়ে গেছে।

পোষাক পাল্‌টে ফেলল ফরিদ। এতদিন পরে হঠাৎ আজ সে সুরাপান করল রঙিন পাত্র থেকে। তারপর তলোয়ার কোমরে বেঁধে বাইরে এসে প্রহরীদের জানাল ঘোড়া বার করতে।

সেনাপতিকে বলল, 'সাবধান, রাজ্যপাট রক্ষার ভার তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। রানী বেদৌরা সিংহাসনে বসে বিচার করবেন, রাজ্য চালাবেন, তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে। তাঁর যেন অসম্মান না হয়। আমি কিছুদিনের জন্য হিন্দুস্তানে যাচ্ছি একাই—ছদ্মবেশে। আমার জননীকে আনতে যাচ্ছি।'

সেনাপতি বলল, 'হুজুর, বাদশা হলেন, একদিনও বাদশাহী করলেন না, এ কেমন ব্যাপার হবে? আমি কি সবকিছু সামলাতে পারব?'

'বেদৌরা তো আছেন—আমার চাইতেও ক্ষমতায় অধিক—তাঁর দ্বারাই জগতের জীবের কল্যাণ হবে বেশি—কেননা তিনি পুণ্যবতী। আমি সাধারণ পাপী মানুষ। যা হুকুম করছি তা শোন। রানীকে সব কথা জানাবে দুপুরের পর।'

ফরিদ ঘোড়ায় উঠে জ্যোৎস্না-ধারায় অবগাহন করতে করতে চলল একাকী। হীরকখণ্ডটি আর কিছু সোনার মোহর আছে তার সঙ্গে।

সে কি একটা জেদের বশে চলে যাচ্ছে? তবে তার চোখ উপছে গণ্ড বেয়ে অশ্রু নামছে কেন?

॥ সাঁয়ত্রিশ ॥

পারশ্য রাজ-প্রাসাদের কাছে এসে ঘোড়া থামিয়ে একজন সেনাধ্যক্ষকে বলল ফরিদ, 'যুবরাজ শাহ পারভেজের আমি সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

'কি নাম?'

'ফরিদ।'

'ব্যাস?'

'হ্যাঁ।'

সৈনিক ফিরে এসে কুর্নিশ জানিয়ে তাকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল।

পারভেজ ছুটে এলো: 'আরে আরে ভাইয়া—কেমন আছেন, আসুন আসুন। জানি আমি, ইরাকের এখন আপনি অধীশ্বর! এই যে সারা—আপনার শ্যালিকা-রাণী।'

সারা কদমবুসি করল ফরিদের।

পারভেজ আর ফরিদকে আলিঙ্গনাবস্থায় দেখে সারার চোখে অশ্রু এসে গিয়েছিল আনন্দে।

ফরিদ দেখল সারা ঠিক তেমন আর নেই, একটু মোটা হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ বাদশা শাহ আব্বাসের সঙ্গে দেখা করে এলো ফরিদ। বাদশাকে অপূর্ব সুন্দর দেখতে। তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'তুমি তো বাদশা জাহাঙ্গীরের পুত্র। তোমার মা-জননী খাসবেগম নূরজাঁহার প্রধান বাঁদী ছিলেন, এই বলেন বাদশা শাহজাহান তোমার সম্পর্কে কেউ পরিচয় নিতে চাইলে। যাকগে, তুমি আমার ছেলের ভায়রাভাই, নিকট কুটুম্ব, তো বেটা, তুমি যদি কান্দাহার, গজনী রাজ্য চাও তো দিতে পারি তোমাকে।'

বিনয়ে হাসল ফরিদ। বলল, 'ধন্যবাদ, যুবরাজ শাহ পারভেজ পেলেই আমার পাওয়া হবে!'

পারভেজ বলল, 'আব্বাজান, উনি তো এখন ইরাকের সুলতান।'

'তাই নাকি। বাঘের বাচ্চা বাঘ! আচ্ছা এসো, তোমরা আনন্দ করো। উৎসব করো।'

সারার লাজনম্র মুখে ললিত আভা। স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে যেন ফেটে পড়ছে।

ফরিদ দেখল শাহ পারভেজ অপরূপদর্শন যুবক। সারার ঠকা হয়নি। তার শ্বশুর কবি গওস্থল আনামের ওপরে যে ক্ষোভ ছিল এখন যেন তা লাঘব হয়ে গেল। সারা সুখী হলেই তার সুখ। যাকে ভালবাসি সে যদি সুখে থাকে তবে কার জন্য আর দুঃখ?

নাস্তা-খানাপিনার আসরে শাহ পারভেজ একটি বিদেশী কুকুরকে নিয়ে আদর করতে করতে ফরিদকে বলল, 'আপনার কথা সারার মুখে অনেক শুনেছি। নীলোফার নামে আপনার যে অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্না স্ত্রী ছিলেন তাঁকে নাকি সারার মতো একই রকমের দেখতে ছিল?'

ফরিদ বলল, 'আমি তো সারাকে যখন প্রথম দেখি নীলোফার-বলে ভুল করি। পরে জানলাম তার যমজ বোনকে দুর্দিনে পীরচেঙ্গি কিনে নিয়ে চলে যান ভারতে।'

'কিছু মনে করবেন না ফরিদ-ভাই, আমি একটু ব্যস্ত আছি দরবার-কক্ষের একটি খুনের বিচার নিয়ে। পরে দেখা হবে। আপনার শালীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করুন। অনেকদিন দেখা নেই।'

পারভেজ চলে গেল।

পারস্যের রাজ-প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষ। বর্ণাঢ্য দামী আসবাবপত্র। দামী গালিচা পাতা। মখমলের শয্যায় শরীর ঢেলে শুয়ে পড়ল ফরিদ।

সারা ময়ূরের পাখা হাতে নিয়ে একটা রুপো মোড়া কেদারায় বসে তাকে মৃদু ব্যাজন করতে লাগল। বলল, 'দুলাভাই, হঠাৎ আপনি যে এভাবে হতভাগিনীকে দেখতে আসবেন তা

স্বপ্নেও ভাবি নি। আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে! আব্বাজান, কেমন আছেন?'

'আন্দাজ করি ভাল নেই। বৃদ্ধ বয়সে একা হয়ে গেছেন। তুমি বলতে, তোমার রমণীয়...'

'স্থ—' ঠোঁটের সাহায্যে শব্দ করে ও-প্রসঙ্গে কিছু না বলতে ইংগিত করল সারা।

ফরিদ সাবধান হল। বলল, 'তোমাকে দেখলে নীলোফারের কথা মনে পড়ে।' -

'জানো দুলাভাই, আমার সেই সুরের জীবন, কুমারী জীবনযাপন কত স্বপ্নভরা ছিল। এখানে আমি বন্দিনী। আর এক গুণীন মেয়ে আমার জীবনতর্পণ করে জানিয়ে গিয়েছিলেন আমি নাকি সতীত্ব হারিয়ে ফেলেছি আগে। এবিষয়ে যুবরাজকে খুঁটিয়ে সবকিছু জানতে তিনি নিষেধ করে গিয়েছিলেন। কেননা তাঁরও অর্ধেক শরীরে তিনি কালো দেখেছিলেন।'

'সেই গুণীন মেয়ে কে জানো?'

'জানি না তো!'

'আমার মায়ের কাছাকাছি সম্পর্কের বোন হন তিনি। নাম সালেমা। যাক, সেসব কথা। একটি সংবাদ তোমাকে জানাই। যখন তোমার ডালিম-রসে আমার জীবন সিঞ্চিত হয়েছিল ঠিক তখনি সাধিকা বেদৌরার আশ্চর্য জীবন যদি আমাকে মুগ্ধ-মোহিত না করত, হয়তো আমি শাহ পারভেজের শত্রু হতাম। হয়তো তোমাকে নিয়ে ভারতে বা অন্য কোথাও পালিয়ে যেতাম। তাতে অবশ্য তোমার আব্বাজানের জীবন নিরাপদ থাকত না। যাক, আল্লা যা করেন ভালই করেন। আচ্ছা সারা, তুমি কি এখন মা হতে চলেছ—নইলে এমন নধর চেহারা কেন?'

সারা লজ্জা পেল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'দুলাভাই, তোমার আন্দাজ ঠিক।'

ফরিদ আর কিছু বলল না।

হঠাৎ বলল, 'এই সারা, তোমাকে একটা ......।'

'দুষ্টু কোথাকার! বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিল সারা ফরিদের মুখের সামনে।

ফরিদ সেই অপূর্ব সুন্দর হাতখানায় একটা চুম্বন করার পর সারা হঠাৎ বেরিয়ে গেল পর্দা সরিয়ে অন্তকক্ষে। আর সে এলো না।

রাত্রে আহারের আসরে পারভেজের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল ফরিদ। গান গেয়ে শোনাল। নাচের আসরে নাচ দেখল। তার পর রাত্রিতে যখন একা শুলো এসে মনে পড়তে লাগল বেদৌরার কথা। কি করছে সে এখন? সে কি তেমনি মোম জ্বালিয়ে একা নির্জন কক্ষে কোরআন শরীফ পড়ছে আর কাঁদছে তার জন্যে? সেটাই সম্ভব। কেন সে এমন করে হঠাৎ পালিয়ে এলো! কেন সে সরাসরি তাকে দু'কলম কিছু লিখে দিয়ে এলো না?

কেন সে বেদৌরাকে কষ্ট দিতে গেল? কত আশায় সে পলে পলে দিন গুনেছে। প্রথম পরিচয়ের সময়কার রহস্যময় নগ্নতা দেখে তার মুগ্ধ হয়েছে। সেই মেয়ে সমস্ত শুচিতা রক্ষা করল কেননা তার পীরের হুকুম ছিল যেন বিবাহের আগে সে শারিরীক শুচিতা নষ্ট না করে। তাতে তার সাধক জীবনের পতন ঘটবে;• সে আর ইচ্ছে করলে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাতে পারবে না। ইরাকের ভাগ্য ভাল যে ফরিদের পাপ-পুণ্যেভরা জীবনের মিশ্রিত ফলাফল পাবে না তাদের বিচারে। বেদৌরা যে মানুষেরই বিচার করুক, তা খাঁটি খাঁটি নিরপেক্ষ এবং কল্যাণকর হবে। সে-ই যোগ্য হবে ইরাকের জন্য।

অনেক রাত্রে ঘুম এলো ফরিদের চোখে। সকালে নাস্তাপানির পর সে বিদায় চাইল। সারার কোমল গণ্ড বেয়ে অশ্রু নামল। পারভেজ আলিঙ্গন করল।

ফরিদ বলল, 'আমার দুটো আর্জি রইল ভাই পারভেজ। প্রথম, যদি বেদৌরার রাজ্য ইরাকে কোনো রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় তবে আপনি নিজের রাজ্য মনে করেই যেন সর্বশক্তি ব্যয়ে তাঁকে রক্ষা করেন। আমিও সন্ধিবদ্ধ রইলাম পারশ্যের সঙ্গে. যখন সে সাহায্যের

হাত পাতবে আমি বিনা দ্বিধায় এগিয়ে আসব। দ্বিতীয় আর্জি, আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি, জানি, বাদশা শাহজাহান আমার চিরকালের শত্রু। তবু তার প্রাসাদ থেকে আমার বৃদ্ধা জননীকে উদ্ধার না করে আনলে তাঁর শান্তি নেই। এখন মহারানী নূরজাহাঁ নিষ্ক্রিয়, বাদশা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁকে কে দেখবে? যদি আমি বন্দী হয়ে যাই তবে আপনি চেষ্টা করবেন যাতে মুক্ত হতে পারি।'

পারভেজ বলল, 'আপনার এই দুই আর্জির কথা আমার মনে থাকবে।'

ফরিদ তার বহু মূল্যের আংটিটা খুলে পারভেজের হাতের আঙুলে পরিয়ে দিল। তারপর ঘোড়ায় উঠল সে। সারা কাছে এগিয়ে আসতে হেঁট হয়ে তার মাথার ওপরে হাত রেখে চুম্বন করল। সারা কান্না-হাসির দৃষ্টি মেলে একবার ফরিদের পলাশ চোখের দিকে তাকাল।

ফরিদ চলে এলো রাজধানী ছেড়ে দূরে। চলল সে ভারতবর্ষের দিকে।

॥ আটত্রিশ ॥

এক সময় মোমবাতি ফুরিয়ে গেল। আলো নিভে গেল। বেদৌরা কোরআন শরীফ বন্ধ করে চোখ বুজে বসে রইল কিছুক্ষণ। গায়ে তার গয়না আর ফুলের মালা। গন্ধে প্রাণমন মাতোয়ারা।

চোখ খুলে দেখল অন্ধকার ঘরে পর্দার পাশ দিয়ে অস্পষ্ট আলো আসছে। উঠল সে। পর্দা ঠেলে ফরিদের কক্ষে এসে দেখল শয্যা শূন্য। চমকে উঠল সে যখন চোখে পড়ল রাজপোষাক বা বিবাহের বেশ মেঝেয় পড়ে আছে। সমস্ত ফুলের মালা আর হীরে-মুক্তা-সোনার হার পড়ে আছে অবহেলায়। দেখল সোনা-রুপোর নকসা-করা দামী তলোয়ারখানা নেই। ফরিদ এমন সময় কোথায় বাইরে যেতে পারে?

চারদিকের কক্ষগুলোয়, গোসলখানায় খুঁজল সে। একজন হাবসী খোজা বলল, 'বাদশা নামদার ঘোড়ায় চড়ে বাইরে গেছেন। সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলে সব কথা জানতে পারবেন।'

বেদৌরা ফিরে এসে বসল ফরিদের কক্ষে। সেনাপতিকে তলব করল সে তখনি।

খালেদ এসে কর্নিশ করল।

'কি সংবাদ সেনাপতি, বাদশা কোথায়?'

'তিনি ঘোড়ায় চড়ে সাধারণ মুসাফির বেশে হিন্দুস্তানে চলে গেছেন।'

'আপনি পুরো সংবাদটি দিন। উদ্বেগের মধ্যে রাখবেন না।'

'তিনি বলে গেছেন, আমার ফিরতে দেরি হবে, মাকে আমি আনতে যাচ্ছি—রাণীই সিংহাসনে বসে রাজত্ব চালাবেন। আপনারা সবাই তাঁর হুকুম শুনবেন।—যতদিন তিনি না ফেরেন ততদিন আপনি আমাদের পরিচালিকা।'

বেদৌরা বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি এখন যেতে পারেন।

আগামীকাল রাজ্যের সর্বত্র সরকারী ছুটির দিন বলে ঘোষণা করে দিন। পরশু বেলা দশটার পর থেকে বেলা চারটে পর্যন্ত রাজ-দরবার বসবে। মাঝখানে জোহরের নামাজ এবং খানাপিনার জন্য দু' ঘণ্টা ছুটি থাকবে। যার যা আর্জি পেষ করার থাকবে সবই সরাসরি আমার কাছে আনতে হবে। মুলতুবি বা সংখ্যাতীত আর্জির তারিখ ঘোষণা করে দেবেন। আমি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য সারা দেশ থেকে গুণীজ্ঞানী বিদ্বান বিদুষীদের আহ্বান করছি। সবই বাদশা শাহ ফরিদউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নামে চলবে, আমি দস্তখত করব মাত্র।'

সেনাপতি খালেদ চলে গেল কুর্নিশ করতে করতে।

বেদৌরা অনেকক্ষণ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইল। তার মনে হল সব অন্ধকার হয়ে গেছে। এসবের কোনো দরকারই ছিল না। কি হবে এসব? আজ তার বহুদিনের প্রতীক্ষিত বাসর-রাত। সে কি অভিশপ্ত? ফরিদকে দেখে ভুলেছিল সে। এমন রূপবান যুবক আর কখনো দেখেনি। তাই সে পুরুষবেশে থাকলেও মকত্থানের পীরের মাজারের হোজরায় রাতের অতিথি হিসেবে ওকে এনে ওর সামনেই প্রায় নগ্নবেশ হয়েছিল। আজ সেকথা ভাবতেও পারে না। একটা জীবনের খোলস ছেড়ে ফেলতে চেয়েছিল সুপ্ত চেতনার শিকার হয়ে যদিও সে জানত না ফরিদকে মুগ্ধ করতে পারবে কিনা। সে জানত নগ্ন হওয়া অশালীন কিন্তু তার মানসিক দিকটা শিশুসুলভ অভিব্যক্তির মধ্যে প্রায় পুরোটাই ডুবেছিল বলে বোধহয় পাপ হয়নি কেননা পাপ যদি হত তাহলে পীর ইলাহি তা জানতে পারতেন এবং মরুভূমির মধ্যে পানীয় জলের কষ্টে যখন সবাই অজ্ঞান হয়ে গেল তখন তাঁর প্রার্থনায় মেঘ আসত না, তরবারীর ওপর বজ্রপাত হয়ে মাটি বিদীর্ণ করে জলের উৎস দেখা দিত না। তবু সে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'হে আল্লা, আমার অজ্ঞাত অথবা যৌবন চেতনার সুপ্ত কামনার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। আমার অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। মুগ্ধ ফরিদ আমাকে বিমুগ্ধ করে আজ ভিখারিণীর মতো কোন অসহায় আবর্তে নিক্ষেপ করে চলে গেল।

সে যদি আর কোনোদিন ফিরে না আসে? তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আবার একি আর্ত-প্রার্থনা জেগে রইল রাজ্যের গুরুতর দায়িত্ব-ভারের সঙ্গে। রাজ্যপাট একজন পুরুষের জন্য যতখানি ভোগ-উপভোগের জিনিস নারীর জন্য তা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তাহলে বেদৌরা আর সাধারণ পতিতা নারীর সঙ্গে তফাৎ কি থাকবে? অতএব তাকে শুধু মুখ বুজে কাজ আর কাজ করতে হবে।

সারাদিন রোজা করে নামাজ পড়ে কাটাল বেদৌরা। ভাবতে লাগল ফরিদের কথা। তার মনের মানুষ, দেশের রাজা, অত্যন্ত সুপুরুষ, সুদর্শন, কবি, শিল্পী, গায়ক, যোদ্ধা। আজ সে সব পেয়েও সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেল পথের ভিখারীর মতো। মাকে সে আনতে যাচ্ছে সুদূর হিন্দুস্তান থেকে। কত পথ, কত কষ্ট, কত কাঁটা, কত জ্বালা!

মায়ের সম্মান এতখানি দেবে ফরিদ?

নাকি তাকে পরীক্ষা করছে তার যোগ্য সহধর্মিনী হতে পারবে কিনা?

পরদিন সকাল দশটায় মাথায় মুকুট পরে রাজদণ্ড হাতে নিয়ে রাজদরবারে এসে সিংহাসনে বসল বেদৌরা। সভা গমগম করছে লোকে।

সেনাপতি খালেদ বাদশার অন্তর্ধানের কথা ঘোষণা করল। রাণীই যে এখন সর্বেসর্বা তাও জানাল।

বেদৌরা উঠে দাঁড়াল। সবাই করতালি বাজিয়ে তাকে সম্বর্ধনা দিল।

বেদৌরা বলতে শুরু করল, 'আমি রাণী বেদৌরা—আল্লার কাছে শপথ করছি যে বাদশা ফরিদউদ্দিন জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধি হিসাবে সাময়িকভাবে ইসলামী ধর্মাদর্শ মতে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করব, তবে আপনাদের প্রত্যেকের আন্তরিক সহানুভূতি এবং সাহায্য নিয়ে। কেননা আমি রাজকন্যা নই, বণিককন্যা। পীরের মাজারে সেবিকা হিসাবে মানুষ

হয়েছিলাম, পুরুষবেশে থাকতাম, রাজনীতি আমার তেমন জানা নেই। আপনারা যাঁরা রাজনীতিতে সুপণ্ডিত, অর্থনীতিতে জ্ঞানবান, —চিকিৎসা, রাজস্ব, খাদ্যসম্ভার, যুদ্ধ পরিচালনা, ভৌগোলিক ব্যাপার, যান-বাহন, পথ-ঘাট, পুষ্করিণী, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি সার্বিক বিষয়ে অভিজ্ঞ—তাঁদের আমি সাহায্য চাই। এ বিষয়ে প্রধান উজিরসমেত আমি পনেরোজন ব্যক্তি গ্রহণ করব। তাঁরাই রাজ্য পরিচালনা করবেন।'

বেদৌরার শরীর কাঁপছিল। সে রাজদণ্ড তুলে ধরল। বসল একটু। জলপান করল। ঘাম মুছল কপালের।

তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ঘোষণা করছি, পুরোনো রাজার আমলের সমস্ত আইন-কানুন বাতিল হয়ে গেল। আইন-আদালত সরকারী-বেসরকারী সমস্ত ব্যবস্থাই রাজা ফরিদের নামে চলবে।. নতুন বাদশার নামে মোহর তৈরি হবে এবং ছ'মাসের মধ্যে পুরানো মোহর রাজকোষে জমা দিতে হবে।'

'আমি চাই দেশের লোক সুখে থাক, সুবিচার পাক। রাজ্যে ভাল ফসল ফলুক এবং তার জন্য সরকার পক্ষ থেকে সাহায্য যাক : পথ-ঘাট-কূপ-পুষ্করিণী তৈরি হোক। শিল্পকাজ বাড়ুক, লোক বেশি কাজ পাক। খাদ্যদ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমুক।'

সকলে হাততালি দিতে লাগল।

'প্রতি মহল্লায় যেন একটি মসজিদ থাকে ; শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়।'

বেদৌরা সারা দুপুর নানান নীতির কথা ঘোষণা করতে করতে জোহরের সময় এসে গেল। শিঙ্গাধ্বনি, তুরীভেরি বাজতে লাগল দুপুরের বিশ্রামের সময়।

সেনাপতি খালেদ তার পছন্দ মতো একজন বৃদ্ধের নাম এবং সেই ব্যক্তিকেও হাজির করল খানাপিনার আসরে বেদৌরার সামনে। বলল, 'আমার এবং রাজ্যের সর্বসাধারণের অভিমত অনুসারে এই ব্যক্তি প্রধান উজিব হবার উপযুক্ত।'

বৃদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে না না করে রাণী বেদৌরাকে কুর্নিশ করতে লাগলেন। বললেন, 'এই সেনাপতি খালেদ বেটা বড় রসিক, অপদার্থ একটা বৃদ্ধকে নিয়ে তামাসা জুড়েছে। আসলে আমি ওর পরিচিত বলেই আমার কথা বলছে। আগের রাজা আরিফ আমাকে পাষাণকক্ষে বন্দী করে রেখেছিল দীর্ঘ দশ বৎসর।'

বেদৌরা সোজা চোখে কট্‌মট্‌ করে তাকাতেই বৃদ্ধ তরল স্বভাবকে সংযত করলেন। বেদৌরা বলল, 'আমি অনুরোধ করব আপনি মানুষের সক্রিয় সাহায্যে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিন।'

লাল টুকটুকে ঠোঁট, দাদা চুল-দাড়িঅলা সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ আবার তরল স্বভাবে ফিরে এলেন। বললেন, 'কেউ চাইবে না, কেউ মানবে না। দেখবেন, সবাই চেঁচামেচি শুরু করবে।'

সেনাপতি খালেদ বললে, 'আপনি নিজেকে হালকা করবেন না। দেশের সব চাইতে জ্ঞানীগুণী মানুষ আপনি। সবাই আপনাকে আন্তরিক ভালবাসে।'

'তাহলে আমি মরে গেলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে দেশের লোক আর আমার সোনার কবর হবে? সমস্ত লোক ভক্ত হয়ে আমার মাজারে গড়াগড়ি দেবে?'

বেদৌরা হেসে উঠল।

বিকালে আবার দরবার বসতে বেদৌরা প্রস্তাব রাখল এই বলে: 'আমি কি আজকের প্রথম সভাতেই আপনাদের মধ্যে থেকে তেমন মানুষের উপস্থিতি কামনা করব যিনি এই রাজ্যের সাময়িক প্রধান উজির হতে পারবেন?'

খালেদ উত্তর দিলে, 'ইন্‌সে আল্লা, তিনি আমাদের মধ্যেই উপস্থিত আছেন। আমাদের মধ্যে সবার চাইতে জ্ঞানী মানুষ তিনি। আইন-কানুন, রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ আছে প্রায় চল্লিশটি। অত্যাচারী রাজা আরিফের বিরুদ্ধে তিনি খোলাখুলিভাবে অসমর্থন জানানোর ফলে তাঁকে দীর্ঘ দশ বৎসর অন্ধকার পাষাণকক্ষের মধ্যে অবরুদ্ধ থাকতে হয়েছিল।

কোন্ অলৌকিক উপায়ে তিনি একটি অজগরের সঙ্গে বাস করে এখনো এমন অপূর্ব সুন্দর চেহারায় বেঁচে আছেন সেইটাই চিন্তার বিষয়। আমরা যখন তাঁকে কয়েদখানা থেকে বার করে আনি তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নগ্নবেশ। প্রথমেই আমার হাত থেকে একটি বস্ত্র ছিনিয়ে নিলেন। তারপর ময়াল সাপটাকে বার করে দিলেন— বেরিয়ে যাবার সময় দেখলাম ময়ালটি ডিম পাড়তে পাড়তে চলে গেল। সাদা ডিমগুলি সোনার বর্ণ হয়ে গেল। সে গল্প এখন থাক। কয়েদখানার সেই বন্দী জ্ঞানী পুরুষের নাম আপনারাই বলুন, যিনি প্রধান উজির হবার সম্পূর্ণ যোগ্য।'

সভাস্থ সকলেই বলে উঠলেন, 'আজিজ ইমাম। আজিজ ইমাম।'

বেদৌরা হাত তুলল।

দেখা গেল বৃদ্ধ আজিজ ইমাম তখন সভার মাঝখানে বসে চোখ বুজিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। প্রগলভ-ভাবে বলছেন, 'আল্লা! আল্লা! একি তোমার দয়া! তোমাকে বোঝা যায় না। আল্লা, ভেবেছিলাম তুমি নেই, সারা জীবনের জ্ঞান সাধনার কোনো মূল্য নেই···আল্লা···'

সভা নীরব। স্তম্ভিত। বৃদ্ধের শুধু রোদন ধ্বনি···

বেদৌরার চোখ দুটিও অশ্রু সজল হয়ে উঠল। রুমাল ব্যবহার করল সে। হাত বাড়িয়ে শুধোলে, 'উনিই কি সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পিতৃতুল্য বৃদ্ধ?'

সেনাপতি উঠে গিয়ে আজিজ ইমামের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল: 'শুনছেন, আপনি প্রকৃতিস্থ হোন, মহারাণী আপনাকে ডাকছেন।'

বেদৌরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মানের সঙ্গে পাশের একটি রুপোর কেদারায় বৃদ্ধকে বসতে ইংগিত করল। তারপর বলল, 'আমি সভাস্থ সকলের অনুমতি নিয়ে আজিজ ইমামকে প্রধান উজিরের পদ দান করলাম।'

সকলের হর্ষধ্বনি শোনা গেল।

এরপর আজিজ ইমাম বলতে লাগলেন, 'খোদাতায়ালার অসীম

করুণা হয়েছে ইরাকের ওপরে। অন্ধকারের পর আলো আসে। ইরাকের এখন পুণ্যময় আলোকোজ্জ্বল দিন। যেদিন রণহুংকার শুনলাম, পাষাণপুরী কাঁপছিল—হঠাৎ যেন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল !'

'ময়াল সাপের সঙ্গে আপনি কি খেয়ে এতদিন বেঁচেছিলেন তাই বলুন ?' সভার একজন দাঁড়িয়ে উঠে বলে ফেলল।

আজিজ ইমাম রাণী বেদৌরার দিকে তাকালেন—বেদৌরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলে তাঁর কাহিনী বলতে।

বৃদ্ধ আজিজ ইমাম বলতে লাগলেন, 'দুরাচার রাজা আরিফের বিরুদ্ধে আমি সমালোচনা করেছিলাম লিখিতভাবে। হিন্দুস্তানের মুনিঋষিদের লিখিত বাক্য অভ্রান্ত ভাবা হয় তার কারণ তাঁরা নির্ভীক, সত্যবাদী এবং দার্শনিক ছিলেন। যাহোক, আমার দশ বৎসরের কারাদণ্ড হয়ে গেল। রাজার কথাই আইন। আইন পরিষদ ছিল না তার। পাষাণপুরীর কারাগারের মধ্যে আমাকে কাফ্রী দিয়ে কয়েকদিন প্রহার করানোর পরও যখন আমার মতান্তর হল না তখন বিশাল এক অজগর এনে আমার কক্ষে ছেড়ে দেওয়া হল। অজগরটি আমাকে জড়াতে পিষতে থাকল। আমি তার গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম। আমার জন্য দেয় খাদ্য দলা পাকিয়ে তাকে খাওয়াতে লাগলাম। তারপর সে আমার বশ্যতা মেনে নিল। এক বুক উঁচুতে একটা ছোট্ট গবাক্ষ ছিল সেই ঘরে। লোহার গরাদ ছিল দুটো। সাপটাকে কাঁধে তুলে তার মুখটা সেই গবাক্ষের গরাদের মধ্যে গলিয়ে দিতে সে নেমে বাইরে চলে গেল। ভাবলাম বাঁচা গেল ! কাফ্রী আর দোর খুলত না। দোরের একটা গহ্বর দিয়ে ঠোঙায় করে খাবার ফেলে দিত। আর মগ ধরলে এক মগ পানি ঢেলে দিয়ে যেত। কিন্তু ভোররাত্রে দেখলাম সন্ধ্যায়-বার-করে-দেওয়া অজগরটি কি একটা নিয়ে গবাক্ষ পথে মুখ গলিয়ে উঠে আসছে। সে মিটমিট করে তাকাতে লাগল। নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়তে লাগল। ভারী চেহারাটা সে বোধহয় টেনে তুলতে পারছিল না। আমি তার

গর্দানটা ধরে টেনে আনলাম। সাপটা তার মুখে-করে-বয়ে-আনা বস্তুটি আমার সামনে রেখে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুমোতে শুরু করে দিল। বস্তুটি আর কিছু নয়—রাজার-পাকশালা-থেকে-আনা তাজা একটি গোটা মুরগীর কাবাব! এবং রোজ সে আমার জন্য এমনি একটি করে ভেড়ার রান, খাসীর রান অথবা মুরগীর কাবাব এনে দিত।'

'মারহাবা! মারহাবা!' সকলে ঈশ্বরের করুণার প্রতি জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

আজিজ ইমাম বললেন, 'অরণ্যের পশু-সরীসৃপও ভালবাসা বোঝে। তাকে আদর করলে সে বশীভূত হয়। তবে সেনাপতি খালেদ রসিক। সাপটা সোনার ডিম পাড়ত না। ডিম পাড়ার কথাটা বানিয়ে বলেছে বোধহয়। যাহোক, এখন সাপের সঙ্গে কারাবাস আমার সাঙ্গ হয়েছে।'

॥ উনচল্লিশ ॥

পথশ্রান্ত ক্লান্ত ফরিদ দিল্লীতে পৌঁছে প্রথমে গেল সে নিয়াজীর সরাইখানায়।

নিয়াজী নাকি এখন বেশি সময় জোহরা বাঈজীর কাছে থাকেন লক্ষ্ণৌ শহরে। অন্য একটি মৌলভী চেহারার লোক সরাইখানা চালায়।

আহারাদি করার পর পূর্ব পরিচিত ওসমান নামের একজন খানসামার কাছ থেকে জানল ফরিদ, নিয়াজী একেবারে বয়ে গেছেন। টাকা নিতে এসে কর্মচারীদের তম্বি-তম্বা করেন। মারধরও করে বসেন। আস্‌মা নাকি এখন বাদশার হারেমে আছে আরজুমন্দ্ বানু অর্থাৎ মহারানী মমতাজ বেগমের খাস বাঁদী হয়ে।

ফরিদ বলল, 'আস্‌মা রানীর বাঁদী হয়েছে!'

খানসামাকে কিছু ইনাম দিয়ে সরাইখানা ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

রাজদরবারে এসে পৌঁছল।

তার আগমনবার্তা বাদশা শাহজাহানের কানে পৌঁছতেই তিনি একটু সোজা হয়ে বসলেন। বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। গোলাপ ফুল শুঁকতে শুঁকতে মহব্বত খাঁ সাহেবকে জানালেন, 'ফরিদ এসেছে একা। ইরাকের নাকি সে বাদশা হয়েছে, তবে পদব্রজে ভিখারীর দশায় আমার দরবারে এসেছে কেন?'

'বোধহয় অনুগ্রহ চায়।'

'আসতে বলো ওকে।'

ফরিদ কুর্নিশ করার পর বাদশার কাছে গেল। বলল, 'আমি এখন পীরচেঙ্গির একজন ভক্ত। বাদশা জাহাঙ্গীর অর্থাৎ আব্বাজানের মৃত্যুসংবাদ আমি পেয়েছিলাম হজে গিয়ে। ইরাক রাজ্যের এখন আমি সুলতান।'

শাহজাহান রসিকতা করলেন, 'বটে! বটে!'

'কান্দাহারের শাসনভার আমি নিইনি, নিলে হয়তো পারশ্যরাজ শাহ আব্বাস তা দখল করে নিতে পারতেন না। সে যাক, আমি কোনোকালেই তোমার শত্রু ছিলাম না—আজো নেই। কিন্তু বাদশা নামদার শাহজাহান, তুমি আমাকে শত্রু ভাবো। শাহরিয়ারের চক্ষু উৎপাটনের ব্যাপারটা তোমার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করবে।'

শাহজাহান বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হলেন বললেন, 'তোমার প্রয়োজনের কথা বলো—কি চাও তুমি এখন?'

হাসল ফরিদ।- সভাসদদের দিকে তাকাল। তাঁরা কানাকানি করছেন।

ফরিদ তার কোমর থেকে একটা লাল শালুর তবিল খুলল। তারপর তার ভেতর থেকে কোহিনূর হীরকখণ্ডটি বার করল। সেটি সকলকে দেখিয়ে বলল, 'পাঁচ লক্ষ টাকার এই হীরকখণ্ডটি, যেটি আমি মিশরের পিরামিডের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে এনেছি সেটি আজ হিন্দুস্তানের বাদশা শাহজাহানকে উপঢৌকন দিলাম।'

সকলে হর্ষধ্বনি করলেন। বাদশা হীরকখণ্ডটি গ্রহণ করলেন। স্থির চোখে সেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর হেসে খুশী হয়ে বললেন, 'বলো ভাই ফরিদ, তোমার জন্য আমি কি উপকার করতে পারি।'

ফরিদ বলল, 'তুমি সুখী হও ভাই, সুখে প্রজাপালন করো। আমি আজই চলে যেতে চাই কিন্তু যাবার সময়, আমার একটি আর্জি, আমার জননী গুলনার বেগমকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।'

শাহজাহান বললেন, 'তিনি তো কবেই ইন্তেকাল করেছেন! তুমি সে সংবাদ পাও নি বোধহয়।'

'তিনি ইন্তেকাল করেছেন? ওঃ!' কপালে করাঘাত করল ফরিদ।

শাহজাহান ইংগিতে একজনকে ডেকে ফরিদকে তার মায়ের কবরখানাটা দেখিয়ে দেবার জন্যে বললেন।

ফরিদ কুর্নিশ করে চলে আসার সময় হঠাৎ হীরকখণ্ডটি যেন তাকে ডেকে বলল, 'এই বেয়াকুফ, একি করলে তুমি!'

মায়ের কবরখানায় এসে ফরিদ তাঁর কথা মনে করে কিছুক্ষণ কাঁদল। বলতে লাগল, 'মা, আমার মা গো! তুমি কত কষ্ট পেয়ে চলে গেছ আমি জানি না। আমাকে ক্ষমা করো।...'

কবর জিয়ারত করার পর ফরিদ আবার ফিরে এসে বাদশা শাহজাহানের কাছে বিদায় চাইল।

তিনি মৃদু হেসে করমর্দন করে বিদায় দিলেন।

কিন্তু কিছুদূর আসার পর হঠাৎ সে পথে দেবদারু আর ঝাউবনের মধ্যে বহু সৈন্যের দ্বারা ঘেরাও হয়ে গেল।

সামনে দেখল আসফ খাঁ। তিনি বললেন, 'ফরিদ, তুমি বাদশা শাহজাহানের হুকুম মতো এখন বন্দী এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে।'

'কারণ ?'

'কারণ, তোমাকে বিশ্বাস নেই। তোমার পুরনো ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় তুমি একটা আদত কাফের এবং অমানুষ ছিলে। তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না।'

'আসফ খাঁ, তুমি বাদশার একটা পালিত গাড়ল। তোমার যতখানি দাড়ি আছে তার অর্ধেকও মনুষ্যত্ব নেই। সরে যাও, আমাকে এই হিন্দুস্তান থেকে বিদায় হয়ে যেতে দাও।'

তলোয়ার হাঁকাতেই সৈন্যরা তাকে আঘাত হানতে লাগল।

কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর ফরিদ নিজেকে মুক্ত করে ফেলল; ছুটে বেরিয়ে গেল সে তাদের পিছনে ফেলে রেখে কিন্তু দেখল সামনে থেকে আরো পঞ্চাশজন অশ্বারোহী আসছে তার দিকে।

ঘোড়াটিও অবাধ্য হয়ে উঠল চোট খাবার পর।

বন্দী হয়ে গেল ফরিদ।

টানতে টানতে এনে তাকে কারাগারের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল।

তালাচাবি লাগানোর শব্দ শেষ হয়ে যেতেই ফরিদ হঠাৎ চমকে উঠল তার সামনে এসে হাজির একটি নরকংকাল! অর্ধমৃত জীবন্ত মানুষ! চোখ নেই। বিকৃত চেহারা।

সে বলল, 'কে গো তুমি। সিংহাসনে বসতে চেয়েছিলে নাকি? তোমার নাম কি?'

'আমার নাম ফরিদ।'

'ফ-রি-দ!' চিৎকার করে জড়িয়ে ধরল কংকাল চেহারার লোকটি। বলতে লাগল, 'ফরিদ, ওরে তুই আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি শাহরিয়ার!'

'শাহরিয়ার!'

'হ্যাঁ। আমাকে মা-জননী নূরজাঁহা বেগম সিংহাসনে বসালেন আর খুরম এসে আমার চোখ দুটো উপড়ে নিলে! উঃ! কী তীব্র যন্ত্রণা! সারা গায়ে আমার দেখছ না কত কশাঘাতের চিহ্ন! আমাকে খেতে দেয় না। যাকগে, আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো।'

ফরিদ তার জীবনের সমস্ত কথাই বলল। কয়েকদিন ধরে বলল, মাঝে মাঝে। সে অন্যমনস্ক ছিল। বেদৌরার কথা, পারভেজের কথা ভাবতে লাগল সে।

পাষাণপুরীর মধ্যে মশার দৌরাত্ম খুব।

অবশ্য খাবার ভাল আসতে লাগল তার জন্য। সে তার মুক্তির কথা ভাবতে লাগল।

শাহরিয়ার থেকে থেকে হঠাৎ কেবলই চিৎকার করে ওঠে. 'বিষ দাও! মৃত্যু দাও!'

অসহ্য! অসহ্য!

কি আহাম্মকের কাণ্ড করল সে! হীরকটি হাতছাড়া করতেই এই দুর্ভাগ্য ঘটল তার। ছেলেমানুষের মতো কেন সে এই উদারতা করতে গেল! শত্রু যখন নিচু হয় তখনই তো আরো মারাত্মক। তবে কি সাধিকা বেদৌরাকে দুঃখ দেবার জন্যই তাকে এই দুঃখজনক অবস্থায় পড়তে হল?

এবার সে প্রার্থনা শুরু করে দিল।

দশদিন পরে একরাত্রিতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ পীরচেঙ্গিকে স্বপ্ন দেখল ফরিদ। তিনি বললেন, 'ফরিদ তুমি যদি রাজার যোগ্য হতে

তাহলে দূত মারফত চিঠি দিয়ে শাহজাহানকে বলতে পারতে এর সঙ্গে আমার আম্মাজানকে পাঠিয়ে দিলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।'

'আমার এই বন্দীত্ব থেকে উদ্ধারের উপায় কি হুজুর?'

পীরচেঙ্গি হাসলেন শুধু, বললেন, 'হজ করার পর তুমি অবৈধ যৌনাচার আর সুরাপান করলে কেন? তোমার হজ বাতিল হয়ে গেছে।'

'আমি সরমেন্দা! আমি দুঃখিত।'

'এই শাস্তির স্বাদ তোমার প্রয়োজন ছিল।' তারপর পীরচেঙ্গি অন্তর্ধান করলেন।

কবে মুক্তি হবে তার, ঘুম ভাঙার পর সে ভাবতে লাগল। হজ তার বাতিল হয়ে গেছে। সুরাপান করতে গেল কেন সে? সারা কি তার জন্য অবৈধ ছিল না? বন্দীত্বের মুক্তির কথায় পীর হাসলেন কেন?

দীর্ঘ একমাস কেটে গেল। ফরিদ দেখল তার শরীর বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে রোগা হয়ে যাচ্ছে।

একদিন সহসা দেখল গুলাম হাবসী এসে চাবি খোলার পর একজন সান্ত্রী ভেতরে ঢুকল। তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে টানতে টানতে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'আপনার ফাঁসীর হুকুম হয়েছে।' গলার স্বর শুনে ফরিদের মনে হল সান্ত্রীটি পুরুষ বেশধারী মহিলা।

বাইরে কোকাফ অন্ধকার। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে তখন।

সান্ত্রী তাকে নিয়ে চলল ফাঁসীর ময়দানের দিকে। চারজন প্রহরী আটকালে তাদের সঙ্গে সান্ত্রী ইসারায় ফিসফিস করে জানাল, 'এর এখনি ফাঁসী হবে, তোমরা দোয়া-দরুদ পড়ো।'

তারা ভয় পেয়ে বলল, 'আরে বাপ!'

ফাঁসীর ময়দানে ফাঁসীঘরের মধ্যে এনে সান্ত্রী বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন যুবরাজ?'

'স্বর শুনে মনে হচ্ছে তুমি আস্‌মা।'

'ঠিক। গুলামকে আমি যথেষ্ট নজরানা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। আপনি এখন যেথা ইচ্ছা চলে যেতে পারেন।'

'আমি তোমাদের সরাইখানায় এসে প্রথমে জানলাম তুমি রাজ-অন্তঃপুরে মমতাজ ভাবীর খাস বাঁদী হয়ে আছ। আমার মা-ও তোমার মতো খাস বাঁদী ছিলেন। তোমার পুত্র বাদশার ঔরসজাত হলেও তার আমার মতো দশা হবে। কাজেই এ-জীবন তোমার আপাত সুখের হলেও ভবিষ্যৎ বড় দুঃখের।'

'সে কথা থাক্। আপনি আমার রোগমুক্তি ঘটিয়েছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতার জন্য আপনাকে আমি কয়েদখানা থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। আর একটুও দেরি করবেন না। আমার গলার এই হার খুলে দিলাম। রাহা খরচ করবেন, আর এই তরবারী নিন। সালাম হুজুর। আপনাকে মুক্ত করার সংবাদ প্রকাশ পেলে আমার প্রাণদণ্ড হবে। তবে সান্ত্রীরা আমাকে এই ঝড়বৃষ্টির অন্ধকার রাতে কেউ চিনতে পারে নি। কিন্তু যদি গুলাম হাবসী ধরা পড়ে—হায় দুর্ভাগ্য আমার, আমি পতিতা নারী, আপনাকে মুক্ত করার জন্য হাবসী গুলামের কাছে নিজেকে দান করেছি, তাকে অনেক মোহর দিয়েছি কিন্তু আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমি যদি অপবিত্রা না হতাম তবে এই কঠিন মুহূর্তেও আপনার সঙ্গে চলে যাবার দাবি করতাম। হায় আমার দুর্ভাগ্য! যাকে ভালবাসি তাঁকে পেলাম না। নিন এই পোষাক…'
আসমা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুতগতিতে মাঠের বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে চলে গেল প্রাসাদের দিকে।

ফরিদ হারটা নিয়ে একবার কপালে ঠেকাল। তারপর সে কয়েদখানার পোষাক ত্যাগ করে আসমার দিয়ে-যাওয়া পোষাকটা পরে তরবারী ঝুলিয়ে নিয়ে অন্ধকারে বের হল। আল্লাকে সে কেবলই ডাকতে লাগল। এমন করে আর কখনো সে ডাকেনি। ঝড়বৃষ্টির রাত। বজ্রপাত হচ্ছে। বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। সে বজ্রপাতের শব্দে যখন ভীত হল সোচ্চারে আল্লাকে ডাকতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'হে আল্লা, এ

গুনাগার বান্দাকে তুমি ক্ষমা করো। আমাকে মুক্তির পথ দেখাও। তুমি ছাড়া আর আমার কোনো গতি নেই। আমি অতি দীন ভিখারী। হে আল্লা, এই ঝড়বৃষ্টি যেন সারারাত চলে। আমি যেন দিল্লী নগরী থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।'

ফরিদ দিল্লী নগরী থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ব পরিচিত সৎ ব্রাহ্মণের ক্ষেত-খামারের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা পেরিয়ে চলল। ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করবে কিনা একবার ভাবল। ইতস্তত করল। রুপার কথা মনে পড়তেই সে অন্য পথে চলতে আরম্ভ করল। নারী!…

অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে পথে। মুক্ত ময়দানে যাওয়া এখন তার পক্ষে নিরাপদ নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, ব্রাহ্মণের আশ্রমের দুয়ারেই সে শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হল!

ভিজতে ভিজতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল রুপারা কয়েক বোন একটি মাচার মতো জায়গায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। বৃদ্ধ আর একপাশে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছেন। ফরিদ তাঁর পায়ে হাত দিল। বৃদ্ধ জেগে গিয়ে উঠে বসলেন। বললেন, 'কে?'

'আমি ফরিদ।'

'তাই নাকি। এখন, এ অবস্থায়?'

আলো জ্বাললেন তিনি। মাটির কুটির যেন হেসে উঠল। গিরি মাটির লেপন দেওয়া দেয়াল। মেয়েরা সাড়া পেয়ে উঠে বসল দু'একজন করে।

ফরিদকে একটি বস্ত্র দিল রুপা। সেটা তার একটা শাড়ি।

ফরিদ ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলল।

একঘটি দুধ আর কিছু ফল দিল রুপা।

বৃদ্ধ সব কথা শুনলেন ফরিদের। তারপর বললেন, 'তোমার এই পোষাক আমি পুড়িয়ে দিচ্ছি। তোমাকে নেড়া করে টিকিধারী ব্রাহ্মণ সাজিয়ে দিচ্ছি, কাশ্মীর পর্যন্ত চলে যাও।'

ফরিদ বলল, 'টিকি রাখলে মোগল সেনারা দেখলেই তো তা ধরে টানবে আর রগড় করবে?'

রুপা হাসল। বলল, 'তা করুক। নানান অবস্থায় পড়ে আপনার বিচিত্র জ্ঞান হবে। অন্য ধর্মের মানুষের ওপরে নির্যাতন বা অপমানের দুঃখটা বুঝবেন।'

সকালের আগে ব্রাহ্মণ বেশে নামাবলী গায়ে দিয়ে ন্যাড়া মাথায় গেরো বাঁধা টিকি নাড়তে নাড়তে গেরুয়া বেশধারী ফরিদ চলল পথ দিয়ে। বিদায়ের সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার পর রুপার সব ক'টি বোন একে একে এসে তাকে প্রণাম করল। এখন তরবারী নেই, ব্রাহ্মণ বেশ!

হেঁটে হেঁটে কাশ্মীরে এসে পৌছতে তার দশদিন লেগে গেল। একটানা সে পথ চলে নি। মাঝে মাঝে হিন্দুবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। হিন্দুরা ধর্মভক্তিতে তাকে প্রণাম করেছে। সে মৌনব্রতী ব্রাহ্মণ বলে আদৌ কথা বলতে হয় নি। শুধু পৈতে ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করেছে।

•কিন্তু কাশ্মীর থেকে বিদায় নেবার সময় কয়েকজন মুসলমান সৈনিক তাকে ঘিরে ধরল। বলল, 'এ বেটা ব্রাহ্মণকে আজ আমরা মুসলমান করব!'

ফরিদ বলল, 'দোহাই বাবারা! আমাকে ছেড়ে দাও। ধর্মের ওপর আঘাত করো না, পাপ হবে।'

কিন্তু তারা শুনল না। ব্রাহ্মণরূপী ফরিদকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে টিকি কেটে পৈতে ছিঁড়ে পোষাক খুলে যখন দেখল এ বেটা মুসলমান তখন তারা তাজ্জব হল। বলল, 'একি! তুমি কি ছদ্মবেশী?'

ফরিদ বলল, 'আজ্ঞে না। আমাকে একবার কয়েকজন মুসলমান ধরে 'মুসলমানী' দিয়ে মুসলমান করেছিল। কিন্তু আবার আমি প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হয়েছি।'

'তবে রে! খাওয়া, একে গরুর মাংস খাওয়া, আর প্রায়শ্চিত্ত করলে যাবে না।'

ফরিদকে গরুর মাংস খাইয়ে, মুসলমানী পোশাক দিয়ে তারা ছেড়ে দিল।

ফরিদ যেন সহজে একটা পথ পেয়ে গেল। এই পোষাকই এখন তার দরকার। সে পেশোয়ারে পৌঁছে আসমার দেওয়া হারখানা বেচল। মুসলমান সৈনিকরা আর যত বেইমান হোক চোর-ছ্যাঁচোড় নয়। তার গলার হারটা নেয় নি। মুসলমান করে কলেমা পড়িয়েই তারা সন্তুষ্ট। ফরিদ শর্তবদ্ধ হয়েছিল, এই হারটা বেচে সে মক্কায় গিয়ে হজ করে আবার খাঁটি মুসলমান হবে। আর কখনো হিন্দুত্ব নেবে না।

একটা ঘোড়া কিনল ফরিদ। তারপর সে চলতে লাগল কান্দাহার মুলুকের দিকে।

॥ চল্লিশ ॥

এই 'সারা, শুনেছ, চরম দুঃসংবাদ তোমার ভগ্নিপতির।'

'কি দুঃসংবাদ গো!' সারা শাহ পারভেজের গললগ্না হয়ে তখনি সংবাদটা শোনার জন্য আবদার ধরে কৌতূহল জানাল।

শাহ পারভেজ বলল, 'এই মাত্র বৈদেশিক সংবাদ সংগ্রহকারী চর এসে জানাল ফরিদ-সাহেব বাদশা শাহজাহানকে বহু মূল্যের—বোধ হয় জগতের সব চাইতে বড়—একটি হীরকখণ্ড উপঢৌকন দেবার পরও বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছেন।'

'সেই রকম আশঙ্কা তো আমিও করেছিলাম!'

'তিনিও করেছিলেন। তাই আমাকে তাঁর রাণী বেদৌরাকে দেখবার জন্যে বলে গিয়েছিলেন।'

'শুধু বেদৌরা আপাজানকে নয়, তাঁকে যাতে উদ্ধার করা যায় দুই রাজ্যের মিলিত শক্তি বা চেষ্টা দিয়ে সেকথা বলেও তোমার কাছে আর্জি রেখে গেছেন।'

'তার মানে ভায়রা-ভাইকে উদ্ধাব করার জন্য ইরাক পারশ্য দু'রাজ্যের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়বে হিন্দুস্তানের ওপব? একটা লোকের জন্য বহু লোকের প্রাণক্ষয়?'

'লোকটি তো সাধারণ লোক নন। তিনি তোমার ভায়রা-ভাই, এবং ইরাকের রাজা। অসৎ উদ্দেশ্যে তিনি তো যান নি। মাকে আনতে গিয়েছিলেন। রাজ্যের বখরাও চাননি। এমন কি বাদশা জাহাঙ্গীর তাঁকে কান্দাহারের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করলেও তা তিনি শাহজাহানের উদ্বেগের জন্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি সাধাবণ পুরুষ নন।'

'হ্যাঁ, রাজা হয়েও কাজটা যা করেছেন তা রাজনীতি বহির্ভূত। অসাধারণ পুরুষ তো বটেই, তোমার জীবনের প্রথম পুরুষও।'

'এই, ভাল হবে না বলছি!'

'না, প্রথম পুরুষ মানে বাজনায় তাঁর কাছে তুমি হেরেছিলে। শর্তানুসারে তুমি তাঁর প্রথম বউ। তবে বোন বেঁচেছিল বলে তোমাকে বিয়ে করতে পারেন নি।'

'নীলোফার মারা গিয়েছিল, তারপর আমাকে তাঁর গ্রহণ করার পথ পরিষ্কার হয়ে গেলেও হুজুরের ফরমান গেল! তিনি ভাল লোক বলেই আমাকে তুমি বিনা বাধায় পেয়েছিলে। আমাকে ভালবাসেন বলেই তিনি আমার যাতে সুখ হয় তাই চেয়েছিলেন। তাঁর সংযম আর স্বার্থত্যাগ আছে। যাক, সেসব কথা। তাঁর উদ্ধারের কি করবে?'

'আগে ইরাকের রানীর কাছে যাই, পরে বিবেচনা করা যাবে! বেদৌরা আপাজানের হুকুম হলে এবং আমার পিতা শাহ আব্বাস যদি অনুমতি দেন তবে নিশ্চয় যুদ্ধ করব।'

'সেসব পরে হবে, এখন দূত মারফত সংবাদটা পাঠাও বেদৌরা-আপার কাছে। তারপর তোমার মৈত্রী সফরের জন্য অনুমতি চাও।'

'আগেই অনুমতি চাইতে হবে। দূতের দ্বারা এসংবাদ দিলে তিনি হঠাৎ মুষড়ে পড়বেন। আচ্ছা, আমি আব্বাজানের সঙ্গে কথা বলছি। মোগল সাম্রাজ্য থেকে আমরা কান্দাহার ছিনিয়ে নিয়েছি। শাহজাহান আমাদের শত্রু হয়ে আছেন অথবা আমরা তাঁর শত্রু। বোধহয় আব্বাজান ইরাকের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।'

সমস্ত সংবাদ অবগত হওয়ার পর সম্রাট শাহ আব্বাস বললেন, 'যুবরাজ ফরিদ এমন হঠকারিতার মধ্যে পড়ল! নিশ্চয়, ইরাকে তুমি নিজে যাও—অনুমতি চাও। ফরিদ তোমার ভায়রা-ভাই, বিপদে দেখবার জন্যে সে অনুরোধ করে গেছে।'

দুদিন অপেক্ষা করার পর বেদৌরার স্বাক্ষরিত পত্র আনলে দূত। অনুমতি এসেছে মৈত্রী সফরের।

তখনই শাহ পারভেজ কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে ইরাকের সীমান্তে এসে ছাড়পত্র দেখিয়ে রাজধানী বাগদাদ নগরে প্রবেশ করল। সবে তখন সন্ধ্যা হয়েছে। শহরের চারদিকে বর্ণাঢ্য আলো। দোকানপাটে

খিকিকিনি। লোকজন সবাই তাদের দেখছে। কয়েকজন ইরাকী সৈন্যসহ সেনাপতি খালেদ রাজপ্রাসাদে তাদের নিয়ে চলল।

প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী আজিজ ইমামের সঙ্গে শাহ পারভেজের সাক্ষাৎকার ঘটল। বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'পারশ্যের যুবরাজ, আপনার মৈত্রী সফরের জন্য অসংখ্য সাধুবাদ জানাই। আপনাদের সম্রাটকে আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

'আপনার পাণ্ডিত্যে আমি মুগ্ধ। পিতাও আপনার রচনার খুব প্রশংসা করেন। আমার শ্বশুর মহাশয় গওস্‌সুল আনামও আরবের একজন বিখ্যাত কবি।'

'জী হ্যাঁ, গওস্‌সুল আমার এককালে খুব বন্ধু ছিল। তখন তার খুব দুরবস্থা। যমজ দুটি কন্যার একটিকে সে বেঁচে দেয় ভারতের এক শাহ সূফীর কাছে। স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে গওস্‌সুলের সন্তান দুটিকে দেখার অসুবিধা হত। ছোট মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে বা তার হাত ধরে সে ঘুরত। আর বিয়ে করল না। সে এখন মক্কা-মদিনা অঞ্চলের শাসনকর্তা।'

'আপনাদের রাজা ফরিদের তিনি আবার শ্বশুর। নীলোফার নামের সেই বিক্রি করা মেয়েটি সূফী পীরচেঙ্গির অনুমতিতে ফরিদ সাহেব বিবাহ করেন। নীলোফার পীরচেঙ্গির দৌলতে অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েছিলেন। একদিন তিনি হঠাৎ নাকি গায়েব হয়ে যান। তাঁকে খুঁজতে আসেন মক্কায়। হজযাত্রী ফরিদ সাহেব শাসনকর্তার বাড়িতে দেখা করতে এসে আমার পত্নী বেগম সারাকে দেখে নীলোফার বলে ভুল করেন। পরে অবশ্য নীলোফার এলে সে ভুল ভেঙে যায়। বহুকালের হারানো মেয়ে পেয়ে কবি গওস্‌সুল আনাম আনন্দিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, নীলোফার আপাজান আজ বেঁচে নেই। এসব কাহিনী আমি বেগম সারার কাছে শুনেছি। যাহোক, বেদৌরা-আপার সঙ্গে আমার এখনি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিন। অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার আছে। আচ্ছা, আপনাদের রাজা ফরিদের কোনো সংবাদ রাখেন কি আপনি?'

বৃদ্ধ বললেন, 'রাজা তো শুনছি হিন্দুস্তানে গেছেন। আমি তাঁকে দেখি নি। দূতরা বিচিত্র সংবাদ আনছে, কেউ বলেছে, তিনি অন্ধকার কোকাফ রাজ্যে চলে গেছেন। আসলে তিনি মানুষ নন, একজন ফেরেস্তা। এদেশের রাজার অন্যায় অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়াতে আল্লা তাঁকে যুদ্ধ করতে পাঠান।—একজন দূত বলেছে, বাদশা শাহজাহান তাঁকে নিহত করেছেন। আপনি কি তাঁর কোনো সংবাদ রাখেন শাহাজাদা?'

'আমি সেই সংবাদ দিতে এসেছি। প্রচার হবার আশঙ্কায় আমি রানী সাহেবার সামনেই শুধু সেকথা বলতে চাই।'

বেদৌরার সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করে শাহ পারভেজ কুর্নিশ করল। বলল, 'বন্দেগী রানী সাহেবা।'

হাসল বেদৌরা মিষ্টি করে। একটু মাথা ঝুঁকিয়ে হাত তুলে অভিবাদন গ্রহণ করল সে। বসতে ইংগিত করে বলল, 'পারশ্যের যুবরাজ শাহ পারভেজ, আপনার সদিচ্ছা সফরের জন্য ধন্যবাদ। আপনার বিশ্রামের জন্য আমি সব রকম ব্যবস্থা করেছি।'

'বিশ্রাম আমার দরকার নেই। একটি অমঙ্গলসূচক সংবাদ বহন করে এনেছি আমি। যদি অনুমতি দেন আপাজান, তাহলে বলি আমি।'

'ভাইয়া, রাজা ফরিদের কোনো সংবাদ?'

'জী হ্যাঁ।'

'হায় খোদা! দুঃসংবাদ?'

'হ্যাঁ আপাজান, তিনি মোগল কয়েদখানার অন্ধকার পাষাণপুরীর মধ্যে বন্দী এখন!'

'বন্দী! আমার রাজা বন্দী! ভাইয়া পারভেজ, আমি যে বিভ্রান্ত, বিচলিত...'

'সম্রাট শাহজাহান ভীষণ স্বার্থপর। নিজের সহোদর শাহ-রিয়ারের দুটো চোখ উপড়ে নিয়ে তাঁকে যে অন্ধকার-প্রায় কক্ষে আজীবন বন্দী করে রেখেছেন সেই কারাকক্ষের মধ্যেই রাজা ফরিদ আজ বন্দী।'

বেদৌরা মুখে হাত চাপা দিয়ে অশ্রু রোধ করবার চেষ্টা করল।

'আপনি বিহ্বল হবেন না। আমরা দুই রাজ্যের মিলিত শক্তি দিয়ে মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করব। রাজা ফরিদ যাবার সময় আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন যেন বিপদের সময় আপনাকে দেখি এবং তিনি বন্দী হয়ে গেলে যেন তাঁকে উদ্ধার করি।'

বেদৌরা উঠে এলো। শাহ পারভেজের দুটি হাত ধরল। বলল,-'আমার কোনো ভাই নেই, আজ থেকে তুমি আমার ভাই। তাঁর সংবাদের জন্য আমি প্রতি নিয়ত ছটফট করছিলাম। তুমি কি জানো ভাই, আমি এক অলৌকিক ক্ষমতা বলে অসংখ্য অত্যাচারী শত্রুকে পুড়িয়ে মারতে পারি। না, না, আমি অহঙ্কার করব না। আমি যুদ্ধ চাই না, অনেক নিরপরাধ মানুষ ধ্বংস হবে। তাছাড়া নতুন রাজ্য। নতুন সৈন্য-সামন্ত আমার—রাজকোষে অর্থ নেই। কি করা যায় এখন? আল্লা কি একটা পথ করে দেবেন না? রাজা আমার এখন অন্ধকার কারাগারে বন্দী অথচ আমি রাজরানী হয়ে সিংহাসনে বসে আছি!'

'পাঁচ লাখ টাকার একটা হীরকখণ্ড নাকি শাহজাহানকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন রাজা ফরিদ, শুধু তার মা-জননীকে মোগল হারেম থেকে ইরাকে আনার জন্য। শাহজাহান হীরকখণ্ড নেবার পর জানালেন তাঁর মা মারা গেছেন।'

'ইয়া আল্লা!'

'মা'র কবর জিয়ারত করে ফেরার পর বাদশার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় তিনি বন্দী হলেন। একটু যুদ্ধও হয়েছিল নাকি তাঁর সঙ্গে। তারপর বন্দী হয়ে গেলেন।'

'তুমি এখন বিশ্রাম করো ভাই।—আসুন প্রধান উজির, কি সংবাদ বলুন।'

শাহ পারভেজ বিশ্রাম করবার জন্য অন্য একটি প্রাসাদে চলে গেল। তার খানাপিনার সময় বেদৌরাও একসঙ্গে খাবে জানিয়ে দিল।

আজিজ ইমাম বললেন, 'রাজার কোনো সংবাদ পেলে নাকি মা?'

'পেয়েছি প্রধান উজির। তিনি এখন হিন্দুস্তানের রাজধানী দিল্লীর কারাগারে বন্দী।'

'বন্দী! কে এই সংবাদ দিল, যুবরাজ পারভেজ?'

'জী হ্যাঁ।'

'তাঁকে বিশ্বাস করা যায়?'

'যায়। সে আমাকে আপাজান সম্বোধন করেছে। আমি ভাই বলেছি।'

'তাহলে উপায়? এভাবে হঠাৎ গেলেন কেন? দূত মারফত সংবাদ নিতে হয়। দেখছি আমি, কি করা যায়....'

আজিজ ইমাম কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বেদৌরা উঠে গবাক্ষ পথে সুসজ্জিত বাগিচার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগল। মাথা কুটতে লাগল দেওয়ালে। বলতে লাগল, 'এই আমার ভাগ্য! তার চাইতে যদি ফরিদের সঙ্গে আদৌ পরিচয় না হত—সেই যুবরাজ—অপূর্ব দর্শন—ঘোড়ায় করে এলো—দ্রাক্ষাকুঞ্জের মধ্যে দাঁড়িয়ে পীরের দরগার সবাইকে দেখছিল—আমি গিয়ে আহ্বান করলাম—হাতে আমার বল্লম—পুরুষ বেশ—ও এলো ঘোড়া থেকে নেমে আমার সাথে সাথে—আমাদের গান শুনল—গান গাইল—মাঝে মাঝে আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছিল—পীর বাহরাম আমার অন্তরের ভাষা পড়তে পারলেন। রাতের অতিথি করে আমার হোজারায় তাকে নিয়ে গেলাম—আমার স্বাধীনতা ছিল—প্রত্যয় ছিল পীরের, আমি অধিকার ভঙ্গ করব না। তবু, হায় বোকা যুবরাজ! পুরুষের বেশ যখন আমি খুলে ফেললাম, কি বিস্ময় তোমার চোখে! হায়, সেসব এখন অতীত স্মৃতি! স্মৃতি মানুষকে পাগল করে! চিতাবাঘের আঁচড়-কামড়ে তীব্র আরক দেবার পর ফরিদ আমাকে যেভাবে আকর্ষণ করেছিল, আঁচড়েছিল, কামড়েছিল পাগলের মতো—সে কোথায় গেল—ফুলশয্যার রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ল—এই দেহভরা কামনা তাকে পাওয়ার—আর কি কখনো দেখা হবে—যদি না হয়—যদি মারা যায়...।'

পাগলের মতো কাঁদতে লাগল বেদৌরা। লায়লা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। সান্ত্বনা দিতে লাগল।

একচল্লিশ

আসমার হারটাকে বেচতেই হল ফরিদকে, যদিও তার ইচ্ছা ছিল না। আসমার কথা মনে পড়তে লাগল তার। সরাইখানায় প্রথম পরিচয়, তার রোগমুক্তি, খুরমের সৈন্যদের দ্বারা জখম হয়ে সে তার হুকুম মতো নিয়ে গেল সৎ ব্রাহ্মণের কাছে—তারপর সেই আসমা পথ চেয়ে থাকার পর রাজার ভোগে চলে গেলেও রাজ প্রাসাদের ভেতর থেকে ছদ্মবেশে বেরিয়ে এসে তাকে কারাগার থেকে গোপনে বার করে দিল। আসমা তার গলার হার খুলে দিয়েছে পাথেয় হিসাবে। আসমার মহত্ত্ব আছে। আল্লা যেন তার মঙ্গল করেন।

কান্দাহার শহরের একটি সরাইখানায় ঢুকে খানাপিনা সারল ফরিদ।

সরাইখানার মালিক অত্যন্ত বেঁটে চেহারার লোক। তাকে বলল, 'আমি একজন শিল্পী, ছবি আঁকি, কবিতা লিখি। দিন-পনেরোর জন্যে আমি আলাদা একখানা ঘর চাই, দিতে পারবেন কি?'

'বেসক্। ভাল সাজানো ঘর আছে। খানাপিনা, শোয়া, গোসল ইত্যাদির সব ব্যবস্থাই হবে যদি দৈনিক এক মোহর করে দেন।'

ঘর দেখল ফরিদ। মোটামুটি তার পছন্দ হল। পনেরোটা মোহর অগ্রিম সে দিয়ে দিতে সরাইঅলা বুকবুক খুশী হল।

ফরিদ সুখশয্যা পেয়ে সারাবেলা পড়ে ঘুম দিল। সন্ধ্যার সময় বাজারে বেড়াতে বের হল। কিছু জামাকাপড় আর ছবি আঁকার সরঞ্জাম কিনল।

ফেরার পথে চোগা-চাপকানপরা শরীফ চেহারার একজন লোক তাকে সালাম করে শুধালে, 'এই শহরটা পাগলদের আড্ডা, কি বলেন?'

ফরিদ হেসে বলল, 'হ্যাঁ। নইলে আপনিই বা এখানে থাকবেন কেন?'

'আমি তো নেই, আমাকে রেখেছে, পালিয়ে এসেছি—শালা, গারদের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকার নাম কি জামাই হয়ে থাকা?'

'কাবুলীদের রাজ্যের আপনি জামাই? কপাল তো ভাল!'

'আমি একজন ভারতীয়—কাশ্মীরের লোক—আমাদের আপেল, আখরোট, খুবানীর বাগান আছে। আব্বা বড়লোক। আমি এক কাবুলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। সে আমাকে কান্দাহারে বেড়াতে নিয়ে এলো। লুকিয়েই এলাম। এখানে এনে কাবুলী-ব্যাটা তার বিরাট চেহারার বোনের সঙ্গে আমার সাদী দিয়ে দিলে। আসুন না একটু বসি। মনের কথা বলতে না পেরে যেন দম ফেটে মারা যাচ্ছি।'

বসল ফরিদ একটা চাতালে। এদিকে ভিড় নেই।

লোকটি বলল, 'আমার নাম কিসমত। আমার ভাই কিসমতটাই খারাপ। আপনি কোথায় থাকেন?'

ফরিদ বলল, 'থাকি? সে একটা সরাইখানায়।'

'আমি আপনার কাছে রাতটা থাকতে পাব?'

'আপনার শ্যালক কাবুলীটা যদি জানতে পারে তাহলে আমাকে ধরে বেদম প্রহার করবে, তখন?'

'তাহলে পালিয়ে এলাম, যাব কোথায়? বাদশার সৈন্যরা ধরলে নাকি কয়েদখানায় পুরে রাখে! বিশেষ করে আমি ভারতীয়, গুপ্তচর ভাববে। এদেশটা তো ভারতেরই ছিল। শুনছি যুদ্ধ বাধবে, বাদশা শাহজাহানের সৈন্য কাশ্মীরে এসে গেছে।'

'তাই নাকি! কে এসব বলল?'

'লোকে বলছে। আচ্ছা, আমার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়াই এখন মঙ্গল, কি বলেন? যাবেন আমার সঙ্গে? বলব আমার দোস্ত। পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে বেরিয়ে আসি। নইলে আমার বউটা হয়তো মারবে আমাকে!'

'মেরেছেন কখনো? কতবড় চেহারা?'

'ওরে ব্যাস! বিরাট চেহারা। এ শহরে আর তেমন চেহারার একটি মেয়েকেও দেখেন নি।'

'চলুন তাহলে—আপনার বউকে দেখে আসি।'

দুজনে চলল তারা কিছুক্ষণ। তারপর একটি পাহাড়ী জায়গায় উঠে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে এসে বস্তির মধ্যে ঢুকল। একটি দোর খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখল কয়েকজন নারীপুরুষ জটলা করছে। একটি মেয়ে ভীষণ উঁচু আর তেমনি মোটা চেহারার। সে বলল, 'এই যে হুজুর, কোথায় পালানো হয়েছিল শুনি? কত লোক খোঁজাখুঁজি করে এলো সারা শহরটা।'

'আসুন—ইনি আমার দেশের ভাই, পরিচিত লোক দেখে বেরিয়ে গেলাম।'

ফরিদকে বসতে দিল একজন পুরুষ। সে বলল, 'আপনাকে বোধহয় আমি দিল্লীতে দেখেছি! আপনি বাদশার পরিবারের লোক নন তো?'

ফরিদ বসার পর বলল, 'হয়তো একরকম চেহারার কেউ লোক আছে। আমি একজন শিল্পী, ছবি আঁকি আর কবিতা লিখি।'

কিছু নাস্তাপানি আনল বিরাটবপু মহিলাটি। সে বলল, 'আপনি ছবি আঁকতে পারেন, আমার একটা ছবি এঁকে দেবেন?'

'হ্যাঁ, দেবেন তো ভাই। একটু ছোট করে এঁকে দেবেন। নইলে আবার কাগজে ধরবেন না!' বলল কিসমত।

'হুঁ!' বলে হাতের গুঁতো মারল মহিলাটি তার স্বামীকে।

ফরিদ হাসল। সে কিন্তু দেখল মেয়েটি বড় চেহারার হলেও সুগঠিতা, উদ্দাম যৌবনা। নাক চোখও নিন্দনীয় কিছু নয়। শিল্পীর মনে যেমন কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক তেমনি ওর শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হল ফরিদ।

বলল, 'পারিশ্রমিক নিয়ে সাধারণত আমি রাজপরিবারের ছবি এঁকে থাকি। নানান দেশে যাই। ঠিক আছে, আমি আপনার ছবি

এঁকে দেবো যদি আমার এই বন্ধুকে আর বন্দী করে রেখে প্রহার না করেন।'

'ও তো পাগল। জানেন, ও কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। খাবার ফেলে দেয়।'

'ঐসব করলে আমাকে পাগল ভেবে ওরা ছেড়ে দেবে ভেবেই করেছিলাম। তা বেত দিয়ে এমন ঘা কতক মারল...সত্যিই, আমি পাগল হয়ে যাব...ওর ঐ অত বড় গাল!'

হাঁ করে তেড়ে এলো মেয়েটা। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল কিসমত।

হেসে পাগল হল ফরিদ। বুঝল মেয়েটি ভাল, তবে কিসমতের মাথায় বোধহয় কিছু ছিট আছে।

হঠাৎ ভয় দেখাল ফরিদ, বলল, 'দোস্ত আমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কথা বলেছে, তা যদি কোনোক্রমে বাদশা৹ শাহ আব্বাসের চরের কানে যায়, নির্ঘাত বন্দী হয়ে যাবে।'

'কি কথা! ওমা, পাগলকে বন্দী না করে তো উপায় নেই।'

ফরিদ বলল, 'বাদশা শাহজাহান নাকি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কাশ্মীরে এসে পড়েছেন, যুদ্ধ বাধে বলে কথা!'

'এই, একথা কে বলেছে? কেন বলেছ? চলো, তোমাকে বন্দী করে রাখি—চলো ও ঘরে।'

কিসমত বাধ্য হল অন্য ঘরে যেতে। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি এসে বললে, 'চাবি দিয়ে রেখে এলাম ওকে।'

'উঠি আজ আমি।'

'সেকি! ছবি এঁকে দিয়ে যাবেন না?'

'আজ নয়, আর একদিন।'

'তাহলে আপনাকেও বন্দী করে রাখব।'

হাসল ফরিদ।

'বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার নাম মরজিনা। কুস্তীর লড়াইয়ে

শহরে আমার সঙ্গে কোনো পুরুষ পর্যন্ত পারে না। কই আমার সঙ্গে লড়ুন তো দেখি একটু—'

ফরিদের হাত ধরে টান মারল মরজিনা। বিরক্ত হল ফরিদ। বলল, 'আমি শিল্পী লোক, লড়াই কেন? তাছাড়া মেয়েলোকের সঙ্গে লড়াই আমি করি না।'

'করেন না? কতজন মেয়েমানুষের সঙ্গে লড়াই করেছেন তার কি ইয়ত্তা আছে! আপনি যে রকম রূপবান স্বাস্থ্যবান পুরুষ তাতে বহু মেয়েই আকৃষ্ট হবে আপনার দিকে।'

ফরিদ হাসল। মেয়েটি এমন সহজ স্বচ্ছন্দ কেমন করে সেটা ভেবে পায় না। ওর ভাইটাই বা কোথায় গেল? বলল, 'আপনার ভাইয়াকে ডাকুন।'

'কেন, তাকে আবার কেন?' চোখ রাঙাল মরজিনা। বলল, 'আমি স্বাধীনা মেয়ে—যা ইচ্ছা করি। এই বাড়িঘর-বাগান, তিনটে পাহাড়, ক্ষেত-জমি সবই আমার। ভাইয়া তো পালিত পুত্র আমার বাবার, তাও যৌবনকালে ভারতবর্ষে পালিয়ে যায় টাকা-পয়সা, গহনাগাঁটি চুরি করে নিয়ে। সে কাশ্মীরের একটি মন্দ মেয়ের খপ্পরে পড়ে সব খুইয়ে দেশে ফিরল ঐ কিসমত পাগলটাকে সঙ্গে নিয়ে। বাবাজী তখন সব সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছেন। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় তিনি তখন। তাই মৃত্যুর আগে কিসমতের হাতেই আমাকে তুলে দিয়ে গেলেন। আমার সাদীর পরদিনেই তিনি মারা গেলেন। ভাইয়া আমার চাকর-বাকরের মতো থাকে, ঘরদোর, ক্ষেতখামার দেখে। আচ্ছা, এই কান্দাহার শহরে কি একটিও প্রেমিক পুরুষ নেই যে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়? আমার শরীরের গঠন কি এতই বেঢপ? আমি কিন্তু মনে করি ওরা সব নাবালক—গাড়লের দল। আর ঐ কিসমত লোকটা হিজড়ে। এই সুন্দর পুরুষ, তুমি থাকবে আমার কাছে? আমার যথাসর্বস্ব আমি তোমাকে দোব।'

ফরিদ বলল, 'ইয়া আল্লা! তুমি বড় মেহেরবান। এমন একটা

আশ্রয়ের সন্ধান তুমি দেবে ভাবতেও পারি না। মরজিনা, তুমি কি সুন্দর! প্রাণবন্ত।'

মরজিনা হঠাৎ আকুলভাবে জড়িয়ে ধরল ফরিদকে। বলতে লাগল, 'তুমি আমার সোনা, লক্ষী, তুমি আমার তোতা, ময়না। বলো, কোথা ছিলে এতদিন। বলো, আর যাবে না? কিসমতকে ছেড়ে দোব?'

ফরিদ দেখল, তার রেহাই নেই। এ মেয়ে ভীষণতর যৌবন-পাগল। অতৃপ্ত আত্মা ওর কিসমতকে পীড়ন করে। ও হঠাৎ বলল, 'তুমি থাকবে, পালাতে চেষ্টা করলে এই তলোয়ার মেরে কেটে ফেলব। আমি দাসীদের মোরগ-পোলাও বানাতে বলছি। আর কি খাবে তুমি? রাত্রে আমরা দুজনে এক বিছানায় শুয়ে গল্প করব, আনন্দ করব। এই সতীর ছেলে, লজ্জায় লাল হওয়া কেন? আমি পাপ-পুণ্য মানি না। একজন রাজা বা কোটিপতি লোক যত পারে মেয়ে-মানুষ ভোগ করে, তাতে পাপ হয় না। তোমাদের দেশের বাদশা আকবর, জাহাঙ্গীর নাকি মীনা বাজার থেকে রোজ একটা করে সুন্দরী আনতেন। পাপ! হিহি...তাবলে এই ছেলেটা, তুমি যেন ভেব না আমি নেহাৎই নষ্ট মেয়েমানুষ। আমি ভীষণ শক্ত। শুধু তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি আসছি এখনি।'

ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল মরজিনা। ফরিদ ভাবতে লাগল, এর চাইতে আশ্চর্য মেয়ে আর কি হতে পারে। বৈচিত্র্যের সে উপাসক। এর শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে। সরাইখানায় সে আজ আর ফিরবে না।

তবু সে রসিকতার জন্য হঠাৎ পাশের কামরায় ঢুকে একটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ছাদে। দোরটা বন্ধ করে দিল। বাগানে অন্ধকার। ভূতুড়ে গাছপালা।

কিছুক্ষণ পরেই খোঁজ পড়ল তার। চিৎকার—ডাকাডাকি। আলো নিয়ে খোঁজ-তল্লাস। মরজিনার ভাইটা ছুটল শহরের দিকে।

মরজিনা পিটতে লাগল কিসমতকে।

'তোর বন্ধু কোথায় হারামজাদা, হিজড়েটাকে আজ কেটে টুকরো টুকরো করব।'

কিসমত হাউমাউ করে কাঁদছে। ক্ষ্যাপা পাগলের মতো মাঝে মাঝে মারামারি করতে চেষ্টা করছে। তখন তাকে বোধহয় ঘাড় মুড়ে চেপে ধরেছে মরজিনা। পায়ে ধরে আর্তি জানানোর স্বর ভেসে আসে ওর স্বামী নামক মানুষটির।

ফরিদ নেমে এলো। চুপি চুপি পিছনে এসে মরজিনার হাত ধরে টান মেরে হাতটা এমন ভাবে পাকিয়ে ধরল ফরিদ যে মরজিনা আর নড়তে পারল না।

'এই ছাড়ো, ছাড়ো, তুমি কোথায় ছিলে? তোমার গায়ে তো খুব জোর। আচ্ছা, হাত ছাড়ো। বোঝাচ্ছি···।'

হাত ছেড়ে দিতেই মরজিনা হঠাৎ ফরিদকে ধরল কিন্তু ফরিদ চকিতেই তাকে ল্যাং মেরে ধপাস্ করে ফেলে দিল মাটিতে।

হাততালি দিল কিসমত।

আবার উঠল মরজিনা।

রীতিমতো কুস্তি লেগে গেল। ফরিদের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে দিল মরজিনা। ফরিদও ওর বুকের জামা ধরে টান মেরে পড়পড় করে ছিঁড়ে নিল। সে দেখল মরজিনার তুঙ্গ বুক। অপূর্ব সুন্দর পেটের ভাঁজ। তাকে বার বার ফেলে দিল। হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। কিসমত যেন শিশুর মত খুশী। ইশারা করছে মরজিনার শালোয়ার-টাকেও ছিঁড়ে ফেলতে।

ফরিদ মরজিনাকে টেনে তুলল ইজেরের দড়ি ধরে। দড়িটা কেটে যেতে মরজিনা ইজের চেপে ধরল। বলল, 'হার মানছি — এই পুরুষ, তোমার কাছে হার মানছি।'

ফরিদ ছেড়ে দিতে হঠাৎ তার মুখের ওপরে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারল মরজিনা। ফরিদ অন্ধকার দেখল কিছুক্ষণ। সে পড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পাশের কামরায় এনে বিছানায় ফেলে দিল মরজিনা। দোর বন্ধ করে দিয়ে এলো সে। ফরিদ দেখল, তার

ঠোঁট কেটে রক্ত গড়াচ্ছে আর মোমের আলোয় মরজিনা একটা নগ্ন পাথরের মূর্তির মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহসৌষ্ঠব অপূর্ব। শিল্পী যেন তিল তিল করে খোদাই করেছে বহুকাল ধরে মন দিয়ে।

ফরিদ উঠে বসল। ডাকল কাছে, খুব আদর করে, 'এসো। দেখি তোমাকে! দেখার মতো সম্পদই বটে!'

গোটা শরীরে ওর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখল ফরিদ। মরজিনা কথা বলছে না। স্থির অপলক চোখে ফরিদের দিকে চেয়ে আছে। তারপর জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল: 'তুমি আমার, ওগো তুমি যেও না....তোমার পায়ে ধরি...'

'ছি! কাঁদে না। আমি থাকব। আমার রাজ্য চাই না। আমি তোমার প্রেমিক হয়ে থাকব।'

'এই, লজ্জা করছে! তোমার খাবার আনি। আহা, ঠোঁটটা কেটে গেল! কত লেগেছে তোমার। বেচারা কিসমতকে এবার ছেড়ে দিই। যাক, সে চলে যাক।' শরীর ঢেকে বেরিয়ে গেল মরজিনা।

এ এক ব্যাপার! ঝড় বয়ে গেল যেন! কিছুক্ষণ পরে মরজিনা খাবার আনল, তাকে পাশে বসিয়ে নিজের হাতে খাওয়াতে লাগল।

রমণীয় সুখে রাত পার হল ফরিদের। পরদিন সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোল মরজিনা।

ফরিদ তার ছবি আঁকতে বসল। মরজিনাকে নিয়ে এমনই মেতে রইল সপ্তাখানেক যে কোথায় তার সরাইখানা, কোথায় ইরাকে ফিরে যাবার কথা—কিছুই যেন মনে রইল না।

হঠাৎ একদিন শুনল শাহজাহান বাদশার সৈন্যবাহিনী কান্দাহারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যুদ্ধ চলছে।

মরজিনার ভাই এসে সংবাদ দিতে লাগল, যুদ্ধের গতিক ভাল নয়। বাদশা শাহ আব্বাস অসুস্থ, মৃত্যু শয্যায়। যুবরাজ পারভেজের বাহিনী পিছু হটছে। কান্দাহার শহরের অধিকার তাঁর হাত থেকে

ছেড়ে যায় যায় অবস্থা। বিপুল বাহিনী এনেছেন শাহজাহান। তখন হঠাৎ খেয়াল হল ফরিদের, কিসমত তাহলে কি অনুচর ছিল? তাকে ছেড়ে দেবার পরই যুদ্ধ বাঁধল? সে বোধহয় সংবাদ দিয়েছে, এখন যুদ্ধ বাঁধানো সঙ্গত। এবং নিশ্চয়ই ফরিদকে চিনতে পেরেছে। এখানেও তাহলে শাহজাহানের বিজয়বাহিনী আসবে একবার, তার খোঁজে।

সে বলল, 'শোনো মরজিনা, এভাবে বসে বসে হার দেখা যায় না। আমি যুবরাজ পারভেজের সৈন্য পরিচালনা করব। মরজিনা, লুকোবার উপায় নেই। কিসমত হিজড়ে হোক আর যাই হোক, সে চর ছিল। আর আমার পরিচয় তুমি জানো না।'

'কে তুমি?'

'তোমার ভাই যে বলেছিল দিল্লীর রাজপরিবারে সে আমাকে দেখেছে, কথাটা সত্য। আমি ফরিদ। বাদশা জাহাঙ্গীরের পুত্র, কান্দাহারের শাসনকর্তা করেছিলেন আমাকে—আমি স্বীকার হইনি। এখন আমি ইরাকের বাদশা। আমার রানী বেদৌরা সিংহাসনে বসে আছে। পারভেজ আমার শালীর বর।'

'আমার কি হবে গো! তাহলে তুমি, মানে আপনি এখানে এলেন কেমন করে?'

'তোমাকে বলি, বন্ধু, আমার সাথী তুমি। মাকে মুক্ত করতে গিয়ে শাহজাহানের হাতে বন্দী হয়ে যাই আমি। কারাগার থেকে পালিয়ে এসে পথে পথে ঘুরছিলাম; ইরাকেই চলে যেতাম। তুমি পথে কদিন আতিথ্য দিলে—সুখ দিলে—মনে থাকবে। আমাকে তুমি তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বেঁধে রেখো না। সময় নেই আর। দেরি করলে অহেতুক প্রাণ হারাতে হবে মশা-মাছির মতো।'

মরজিনা কাঁদতে লাগল ফরিদের গলা জড়িয়ে ধরে। তবু তাকে বিদায় দিল। বলল, 'যাও বীর, তুমি যুদ্ধ করো। যুবরাজ পারভেজকে সাহায্য করো। যদিও এই পারভেজ অথবা শাহজাহান আমাদের কান্দাহারবাসীদের কেউ নয়, দুজনই সমান শত্রু।'

মরজিনা বীর্যবতী নারী। ফরিদকে যুদ্ধের পোষাকে সাজিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় তুলে দিল। তারপর বলল, 'দাঁড়াও, কি হবে আর আমার এই বাড়ি-ঘর-দোর, বাগান-ক্ষেত যদি তুমিই চলে গেলে! আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যাব। তুমি যাকে সমর্থন করো, তাকে সমর্থন করেই আমি যুদ্ধ করব।'

ফরিদ আকাশে তলোয়ার উঁচিয়ে বলল, 'সাবাস—বীর্যবতী মরজিনা! এসো তুমি—'

তারা দুজনে যখন পারশ্যবাহিনীর মধ্যে যোগদান করল যুবরাজ পারভেজ আলিঙ্গন করল ফরিদকে। বলল, 'আসুন, দুঃসময়ের বন্ধু। আপনি বন্দী ছিলেন, বেদৌরা-আপা সংবাদ পেয়েছেন আমার কাছ থেকে। আমরা মিলিত বাহিনী গড়ে যুদ্ধে নামতে চেয়েছিলাম কিন্তু বেদৌরা আপাজান বললেন, যুদ্ধে মানুষ ক্ষয় করে লাভ কি!'

'এ আমার বন্ধু, সমান যোদ্ধা।' বলল ফরিদ মরজিনাকে দেখিয়ে। আলিঙ্গন করল পারভেজ। বলল, 'সেকি, ইনি কি নারী!'

ফরিদ হাসতে লাগল।

কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। তিনজন তারা তিনটে বাহিনী চালনা করতে এগিয়ে গেল।

ফরিদ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল। শত্রুবাহিনী পিছু হটতে লাগল। সে দেখল মরজিনার রণমূর্তি। সে কচুকাটা করছে দু-পাশের শত্রু সৈন্যদের। মুণ্ডু উড়িয়ে দিচ্ছে তলোয়ার মেরে। আর চিৎকার করছে, 'ফরিদ এগিয়ে চলো, পারভেজ ভয় নেই—আমি সেই রুস্তম, এইসব ছাগল-ভেড়াদের আমি পাহাড়ের ওপারে তেড়ে দিয়ে আসছি।'

সারাদিনের যুদ্ধের পর কান্দাহার আবার শত্রুমুক্ত করা গেল।

রাত্রে ছাউনীর মধ্যে তিনজন যখন শুয়ে শুয়ে কাবাব আর উত্তেজক পানীয় পান করছিল, ফরিদ বলল, 'এই বীর্যবতী রমণী যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিয়েছে পারভেজ, একে তুমি তুষ্ট করতে পার।'

মরজিনা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ফরিদ এবং পারভেজের হাত ধরে নিজের বুকের কাছে টেনে আনল। বলল, 'তোমরা দুজনেই আমার

বন্ধু, সমান সমান, ঈর্ষা করো না ফরিদ। আমি সংসার চাই না, আমি অন্যায় মানি না কিন্তু ধর্মের বাঁধা ছকও পছন্দ করি না। আমার দেহটা নারীর কিন্তু মনটা পুরুষের।'

পারভেজ বাহবা দিল। বলল, 'তোমাকে আমি হারেমে রাখব, সেনাপতি করব।'

'আগে যুদ্ধে জেতো তো! যদি বাদশা শাহজাহানের রূপ আর বীর্যবান চেহারা, যুদ্ধ-কৌশল ভাল দেখি, তবে তার কাছে হার মেনে বন্দী হয়ে তার সঙ্গে যাব। কেননা তুমি আর সে দুজনেই সমান বহিঃশত্রু আমাদের কাছে।'

পারভেজ সোজা হয়ে বসল, বলল, 'তাহলে আমার হয়ে যুদ্ধ করছ কেন?'

'ফরিদের বন্ধু তুমি। ফরিদ আমাব বন্ধু। আমার কয়েকদিনের স্বামী! হি হি হি...'

আশ্চর্য মেয়ে মরজিনা।

পবদিন মরজিনা একাকী বাহিনী ছেড়ে যুদ্ধ করতে করতে মোগল সৈন্যদের ভেতরে চলে গেল। সে বহু সৈন্য মেরে ফেলেছিল। বাদশা শাহজাহানের সামনে পড়ল এবার সে। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল। বলল, 'আমি একজন নারী। আমার সঙ্গে কত পুরুষ যুদ্ধে হারল, তারা ভয়ে পঙ্গপালের মতো পালাচ্ছে। রাজা, তোমাকেও তারা ফেলে পালিয়ে গেছে! এটা কি যুদ্ধ হচ্ছে, না ছেলেখেলা! তুমি যুদ্ধের যোগ্য পুরুষ নও—প্রেম করার চেহারা তোমার! এসো তবু, ক্ষমতা থাকে যুদ্ধ করো। নইলে কান্দাহার ছেড়ে পালাও। বাপের নাম ভুলে যাবে বাপের হারানো রাজ্য উদ্ধার করতে এসে।'

'বাচাল নারী, তোমার বাচালতা রেখে এখন যুদ্ধ করো।'

'তবে রে অত্যাচারী স্বার্থপর কুত্তা! মর—মর তুই আমার এই আঘাতে।'

মরজিনা ঘোড়ার পেটে আঘাত করল পায়ের। ঘোড়া চিহিঁহিঁ করে ওপরে পা তুলে আড়াল করল। শাহজাহান পেছিয়ে গেলেন

ঘোড়া নিয়ে। তারপর তলোয়ারের অকস্মাৎ আঘাত এসে পড়ল শাহজাহানের ঘোড়ার পিঠের ওপর। শাহজাহান পড়ে গেলেন মাটিতে।

মরজিনাও নেমে পড়ল লাফ দিয়ে। বলল, 'বাদশা, যুদ্ধ থাক। পালাই চলো দুজনে। আমার পাহাড়ী উপত্যকার বাড়িতে তোমাকে রাখব।'

'তুমি আমার বাহিনীতে চলে এসো, রাণী করব।'

'কুত্তা! নেমকহারামী করব আমি? ফরিদ তোমার কি ক্ষতি করেছিল? সে মাকে আনতে গেল, কোহিনূর দান করল আর তাকে বন্দী করলে? ছোট ভাইয়ের চোখ উপড়ে নিলে? হিন্দুদের মন্দির ভেঙে দিচ্ছ? তুমি কাপুরুষ, স্বার্থপর।'

অকস্মাৎ শাহজাহান তলোয়ার মারলেন মরজিনার কাঁধের ওপর। মরজিনা আহত হল। কিন্তু সে তা যেন ভ্রূক্ষেপ করল না। তলোয়ার নিয়ে এবার ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। চারদিকে যুদ্ধ হচ্ছে—কে কাকে বাঁচায় তখন। তলোয়ারে তলোয়ারে ঠেলাঠেলি হচ্ছে। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল ফরিদ এগিয়ে আসছে। মরজিনা হাঁকল, 'ফরিদ, সেই শয়তান বাদশা শাহজাহান।'

শাহজাহান দেখলেন ফরিদ এগিয়ে এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে।

মরজিনার প্রচণ্ডবেগ আঘাতে হাত থেকে তলোয়ার ছিটকে পড়ে গেল।

ফরিদ বলল, 'এই যে ভাইয়া! রাজ্যপিপাসা মিটিয়ে দেবো এবার তোমার?'

'তুমি তো ভাই, কার জন্য যুদ্ধ করছ? মোগলদের হৃত রাজ্য উদ্ধার করা কি কাম্য নয়? এই কান্দাহার পাবে তুমি—জিতে নাও।'

'আমাকে অন্ধ শাহরিয়ারের কক্ষে বন্দী করেছিলে কেন?'

'আমি তেমন হুকুম দিইনি। হয়তো আমার শ্বশুর এই কাণ্ড করেছিলেন।'

'তুমি প্রাণভিক্ষা করলে ছেড়ে দিতে পারি। আমার সঙ্গে তুমি

একা তো দূরের কথা, বারোজন বাছাই করা সৈন্য নিয়েও যুদ্ধে হারাতে পারনি আর আমরা এখন সমানে সমানে দুজন শত্রু।'

'আল্লার শপথ করছি, আজ থেকে তুমি আমার শত্রু নও।'

রক্তে সমস্ত শরীর ভিজে যাচ্ছিল মরজিনার। শরীর অবসন্ন হয়ে আসছিল। সে হঠাৎ বসে পড়ল। ফরিদ তাকে ধরে তুলতে যেতেই শাহজাহান ইংগিত করলেন কাছাকাছি যুদ্ধরত সৈন্যদের, ওদের নিয়ে যেতে।

মোগল শিবিরে এবার তিনজন। একদিকে বাদশা শাহজাহান, অন্যদিকে ফরিদ, মাঝখানে মরজিনা।

মরজিনার আঘাতচিহ্ন গভীর হলেও সে এখন প্রায় সুস্থ। সে বলল, 'আমি এখন তাহলে কার?'

শাহজাহান বললেন, 'যদি বলি আমার।'

'তিনজনই আমার কাছে সমান। কিন্তু ফরিদকে তুমি কি ছেড়ে দেবে?'

'ফরিদ বন্দী নয়। আমার বাহিনী চালনা করবে সে আগামী কাল। কেননা মোগলের রাজ্য উদ্ধার করাই তার পক্ষে শ্রেয়।'

ফরিদ বলল, 'তার চাইতে আমি শিল্পী বা মুসাফিরই থাকি। আমি যদি তোমার সঙ্গে যোগ দিই ইবাক আক্রান্ত হবে পারভেজের দ্বারা। বরং আমি চলে যাই এই রাত্রির অন্ধকারে অন্য কোথাও। আমরা না সহযোগিতা করলে পারভেজ মোগল সৈন্যদের ঠেকাতে পারবে না।'

শাহজাহান ফরিদের হাত দুটো চেপে ধরলেন হঠাৎ। বললেন, 'ভাই, তুমি আমার ভাই, সব অপরাধ আমার মার্জনা করো। তুমি চলে যাও। তোমরা বন্দী হয়েছ বলে খবর রটে গেছে। পারভেজ হতোদ্যম। তুমি গোপনে ইরাকে চলে যাও।'

ফরিদ চুপ করে ভাবল কিছুক্ষণ। বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

ফরিদ উঠতেই মরজিনা বলল, 'আর আমি?'

'তুমি আমার কাছে থাকো। তোমাকে আমি দিল্লীতে নিয়ে যাবো।' বললেন বাদশা শাহজাহান।

মরজিনা বাদশার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সে চোখে হাসি। বাদশার হাত এগিয়ে এলো। সেই হাতে সে মাথা রাখল। চোখ বন্ধ করল। চোখ যখন খুলল, দেখল সে, ফরিদ নেই। তার দুটো চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বাদশা রুমাল দিয়ে তা মুছে দিলেন।

কান্দাহার আবার উদ্ধার করা সম্ভব হল মোগলবাহিনীর পক্ষে।

পারভেজের পারশ্যবাহিনী হটে এলো নিজের রাজ্যের মধ্যে।

বাদশা শাহজাহান সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কান্দাহার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা নতুন করে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন দিল্লীতে।

এই সংবাদ গোটা পৃথিবী জানল।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

ফরিদও জানল সবকিছু। সে তখন মুসাফির বেশে বৃদ্ধ পীর সেজে লাঠি ধরে এগিয়ে চলেছে পারশ্যের পথ বেয়ে ইরাকের উদ্দেশে। অবসন্ন ক্লান্তিতে হাঁটতে হাঁটতে তার পা দুটো যেন অবশ হয়ে আসছিল।

একটা হতাশা তার মনকে বড় পীড়া দিচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল সে আবার হেরে গেল শাহজাহানের কাছে। সে বলল তার বন্দী হওয়ার ব্যাপারে নাকি কোনো হাত ছিল না। তার শ্বশুর এই কীর্তি করেছিলেন। এটা মিথ্যা কথা? কিন্তু আসফ খাঁ যে প্রকৃতির লোক তা কি করতে পারেন না? শাহরিয়ারকে ধ্বংস করে দিয়ে শাহজাহানের সিংহাসনের কাঁটা দূর করেন তিনিই তো!...

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাঁধানো একটি পুষ্করিণীর ঘাটে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে আঁজলা ভরে একপেট জল খেল ফরিদ। তারপর অজু করে উঠে এসে মগরেবের নামাজ পড়ল।

নামাজ শেষে সে আলিসায় হেলান দিয়ে বসে রইল। গোলাপ বাগ থেকে সুমধুর গন্ধ ভেসে আসছিল।

কাছেই একটি সুরম্য হর্ম—তার মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ছিল সবুজ গাছপালার মধ্যে দিয়ে।

কয়েকটি বালক-বালিকা এসে এই অপরিচিত বৃদ্ধ দরবেশকে দেখছিল। একটি বছর চৌদ্দ বয়সের বালিকাকে ডেকে সে শুধোল, 'ওটা কার বাড়ি গো—বেশ সুন্দর বাড়ি তো!'

একটি বালিকা বলল, 'আমাদের বাড়ি। আমার বাপের নাম আবু ইনসান। আপনি চলুন না আমাদের বাড়ি।'

ফরিদ তাদের গেয়ে শোনাল একটা দ্রুত তালের ছড়া গান। ছেলেমেয়েরা তা শুনে খুব খুশী হয়ে হাসতে লাগল। তার হাত ধরে টানতে লাগল বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে।

ফরিদ বলল, 'আমি তো ভারতবর্ষের কয়েদখানা ভেঙে পালিয়ে

আসছি। আসতে আসতে এত বড় দাড়ি গজিয়ে গেল, হাঁটু ভেঙে গেল। আর চলতে পারছি না ভাইবোনেরা! তোমরা যদি কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাও তাহলে যাই।'

'হ্যাঁ, আমরা আপনাকে বয়ে নিয়ে যাব—ধর তো সবাই!'

ছেলেমেয়ের দল ফরিদকে ধরে কাঁধে তুলতে চেষ্টা করল। পারল না। বুড়ো লোকটা এত ভারী কেন!

অবশেষে ফরিদ একটা সুন্দর দেখতে ছোট বছর তিনেকের বাচ্চাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে চলল ওদের বাড়িতে।

মহা হৈ-হল্লা আনন্দ!

বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এসে সালাম জানাল। মেয়েরা বুড়োমানুষ দেখে লজ্জা ত্যাগ করে কাছে এলো।

কর্তা আবু ইনসান বলল, 'মেহেরবানী করে আপনার মতো মুসাফির যখন আমার মতো সামান্য মানুষের বাড়ি পা দিয়েছেন তখন দয়া করে অন্তত রাতটা থাকুন।'

ছেলেরা বলল, 'হ্যাঁ, থাকতে হবে।'

'থাকছি ভাইসব, থাকছি।' ফরিদ তার কাঁধের ঝোলা আর হাতের লাঠি রেখে বৈঠকখানায় পেতে-দেওয়া বিছানাখানায় বসল। ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে নিল।

তিন-চারটে আলো এলো। ফুল এনে রাখা হল ফরিদের সামনে। গরম দুধ আর ফল খেতে দেওয়া হল।

'আবু ইনসান সাহেব আপনার কথা বলুন।' বলল ফরিদ।

'কি আর বলব বাবামিয়া। গরিব আমি। কিছু ফল আর ফুলের বাগান আছে। গম চাষ হয় বিঘে পঞ্চাশ জায়গায়। আমার ছেলেমেয়ে অনেক। চোদ্দটা ছেলে আর সাতটা মেয়ে। কুড়িটা উট আর একশো ছাগল আছে। এই বাড়িটা করেছি।'

'খুব ভাল। আচ্ছা, এখান থেকে ইবাকের সীমান্ত কত দূর?'

'জী, সীমান্ত অঞ্চলেই আমাদের বাস। আমি পারস্যের লোক। হুজুর কি ইরাকে যাবেন?'

ফরিদ সম্মতিজ্ঞাপক মাথা নাড়ল। বলল, 'আচ্ছা, আপনি কি ইরাকের রাজনৈতিক কোনো খবর জানেন?'

ইরাকের নতুন রাজা হয়েছেন। তিনি নাকি অভিষেকের পরই হঠাৎ কোথায় চলে গেছেন। রাণী বেদৌরা এখন সিংহাসনে বসে রাজার নামে শাসন চালাচ্ছেন। প্রধান উজির আজিজ ইমাম অত্যন্ত জ্ঞানী-গুণী লোক। সারা রাজ্যে এখন শান্তি ফিরে এসেছে। আচ্ছা হুজুর, আপনি তো দূর দেশ থেকে আসছেন, পারশ্যের যুবরাজ শাহ পারভেজ নাকি যুদ্ধে হেরে গেছেন হিন্দুস্তানের বাদশার কাছে? কান্দাহার আবার হাতছাড়া হয়ে গেল?'

'শুনছি তো তাই।'

একটি বালিকা বলল, 'আপনি বললেন, ভারতবর্ষের কয়েদখানা ভেঙে আপনি পালিয়ে আসছেন, সে খবরটা সত্যি?'

ফরিদ একটু দ্বিধায় পড়ল। বলল, 'কয়েদখানা ভাঙব কেমন করে? পাথর দিয়ে গাঁথা। তবে একটা হাবসী গোলাম আমাকে বার করে দিয়েছিল—সেই যৌবনে কয়েদ হল আর বৃদ্ধ হয়ে গেলাম!'

'আপনি আমাদের গান শোনান।'

ফরিদ তাদের গান শোনাতে লাগল। তার গানের গলা যে এত ভাল তা কেউ আশা করে নি। পাড়ার লোকরা এসে জুটল। সীমান্ত-রক্ষী সৈন্যরাও এসে গান শুনতে বসে গেল।

মাঝরাতের পর পর্যন্ত গান গেয়ে, গল্প বলে, কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে ফরিদ যখন ক্লান্তি বোধ করতে লাগল তখন আবু ইনসান তাকে বিশ্রাম করার জন্য অনুরোধ করল।

যখন একা হল ফরিদ, সেই ভাবনাটা আবার এসে তাকে গ্রাস করল। কেন সে সুযোগ পেয়েও শাহজাহানকে হত্যা করল না? তাহলে তখনই সে মোগল বাহিনীর কর্ণধার হয়ে যেত আর হিন্দুস্তান দখল করে নিত সহজেই। তারপর আবার কান্দাহার জয় করত মরজিনাকে নিয়ে। পারশ্যের সম্রাট শাহ আব্বাস এখন শয্যাশায়ী—যুবরাজ শাহ পারভেজও তার হাতে পরাস্ত হত, সারার কথা ভেবেই

হয়তো পারভেজের কিছু করত না। আর ইরাক তো তার দখলে আছেই।

কি ভুল! কিন্তু নিজের পিতার ঔরসজাত সন্তানকে সে হত্যা করবে প্রতিহিংসায়? শাহজাহান কুটিল—তার মরজিনাকেও নিয়ে চলে গেল। মরজিনাকে মেরে ফেলবে না তো?

কোহিনূরটা হাতছাড়া করা তার ঠিক হয়নি। মাকে আর দেখতে পেলে না! পীরচেঙ্গি আর অনেকদিন দেখা দেন নি। মরজিনার সঙ্গে বিহার, তার জন্য কি পাপের কাজ হল? কই নাতো—মন তো তা বলে না, মরজিনা যেন পাপ-পুণ্যের বহু উর্দ্ধে। এমন জীবন্ত মেয়ে এক বেদৌরা ছাড়া আর কেউ নেই কিন্তু বেদৌরার যৌনসংযম, ন্যায়-পরায়ণতাবোধ অপরিসীম। শাহজাহান চিরকাল তার শত্রু—অথচ তার কাছে গেলেই ফরিদ যেন কেমন হীনমন্যভাবের হয়ে যায়। সে তাকে 'বাঁদীর বাচ্চা' বলে! সত্যিই কি সে বাঁদীর বাচ্চা বলে এই হীনতার ভাব? যে রোষে ফণা তোলে শাহজাহান তেমনটা পারে কই ফরিদ? সে যে চোরের মতো, অপরাধীর মতো রাজপ্রাসাদে মানুষ। কখনো রাজ্য লাভ করবে এ স্বপ্ন তো দেখেনি! তবে যুদ্ধ শিখেছে, রাজনীতি শিখেছে, প্রেম করেছে, সাধারণ লোকদের মধ্যে গেলেও নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেছে সে শুধু যে-কুমারই সিংহাসনে বসুক না কেন তাদের তোয়াজ করে কোনো একটা প্রদেশের শাসন-কর্তা হবে বলে। কিন্তু বদমায়েস বন্ধুরা তার স্বভাব খারাপ করে দিলে। পীরচেঙ্গির বিরুদ্ধে লেগে তার জীবনটা অন্যদিকে চলে গেল। অলৌকিকতার মোহে পড়ল সে। নীলোফার চলে যেতে অলৌকিকতার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে।

ফরিদ তার দাড়িচুল আর পোষাক-আষাক খুলে রেখেছিল শয্যার পাশে। বন্ধ ঘর। কত কিছু ভাবতে ভাবতে ঘুম এলো তার চোখে। তার আগে সে ভাবছিল আবু ইনসানের সুন্দরী সপ্তদশী একটি কন্যার কথা। সে সারাক্ষণ হাসিমুখে তাকিয়েছিল একটি গবাক্ষের নিচে বসে। হঠাৎ কিসের শব্দে যেন ঘুম ভেঙে গেল ফরিদের। চোখ

মেলে দেখল আবু ইনসানের সেই সপ্তদশী মেয়েটি তার দাড়িচুল সমস্ত নিয়ে ভেতর দরজা দিয়ে হঠাৎ পালিয়ে গেল! হাসির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল শুধু একটা—হি হি হি...

ফরিদ ভাবতে লাগল—এবার কি হবে! সে ছদ্মবেশী—হয়তো সীমান্তরক্ষীরা তাকে বেঁধে চালান দেবে পারস্যের রাজধানীতে। শাহ পারভেজ তাকে বন্দী করে রাখবে যদি তার মোগলবাহিনী কর্তৃক বন্দী হওয়ার সংবাদ মিথ্যা বলে জেনে থাকে। এটা ঠিক যে সে আর মরজিনা যদি শাহজাহানকে মেরে ফেলতে পারত...

কিছুক্ষণ পরেই দুয়ারে আঘাত পড়ল। আবু ইনসানের গলা। 'এই যে মুসাফির, উঠে পড়ুন, ফজর হয়ে গেল। আজান হচ্ছে। নামাজ পড়বেন না?'

দুয়ার খুলে দিল ফরিদ।

আবু ইনসান ঢুকে পড়ে সুদর্শন চেহারার যুবক ফরিদকে দেখে বলল, 'সে কি! আপনি কে? দরবেশ কোথায়?'

'আমিই সেই ছদ্মবেশী দরবেশ।'

'ছদ্মবেশের কারণ?'

'আছে, কারণ আছে। আপনার মেয়েটি কি সন্দেহ করেছিল আমার হাত-মুখ-পা দেখে আর গলার স্বর শুনে? সে আমার ছদ্মবেশের পোষাক নিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনি পারস্যের সীমান্ত বাহিনীর কাছে কোনো কিছু জানাবেন না।'

'তা কি পারি হুজুর, তা কি পারি।'

'কি পারবেন না?'

'এই যে আপনি ছদ্মবেশী—যদি দেশের শত্রু হন? এই আপনি বৃদ্ধ দরবেশ? আমার ঐ সাবিনা মেয়েটি ঠিক ধরেছিল, ওর কাছে চালাকি চলে না।'

'কোথায় সে। তাকে একবার ডেকে আনুন, পুরস্কার দেবো।'

'কি আপনার আছে যে পুরস্কার দেবেন?'

হাসতে লাগল ফরিদ। তার উচ্চ হাসির শব্দে আবু ইনসান অবাক হল।

ফরিদ বলল, 'আপনার সাবিনাকে যদি আমি সাদি করতে চাই ?'

'কে আপনি যে কন্যাদান করব ?'

'যদি বলি আমিই সেই লোক...না-না-না থাক...ছদ্মবেশ ফিরিয়ে দিন, আমি চলে যাই।'

আবু ইনসান কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে দেখল ফরিদকে। অসামান্য রূপবান এই যুবক। সুগঠিত দেহ। নীলাভ পিঙ্গল চোখ, মসৃণ বাহু। এ লোক সাধারণ কেউ নন। বলল, 'যেই হোন আপনি, তবে সাধারণ ঘরে যে আপনার জন্ম নয় তা চেহারা দেখেই বোঝা যায়। মানুষের চেহারা দেখেই বোঝা যায় সে কি খায়, কেমন আরামে লালিত পালিত। যাহোক, আপনি যদি পবিত্র কোরআন স্পর্শ করে আত্মপরিচয় দেন, তবেই সহজে আপনাকে যেতে দেবো, নইলে সীমান্তরক্ষীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হব।'

'হায় আমার আশ্রয়দাতা। হাটে হাঁড়ি ভাঙবেন না, দোহাই আপনার। আনুন সেই পবিত্র ধর্মপুস্তক, আমি শপথ করছি।'

কোরআন শরীফ আনা হলে অজু করে ফজরের নামাজ পড়ার পর ফরিদ তা স্পর্শ করে বলল, 'আমি একজন গুনাহগার বান্দা। আমার নাম ফরিদউদ্দিন জাহাঙ্গীর।'

আবু ইনসান চিৎকার করে উঠল, 'ইয়া আল্লা! আপনি সেই রাজা। রাজা ফরিদ!'

হঠাৎ ফরিদ কোরআন শরীফখানায় চুমো খেয়ে মাথায় ছুঁইয়ে রেখে দিয়ে আবু ইনসানকে জড়িয়ে ধরে হাত চাপা দিল তার মুখে। 'চুপ, চুপ! কাউকে জানাবার দরকার নেই। এখনি আমি চলে যাচ্ছি।'

'হুজুর, আপনি যে দয়া করে গরিবের বাড়ি এসেছিলেন—কি সৌভাগ্য আমার, তাইতো বলি, এমন গলার স্বর...এমন হাত নাড়ার কায়দা-কানুন।'

সাবিনা পরচুলো আর ছদ্মবেশের সমস্ত সাজসরঞ্জামগুলো বুকে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

আবু ইনসান বলল, 'হ্যাঁ, এইযে আমার কন্যা, নিন আপনার ছদ্মবেশ....'

ফরিদ সাবিনার মাথায় হাত দিল। বলল, 'ভগিনী, তুমি সুখী হও। তুমি ছোট্ট। আমাকে এখন যেতে দাও। পরে দেখা করো, তোমাকে পুরস্কার দেবো।'

সাবিনা বললে, 'আপনি সিংহাসনে ফিরে যান। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? সুখের আলো দেখে প্রজাপতিরা আনন্দে যেমন ঝাঁপ দেবার আগে উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়ায় আপনারও দেখছি সেই অবস্থা!'

'তুমি দার্শনিক কবি সাবিনা। হয়তো তোমাকে আমার দরকার হবে—জানি না, তোমার মধ্যে কি আছে। আমাকে বিদায় দাও এখন।'

'যান আপনি—দেরি করবেন না।'

ফরিদ ছদ্মবেশ পরল।

যাবার সময় সাবিনা এলো। সে কেবলই হাসতে লাগল। হেসে লুটিয়ে পড়ল। বলল, 'কি বিচ্ছিরি। এই বুড়ো দরবেশের বেশটা!'

সাবিনার গাল টিপে দিয়ে আদর করে পথে নেমে পড়ল ফরিদ।

সাবিনা বলল, 'আবার আসবেন দরবেশজী!'

'আচ্ছা!' বলে সীমান্ত পার হয়ে ইরাকের রাজধানীর দিকে চলল ফরিদ।

॥ তেতাল্লিশ ॥

আশ্চর্য সংবাদ এলো প্রধানমন্ত্রী আজিজ ইমামের কাছেঃ রাজা ফরিদ দিল্লীর কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে এসে পারশ্যরাজ্যের পক্ষে কান্দাহারে যুদ্ধ করছেন। কান্দাহার যখন প্রায় পতনের মুখে আকস্মিকভাবে নাকি এক বিরাট দেহী নারী যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে এ.স রাজা ফরিদ যুদ্ধে নামেন। মোগল সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বাদশা শাহজাহানকে তাঁরা তুজনে ঘিরে ফেলেন কিন্তু তারপর তাঁরা মোগল সেনাদের শিবিরে চলে যান। যুদ্ধের গতি পুনরায় মোগল সেনাদের দিকে ঘুরে যায়। কান্দাহার পারশ্যবাহিনীর হাত থেকে চলে গেছে।

মোগল সেনারা বাদশা শাহজাহানের সঙ্গে বিদায় নিয়ে গেছে কিন্তু রাজা ফরিদ বা সেই বিপুল চেহারার নারী যোদ্ধার কোনো সংবাদ নেই।

আজিজ ইমাম এই সমস্ত ঘটনা রানী বেদৌরাকে অবহিত কবালেন।

বেদৌরা আনন্দে অধীর হল শুনতে শুনতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা ফরিদের রহস্যজনক অন্তর্ধানের কথায় সে যেন নৈরাশ্যে ডুবে গেল।

বলল, 'তাহলে রাজা কোথায় এখন ? তিনি কি আবার বাদশা শাহজাহানের হাতে বন্দী হয়ে দিল্লী চলে গেছেন ?'

বৃদ্ধ আজিজ ইমাম বললেন, 'আমার তো তাই মনে হয়। নইলে পারশ্য-রাজকুমার কেন তাঁর খোঁজ করছেন ?'

'খোঁজ করছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কি তিনি পারশ্যে আছেন ?'

'বোধহয়। আমার মনে হচ্ছে তিনি শেষ পর্যন্ত বাদশা শাহ-

জাহানকে ক্ষমা করে তাঁকে মিত্রতা দেন, নইলে শাহাজাদা পারভেজের হার হত না।'

'আপনি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। যথার্থ সংবাদ সংগ্রহ করুন। আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দিন।'

পরদিন রাজসভায় গুঞ্জন উঠল চারদিক থেকে। বেদৌরা এসে সিংহাসনে বসার পর একজন যুবক বলতে লাগল, 'আমি যতদূর জানি, রাজা নিহত হয়েছেন। তাঁর নামে মিথ্যা ধাপ্পা দিয়ে রাজত্ব চালানো হচ্ছে।'

আজিজ ইমাম বললেন, 'আমাদের মহামান্য রাজা এখন সঠিক কোথায় আছেন আল্লা জানেন কিন্তু এই যুবক উত্তেজিত হয়ে যা বলছে তা আদৌ সত্য নয়।'

যুবকটি বলল, 'রানী বেদৌরা আসলে একজন ছদ্মবেশী রাক্ষসী। তিনি নিজেই বাসর-রাতে তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছেন।'

কয়েকজন তাকে সমর্থন করল।

বেদৌরা তখন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি আল্লার নামে শপথ করে বলছি, নিশ্চয় আমি হতভাগিনী, নইলে রাজা ফরিদউদ্দিন জাহাঙ্গীর গোপনে হিন্দুস্তানে তাঁর মাকে আনার জন্য চলে গিয়ে সেখানকার বাদশা শাহজাহানের হাতে বন্দী হবেন কেন? পরে অবশ্য সংবাদ এসেছে তিনি কারামুক্ত হয়ে এসেছেন কান্দাহারে এবং পারশ্যের যুবরাজ শাহ পারভেজের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধে তাঁরা জয়লাভ করেন কিন্তু তাঁর আবার বন্দী হওয়ার সংবাদ এলে এই সংবাদটির সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জেগেছে। কেননা শাহ পারভেজ তাহলে তাঁকে খুঁজছেন কেন? তিনি কি বাদশা শাহ-জাহানকে সমর্থন করে অথবা তাঁর হাতে বন্দী হয়ে পুনর্বার দিল্লীতে চলে গেছেন?'

প্রথম প্রতিবাদী যুবকটি বলল, 'এসব সংবাদ মিথ্যা। রানী মিথ্যা গল্প ফেঁদে আর কতদিন সিংহাসনে বসে থাকবেন?'

'স্পর্ধার একটা সীমা থাকা উচিত!' গর্জে উঠলেন বৃদ্ধ আজিজ ইমাম।

একজন বৃদ্ধ দরবেশ রাজসভার মাঝখানে বসেছিলেন। তিনি সহসা উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত ওপরে তুললেন। তারপর রানীকে কুর্নিশ করার পর একেবারে গুরুগম্ভীর চালে গট্‌মট্‌ করে উঠে গেলেন মঞ্চের ওপর, সিংহাসনের কাছে।

তিনি বলতে লাগলেন, 'আল্লাকে ধন্যবাদ জানাই—রানীর অনুমতি নিয়ে এই বিরুদ্ধচারী যুবককে আর তার কয়েকজন হটকারী সমর্থককে আমি বন্দী করতে হুকুম করছি। কারণ তারা নিজেরাই মিথ্যাবাদী। রাজা ফরিদ জীবিত আছেন।'

যুবকটি বলল, 'এই আর এক বুড়ো পীর এসে মিথ্যাচারীদের দল ভারী করল—আসলে ইনি একজন ভাগ্যান্বেষী—যদি বুড়ো প্রধানমন্ত্রীটাকে হটিয়ে দিয়ে তাঁর আসনটিতে বসতে পারেন। রাজা ফরিদ জীবিত থাকলে কোথায় তিনি?'

দরবেশ বললেন, 'আছেন তিনি। এই রাজ্যেই এসে পৌঁছেছেন। এই বাগদাদ শহরেই। এবং এই রাজসভাতেই।'

বেদৌরা চমকে উঠেছিল প্রথমেই, কে এই দরবেশ! এখন সে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

যুবকটি বলল, 'এই রাজসভাতেই! হা-হা-হা—তাহলে আপনি কি সেই রাজা ফরিদ?'

'হ্যাঁ। আমি সেই রাজা ফরিদউদ্দিন জাহাঙ্গীর!' ফরিদ তার দাড়িচুল আর পোষাক খুলে ফেলল।

বেদৌরা উঠে এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে বসে পড়ল।

সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি।

সেনাপতি খালেদ সৈনিকদের ইংগিত করল প্রতিবাদী যুবকটি ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের বন্দী করে নিয়ে গিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করতে।

রাজসভা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে উল্লাস। বাজনা বাজতে লাগল।

রাজা ফরিদকে যখন রাজপোষাক পরানো হচ্ছিল হঠাৎ বিপদ-সূচক শিঙ্গাধ্বনি বেজে উঠল।

সীমান্ত-দূত সংবাদ আনল: পারশ্যের যুবরাজ শাহ পারভেজ প্রচুর সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে সীমান্তভূমিতে ছাউনি গেড়েছেন। যে কোনো মুহূর্তে তিনি ইরাকে প্রবেশ করতে পারেন।

বেদৌরা বলল, 'হায় আমার দুর্ভাগ্য . আমার ভাগ্যে বোধহয় সুখ নেই।'

ফরিদ তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অন্যমনস্কভাবে। তারপর ভাবান্তর কাটিয়ে নিয়ে বেদৌরাকে আলিঙ্গন করল। চুম্বন করল তাকে গভীর আবেগে। পরে বলল, 'খালেদকে হুকুম দাও, অর্ধেক সৈন্য-বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে এখনি বেরিয়ে পড়তে। বেদৌরা, তুমিও যুদ্ধের পোষাক পরো— চলো বেরিয়ে পড়ি আমরা পাশাপাশি। শয়তানটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আসি। এবং এটাও ঠিক যে আমি বার্‌বার ভুল করব না। শাহজাহানকে আমি আয়ত্তে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি। সারা হিন্দুস্তানের আমি বাদশা হতে পারতাম। এবার যদি পারভেজকে বন্দী করতে পারি তবে পারশ্য জয় করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না। কারন বাদশা শাহ আব্বাস খুবই বৃদ্ধ এবং অসুস্থ।'

পাশাপাশি দুটো সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেদৌরা আর ফরিদ যুদ্ধের পোষাক পরে সৈন্যবাহিনীর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল।

সীমান্ত এলাকায় আসার আগে খালেদ, বেদৌরা এবং ফরিদ প্রত্যেকে পাঁচ হাজার করে বাহিনী নিয়ে তিন জায়গায় ছাউনি ফেলল। সবাইকে ফরিদ নির্দেশ দিয়ে রাখল মধ্যরাত্রির পর আকস্মিকভাবে শত্রুদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কেউ যেন না ঘুমোয় বা মদ খায়। সর্বদা যেন সতর্ক থাকে।

কয়েকজন গুপ্তচর পাঠাল ফরিদ।

সীমান্ত বরাবর পাহাড়ী বনভূমি এলাকা। পাৎলা পাৎলা গাছ। চাঁদের আলোয় অনেক দূর দেখা যাচ্ছে।

ওপারের তাঁবু থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসছে : ঘোড়ার হ্রেসাধ্বনি, কাওয়ালী গান এবং তার বাজনা, মাতালের প্রলাপ, চিৎকার ইত্যাদি।

গুপ্তচররা একে একে সকলেই ফিরে এলো। সকলেই প্রায় এক খবর জানাল, যুবরাজ পারভেজের বাহিনী এখন আরাম-আয়াসে, নাচে-গানে, সুরাপানে ব্যস্ত। তাদের ধারণা হয়েছে অনায়াসেই তারা ইরাক রাজ্য দখল করে নিতে পারবে আগামীকাল অথবা দু'একদিনের মধ্যে।

ভোররাত্রে পাহাড়ী বনভূমি পার হয়ে গিয়ে সমস্ত সৈন্য নিয়ে সহসা আক্রমণ করল ফরিদ, খালেদ এবং বেদৌরা।

ইরাকী বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে পারশ্যবাহিনীর ছাউনী জ্বলে উঠল, ভেঙে পড়ল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকেই মাতাল হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ নিহত বা আহত হলেও বেশির ভাগ সৈন্য বন্দী হয়ে গেল।

শাহ পারভেজও বেঘোর মাতাল অবস্থায় বন্দী হয়ে ফরিদের সামনে নীত হল।

সে বলতে লাগল, 'কেন বাওয়া তোমরা আমাকে এমন জ্বালাতন করছ? জানো না, আমি কে? এখনি আমি হুকুম করলেই তোমাদের মুণ্ডু উড়ে যাবে। এটা কে? ওঃ! তুমি তো দেখছি ফরিদ, না ফড়িং? আরে বাওয়া, মদ খাও, মদ খাও, কদিন বাঁচবে।'

'পারভেজ, তুমি এখন বন্দী।' বলল ফরিদ।

'বন্দী! শালা, আমাকে বন্দী করবার কে তুমি? কেন তুমি সারা বেগমের শরীরের স্বাদ কি ভুলতে পারছ না? কুত্তিটাকে আমি মারি, চাবকাই। ছেড়ে দাও আমাকে। নইলে ফরিদ তুমি ভায়রা-ভাই হলেও মৃত্যুদণ্ড দেবো তোমার। তুমি না শাহজাহানের দলে ঢুকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলে? তা করো। ভাই তো। যাকগে শালা কান্দাহার। কাবুলীদের রাজ্য নিয়ে কি আমড়াটা হবে? হিং খাব? এই ফরিদ, সেই মরজিনাটা কোথায় হে? দেবে এখন আমাকে?

তোমাকে পারশ্য রাজ্যটা তাহলে দিয়ে দেবো, মাইরি, মাইরি বলছি—আমার বাবা তো যায় যায়—প্রদীপ নিভু নিভু!'

হায়রে! হাসি দমন করল ফরিদ। মাতালটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল সে।

আবার সীমান্ত এলাকায় সৈন্য স্থাপন করা হল। বন্দী সৈন্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যত্ন নেওয়া—আহতদের আরক আর পথ্য দেওয়া হল।

সীমান্ত এলাকায় পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে একদিন অবস্থানে অনেক খরচ—সেসব নিজেদের রাজ্য থেকে এসে পৌঁছেছে কিন্তু বেশি সময় অবস্থান করাও যায় না।

ফরিদ সংবাদ পেল পারশ্যের লোকজন রাজধানী ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে।

সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে যুবরাজ পারভেজ নিহত। পারশ্য-সেনারা সবাই বন্দী এবং প্রচুর নিহত-আহত হয়েছে। ইরাকী সৈন্যরা এগিয়ে আসছে।

ফরিদ আর কাল বিলম্ব করল না। পনেরো হাজার সৈন্য নামিয়ে দিল পারশ্য-এলাকায়।

বিনা বাধায় কেরমানসাহ পর্যন্ত আসার পর ফরিদ একদিন অবস্থান করার নির্দেশ দিল সকলকে। ছাউনি পড়ল শহর জুড়ে।

গাড়ি, ঘোড়া, উট, তাম্বু, অস্ত্রপাতি, লোক-লস্করের যেন এক বিশাল রাজত্ব। সন্ধ্যায় হাজার হাজার মশাল জ্বলে উঠল।

নগরের প্রচুর ধনসম্পদ লুঠতরাজ হয়ে গেছে ইরাকী সৈন্যদের হাতে, খাদ্য এসেছে—বস্ত্র, সোনা-দানা, মশাল, তেল ইত্যাদি। অনেক অস্ত্রও পাওয়া গেল।

খালেদ, বেদৌশা এবং অন্যান্য আরো বিশজন সেনাপ্রধানদের নিয়ে মানচিত্র দেখছিল ফরিদ।

ফরিদ বলল, 'পারশ্যের রাজধানী ইস্পাহান যতদূর, বাগদাদ থেকে বসরাও প্রায় ততদূর। আমার যতদূর ধারণা, খুব বড় যুদ্ধ-বিগ্রহের

সম্মুখীন আমরা হব না। প্রধান সেনাপতি কাল পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে যাবে হামাদান হয়ে উত্তরে তাব্রিজ পর্যন্ত—সেখান থেকে তেহরান হয়ে রাজধানী ইস্পাহানের দিকে ফিরে আসবে। আর রাণী বেদৌরা যাবে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে সিরাজ নগরের দিকে। সেখান থেকে কেরমান, ইয়েজেদ হয়ে রাজধানীতে আমার সঙ্গে মিলিত হবার পর একটি বাহিনী পূর্বের মেসেদে পাঠাব। খেয়াল থাকে যেন রানী বেদৌরা ঠিক পাঁচদিন পরে অর্থাৎ ষষ্ঠদিনে আমার সঙ্গে মিলিত হবে সকালে এবং সেনাপতি খালেদ ঐ একই সময়ে ঝটিকা সফর করে রাজধানীতে এসে মিলিত হবে। যদি কোথাও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, যাতে ক্ষয়-ক্ষতি বেশি না হয়, সময় এবং সামর্থ বাঁচিয়ে রাজধানীর দিকে চলে আসবে। আমি ধীর গতিতে রাজধানীব দিকে এগিয়ে যাব। ঠিক ষষ্ঠদিনে রাজধানীতে পৌছব।'

সেনাপতি বলল, 'হুজুর, ধীরগতিতে আপনার যাবার জন্য একটি চমৎকার শ্বেতহস্তী পাওয়া গেছে। এক উদ্যান-পালক সেটি দান করে তার বাগবাগিচা, ইমারতের ধনসম্পদ বাঁচিয়েছে।'

ফরিদ বলল, 'ঠিক আছে, আমি আরাম করে হাতীতেই যাব। আচ্ছা, যে-যার ছাউনীতে চলে যাও। সতর্ক থাকবে। পররাজ্য এটা, হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যেওনা যেন সুরাপানে মত্ত হয়ে—কিংবা নিদ্রার ঘোরে। পনেরো কুড়িদিন এখন সর্বসুখ, আলস্য, ঘুম পরিত্যাগ করতে হবে।'

সকলেই রাজা এবং বানীকে-কুর্ণিশ করে চলে গেল।

বেদৌরা তখনো বসে আছে দেখে ফরিদ বলল, 'রানী, তুমি বসরার মেয়ে—যেখানে পৃথিবীর সেরা সুন্দরীরা জন্মায়। আর তুমি সেরা এক বণিকের অসামান্য রূপবতী কন্যা হয়েও বেরসিক রাজার পাল্লায় পড়ে পুরুষের পোষাক পরে যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছ। এসো না, আজ দুজনে আমরা এক শিবিরে থাকি!'

বেদৌরা চারদিকে তাকাল একবার। হেঁট হয়ে হঠাৎ ফরিদের মাথাটা চেপে ধরে খুব জোরে তার ঠোঁটের ওপরে ঠোঁট চেপে ধরল।

ফরিদ তাকে অল্পকিছুক্ষণ আদর করল। তাঁবুর চারদিকে সান্ত্রী পাহারা—কার কৌতূহল হবে, উঁকি মেরে দেখে হাসবে। তাই বেদৌরা ফরিদকে আশ্বস্ত করে নিজের চোখের উদ্গত অশ্রুকে রোধ করতে করতে নিজের শিবিরে চলে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্বল হওয়া বা সুখ উপভোগ করা নিষিদ্ধ!

সকালে তিনভাগ হয়ে গেল সৈন্যদল।

সেনাপতি খালেদের দল চলল উত্তরে হামাদানের দিকে। আর বেদৌরা চলে গেল সিরাজের দিকে।

রাজা ফরিদ তাকে বিদায় দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু। আবার দেখা হবে কিনা আল্লা জানেন!

ফরিদ সন্ধ্যা পর্যন্ত ইরাক নামক একটি শহরের কাছাকাছি এসে পৌছল। সংবাদ পেল রাজধানী থেকে প্রচুর সৈন্য এগিয়ে এসেছে ইরাক শহরে। সংবাদ আনল হামদানে যুদ্ধ হয়েছে। তবে পারশ্য-বাহিনী পরাজিত আর ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। তাব্রিজের পথে চলেছে সেনাপতি খালেদ। বেদৌরার এখনো কোনো সংবাদ আসেনি।

শাহ পারভেজের বাহিনীর তাঁবু থেকে শতখানেক আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল—কার্তুজের বাক্স সমেত। ফরিদ সেসবের ব্যবহার জানত। তার নিজের অধীনে কয়েকটি রাখার পর, তুই দলকে দান করে দিয়েছিল।

সহসা ভীম গর্জনে মেদিনী কেঁপে উঠল। বারুদের দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছেন শাহ আব্বাস। তাহলে রাজধানী রক্ষার জন্য ইরাক শহরে কামান পাঠিয়েছেন। ভাবনার বিষয়। ভয়ে সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

ফরিদ বলল, 'ভয় নেই কামানের শব্দ, ফাঁকা আওয়াজ। তোমরা ভীষণ শব্দকারী তুব্‌ড়ি, আতসবাজী ইত্যাদি ছাড়ো।'

বিকট শব্দ আরম্ভ হয়ে গেল। আকাশে আগুনের গোলা ছুটতে লাগল।

ফরিদ বাহিনীকে এগোতে বলল সেই রাত্রেই। মশালের আলোয় সবাই এগিয়ে চলল।

কিছুদূর যাবার পরই যুদ্ধ বেধে গেল। মশাল পুঁতে দেওয়া হয়েছে চারদিকে। মানুষে মানুষে যুদ্ধ হচ্ছে। ঘোড়া আর উটে এসেছে সৈন্যরা। হঠাৎ কামানের গোলায় কিছু তাঁবু আর সৈন্যরা উড়ে গেল ফরিদের। সে হাতী ছেড়ে ঘোড়ায় উঠে পঁচিশজন বন্দুকধারীকে নিয়ে অন্ধকার পথ দিয়ে ঘুরে গিয়ে হঠাৎ কামান চালকদের আক্রমণ করে তাদের সবাইকে নিহত করল। কামানটি দখল করে নিল।

পার্বত্য গুহার কাছাকাছি বহুসৈন্য ঘায়েল হবার পর রাজধানীর দিক থেকে আগত রাজবাহিনীরা আর না এগিয়ে পিছু হটতে লাগল। ফরিদের সৈন্যরা বেরিয়ে এসে যুদ্ধরত সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হল। কামানটি স্তব্ধ। শত্রুদের আগ্নেয়াস্ত্র যারা ব্যবহার করছিল, ঘোড়ায় চড়ে আকস্মিক হাজারখানেক সৈন্য তাদের ঘেরাও করে, অনেকে আহত হলেও বন্দী করে ফেলল শত্রুদের।

ফরিদের হুকুমে সব আলো নিভিয়ে ফেলল তার সৈন্যরা। ছত্রভঙ্গ পারশ্য-সৈন্যরা এখন পিছু হটে যাচ্ছে। ওদের যেতে দাও।

অরণ্য প্রান্তর, পার্বত্য অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে জ্যোৎস্নাতে এগোতে লাগল ফরিদ-বাহিনী। গাড়িঘোড়া, রশদবাহী শকট, বন্দীরা আর কামান নিয়ে পিছনের সৈন্যরাও এগোতে লাগল।

সকাল পর্যন্ত সারা ইরাক শহর দখল করে নিল ফরিদ। অনেক সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্যে থেকে চারজনকে পাওয়া গেল যারা কামানের ব্যবহার জানে। ছোট দুটি কামানের গোলন্দাজ ছিল তারা। তাদের কামানের মুখ এবার ইস্পাহানের দিকে ঘুরে গেল।

বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা যা ক্ষয় হয়েছিল তার চাইতেও বেড়ে গেল।

ইরাক শহরে দুদিন কাটাল ফরিদ।

সৈন্য-বাহিনী সুসজ্জিত করে নিল। অনেকগুলি আগ্নেয়াস্ত্র এখন তার দখলে।

সে উদ্বেগ বোধ করছিল বেদৌরার জন্যে। কোনো সংবাদ আসছে না কেন?

সেনাপতি খালেদ তাব্রিজ জয় করেছে। সে এখন তেহরানের পথে।

চতুর্থ দিনে সে বাহিনীকে নিয়ে সোজা পূবদিকের কশান শহরে গিয়ে পৌঁছল। কোনো বাধাই পেলে না।

দূত সংবাদ আনল, সেনাপতি এখন তেহরানে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে—তবে ওদের ধৃত আর বন্দী সৈন্যে তার বাহিনী এখন আট হাজারের কাছে। তেহরানে মাত্র তিন-চার হাজার সৈন্য লড়ছে শাহ আব্বাসের পক্ষে।

বেদৌরার কাছে থেকে দূত এলো চিঠি নিয়েঃ আমি আহওয়াজ জিতে নিয়ে এখন সাহপুরে। আগ্নেয়াস্ত্রে কিছু সৈন্য মারা গেছে, তবে অগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া সত্ত্বেও ওসব ব্যবহার করতে পারছে না আমার সৈন্যরা। খোদা হাফেজ।'

পঞ্চম দিনে যখন ফরিদ বাহিনী নিয়ে রাজধানীর দিকে সবেমাত্র রওনা হয়েছে সহসা শুনতে পেল হো-হো মার-মার শব্দ। একটি বিপুল বাহিনী আসছে উত্তরের আকাশ ধুলোয় আচ্ছন্ন করে। ফরিদ ঠিক বুঝতে পারল না কাদের এই সৈন্যবাহিনী।

নিজের বাহিনীকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অতি দ্রুত সুসজ্জিত, শ্রেণীবদ্ধ হতে বলল। প্রত্যেক দলে একশোজন করে। অনেক জায়গা নিয়ে ত্বরিত গতিতে ছড়িয়ে যেতে বলল।

হাতীর পিঠে ঠিক মাঝখানে রইল ফরিদ। সহসেনাপতি হাসান কাতার, বাহরাম, রমজান আছে তার চারদিকের বাহিনী পরিচালক হয়ে। তাদের কামান গর্জন করে উঠল। মাঠের ওপরে সৈন্য-বাহিনীকে দেখা গেল। তারা দাঁড়িয়ে গেছে।

ফরিদ পরকলার সাহায্যে দেখল এরা কারা। চারজন সৈনিক আসছে ওদিক থেকে।

তাদের হাতে ইরাকী পতাকা।

সোজা তাদের চলে আসতে দিল রাজা ফরিদের কাছে।

ফরিদ আনন্দে হাত বাড়িয়ে দিল। সেনাপতি খালেদের সৈন্যদল আসছে!

এত তাড়াতাড়ি। শুভ সংবাদ! তেহ্‌রান জয় হয়েছে।

সেনাপতিকে আসতে বলে দিল সে।

চারজন সৈন্যের সঙ্গে এপক্ষের আরো চারজন সৈন্য গেল।

কিছুক্ষণ পরেই খালেদের বাহিনী এসে পৌঁছল। বিরাট বাহিনী। বহুবন্দী সৈন্যসামন্ত, গাড়িঘোড়া, লোক-লস্কর।

সেনাপতি ঘর্মাক্ত কলেবর। সে রাজার কাছে এসে কুর্ণিশ করে নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। ফরিদও নামল হাতী থেকে। দুজনে আলিঙ্গন করল।

আকাশ বিদীর্ণ করে জয়ধ্বনি উঠল: 'জয়—রাজা ফরিদের জয়। নারারে তক্‌বীর—আল্লাহু আকবর!'

রাজা ফরিদ সমগ্র বাহিনীর লোকদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল বীবদর্পে—সঙ্গে তার সেনাপতি খালেদ।

রাজা ফরিদকে দেখে পারশ্য বাহিনীর যারা ইরাকী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল—তারা খুব তারিফ করতে লাগল। হ্যাঁ, রাজা বটে! যেমন চেহারা তেমনি দেখতে! কি সুন্দর চোখ, নাক, ঠোঁট, চুল, রঙ!

ঘণ্টা কয়েক বিশ্রাম। খানাপিনার পর সমস্ত বাহিনীকে রাজধানীর দিকে এগোতে হুকুম দিল ফরিদ।

সকাল পর্যন্ত তারা প্রায় চোদ্দ পনেরো হাজার সৈন্য ইস্পাহান শহরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

কিন্তু রাজধানীর ভেতর থেকে একটা তীরও এসে পৌঁছচ্ছে না কেন?

বেদৌরাও তার বিপুল বাহিনী নিয়ে ঠিক বেলা নটার মধ্যে এসে পড়ল।

বেদৌরার সারা মুখ লাল। ইয়েজের অধিকার করতে খুব নাকি বেগ পেতে হয়েছে। হাজারখানেক সৈন্য ক্ষয় হয়ে গেছে।

যখন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখন বেদৌরা বলল, 'আমি আল্লাকে ডেকেছিলাম। আর জানো রাজা, বিপদের সময়, সেই পীরের আশ্রমের শেখা এসম্ আজমটি আউড়ে ফুঁ দিতেই শত্রু শিবির দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। আমাকে যেসব শত্রু সেনা ঘিরে ফেলেছিল, তারাও আগুনে পুড়ে, জ্বালায় ছটকাতে লাগল। আমাকে, 'রাক্ষসী ডাইনী, যাদুমন্ত্র জানে—' বলে সবাই পালাতে লাগল! এত মানুষ ধ্বংস হয়ে গেল!'

ফরিদ হেসে তার কাঁধে হাত চাপড়াল। বলল, 'যাক, আবার হবে। চেয়ে দেখ আমাদের কত সৈন্য।'

'কত হবে?'

'আন্দাজ করো।'

প্রায় চল্লিশ হাজার হবে গোটা শহর বেড় করে থাকলে।'

'তা হবে।'

'কখন আক্রমণ করব আমরা?'

'আমরা আক্রমণ করব না। আস্তে আস্তে এগোব। ফাঁস যেমন করে ছোট হয়ে আসে। তুমি আর আমার পাশ থেকে যাবে না। আবার যদি সিংহাসনে বসতে হয়, ভয় করছে!'

হাসল বেদৌরা। বললে, 'তবে সেনাপতিকে অথবা শাহ্ পারভেজকে রাজ্যটা দিয়ে চলো আমরা আরবের সেই পীরের মাজারে চলে যাই!'

সংবাদ এলো শাহ আব্বাস হঠাৎ মারা গেছেন। রাজধানী ঘেরাও হবার সংবাদে তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কাঁপতে কাঁপতে বুকখানা চেপে ধরে বসে পড়েন। তাঁর জ্ঞান হারিয়ে যায়। তারপর তাঁর প্রাণবায়ু দেহ ছেড়ে চলে গেছে।

রাজধানীর রক্ষীবাহিনী কারো কোনো হুকুম না পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে

ফরিদের বাহিনী বিনা বাধায় রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করল। কেউ বাধা দিল না। বাহিনী লুটতরাজ না করে কদমে কদমে প্রাসাদাভিমুখে এগিয়ে চলল নীরবে।

প্রাসাদের ফটক খোলা দেখে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে সেনাপতি খালেদ ঢুকে গেল। প্রহরীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

ক্রমে তারা রাজার মৃত লাসের কাছে এসে পৌঁছল। সংবাদ সত্য, শাহ আব্বাস মৃত!

সেনাপতি ফিরে এসে জানাতে রাজা ফরিদ প্রাসাদের অভ্যন্তরে খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে প্রবেশ করে এগিয়ে চলল।

শাহ আব্বাসকে শায়িত দেখে হেঁট হয়ে তাঁর হাতে চুমু খেল।

হঠাৎ শিরিন ছুটে এসে পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে এলো সারা! তার মাথায় হাত দিল ফরিদ। বলল, 'কোনো ভয় নেই। শাহ পারভেজ বন্দী—মৃত নয়। ইরাক রাজ্য আক্রমণ করতে গেল কেন সে?'

ফরিদ তার বাহিনীর প্রধানদের ডেকে পাঠাল দরবারে। সিংহাসনে বসল সে। তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিল সেনাপতি।

ফরিদ বলল, 'এখন পারশ্য-ইরাকের সম্রাট একজনই, রাজা ফরিদ। আমি প্রথমে ঘোষণা করছি বাদশা শাহ আব্বাসের রাজকীয় মর্যাদায় দাফন-কার্য সমাধা করা হোক।'

॥ চুয়াল্লিশ ॥

পরদিনই অভিষেক কর্ম সমাধা করা উচিত হবে না বিবেচনা করল ফরিদ। অর্ধেক সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ নগরে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিল।

খালেদ সর্বাধিনায়ক সেনাপতি হল দুটি দেশেরই। সে পারস্য বাহিনীর মধ্যে থেকে মারুফ হাসানকে সহ-সেনাপতি ঠিক করে নিয়ে নতুন ভাবে সব কিছু সাজিয়ে দিল। সমস্ত শহরে নগরে নতুন রাজা ফরিদের নামে শপথ নেবার পরোয়ানা গেল।

সারাটা দিন লাগল ফরিদের শাসন-ব্যবস্থার হাল ধরতে।

সুসজ্জিত রাজপ্রসাদের চারদিকে ইরাকের রক্ষীবাহিনী। আলোক-মালায় রাজমুকুটের মতো ঝলমল করছে গোটা রাজপ্রাসাদটি।

ফরিদ ভাবছিল বেদৌরার সঙ্গে আজ তার মিলন-রাত। সিংহ দ্বারে শানাই বাজছে। আনন্দে তুবড়ি-বাজি ফাটাচ্ছে লোকজন, নাচগান হচ্ছে।

বেদৌরাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিল শিরিন আর সারা।

ফরিদ যখন পুষ্পোদ্যানের প্রমোদভবনের মধ্যে ধবধবে সাদা পোষাক পরে প্রবেশ করল আলোকসজ্জা আর ফুলের সম্ভার দেখে মোহিত হল।

বেদৌরা এগিয়ে এসে তাকে কুর্নিশ করল। তার সুন্দর রক্তিম ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। কাজল টানা অপূর্ব চোখ দুটিতে প্রেমবিহ্বলতা। বলল, 'এসো আমার রাজা!'

বেদৌরার হাত ধরে এসে পালঙ্কের ওপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসল ফরিদ। একটি রক্তগোলাপের মালা গলায় পরিয়ে দিল বেদৌরা ফরিদের। শিরিন এসে হাসিভরা মুখে গোলাপজল সিঞ্চন করে গেল।

মালাটি খুলে বেদৌরার গলায় পরিয়ে দিয়ে নিজের কোলের কাছে তাকে আদর করে টেনে নিয়ে বলল, 'রানী, আমার বেদৌরা, কি অপ-

রূপ সুন্দরীই না তোমাকে দেখাচ্ছে আজ। কি মোহনীয় তোমার রূপ, যৌবন! এই উন্নত নাসিকা, দুটি মধুর কোমল দৃষ্টিভরা চোখ, নরম পুষ্পপেলব ঠোঁট! ফরিদ চুম্বন করল বেদৌরাকে।

বেদৌরা আনন্দবিহ্বল লতার মতো জড়িয়ে ধরল ফরিদকে বাহু-বেষ্টন করে। বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'রাজা, আমার রাজা! তুমি কত সুন্দর!'

হঠাৎ সারা একটি ফুলের মালা আর একটি জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই বিরক্ত হয়ে বেদৌরা একটু সরে বসল।

ধীরে ধীরে সারা কাছে এলো। নীরব চাহুনি তার। অবনত মস্তক।

ফরিদ বুঝল ও কিছু বলতে চায়। মালাটি গ্রহণ করে আলোটি নিভিয়ে দেবে? সারা আগে যে বলেছিল সে মা হতে চলেছে সে চেহারা তো তার আজ নয়। তাহলে? তাহলে কি মিথ্যা কথা বলেছিল? পারভেজের মধ্যে সে কী এমন পেল!

ফরিদ বলল, 'সারা, তোমার কথা শোনার আছে। মালাটি আমি নিলাম, বেদৌরার গলায় পরিয়ে দিলাম। সেই যোগ্য বিবেচনা করবে তোমার সম্বন্ধে, যাও তুমি। আমার পাশের কামরায় থাকো আর আনন্দের বাজনা বাজাও। তোমাকে দেখলে নীলোফারের কথা মনে পড়ে যায়!'

তবুও সারা দাঁড়িয়ে আছে আর অঝর ধারায় তার কোমল রক্তাভ গণ্ড বেয়ে অশ্রু নামছে দেখে বেদৌরা পালঙ্ক থেকে নেমে এলো। সারার হাত ধরে পাশের কামরায় এনে বলল, 'বোন, দুঃখ করো না। পারভেজকে যখন আমি ভাই বলেছি নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করে শুধু প্রাণ ভিক্ষা কেন উচিত মতো সম্মানের মধ্যেই রাখব।'

সারা বলল, 'হায় আমার দুর্ভাগ্য! তাকে আপনি ক্ষমা করবেন না। সে দুরাচার। লম্পট। আমাকে অযথা শাস্তি দিত। জানেন সে একদিন মাতাল হয়ে আমার গর্ভের প্রথম সন্তানকে নষ্ট করে দিল।

বলত, তোমার গর্ভে যে সন্তান আছে তা ফরিদের। কিন্তু কথাটা সত্য!'

'সত্য!' বেদৌরা আশ্চর্য হয়ে শুধোল।

'হ্যাঁ আপাজান।'

'এক্ষেত্রে পারভেজের দোষ কি? যদি তোমায় গলা টিপে শেষ করে দিত? রাজার ছেলের খেয়াল—তবু প্রাণে রক্ষা পেয়েছ—হয়তো তোমার রূপ তাকে মুগ্ধ করে রাখে।'

'না আপাজান, আমার বাজনা।'

'আচ্ছা, আমি বিবেচনা করে দেখছি।' ফিরে যাচ্ছিল বেদৌরা ফরিদের কাছে। হঠাৎ আবার ফিরে এলো। সারার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মিষ্টি মধুর গলায় শুধোল, 'এই সারা, তুমি আমার সতীন হবে?'

সারা চোখভরা জল নিয়ে বেদৌরার পায়ের কাছে বসে পড়ল। বল্ল, 'না আপাজান, আপনার পথের কাঁটা হতে চাই না।'

'তাহলে তুমি ইরাকের রানী হও। পারভেজকে সেখানের শাসন-ভার দেওয়া হবে—অন্তত আমি তাই অনুরোধ করব রাজার কাছে।'

সারা বলল; 'আপনার যেমন খুশী'।

বেদৌরা ফিরে এলো ফরিদের কাছে। সারার সমস্ত কথা জানাল। বলল, 'তাহলে সারার গর্ভে যে সন্তান ছিল তা তোমার ঔরসজাত?'

'সারার সঙ্গে আমার দৈহিক মিলন হয়েছিল মাত্র একবারই—তাতে যদি ও তাই দাবি করে আমার কিছু বলার নেই। পারভেজ কি আর সারাকে ভালবাসবে? পারভেজ কিন্তু বাইরের ব্যবহারে ভাল। ভেতরে সে নষ্ট মানুষ। কিছুটা খামখেয়ালী আর অস্থিরমতি।'

'সে তুমিও কম নও রাজা। যাকগে সেসব, বলো তোমার সারার প্রতি কোনো মোহ আছে কিনা?'

'থাকলে কি করবে?'

'সতীন বানাব।'

'যতটা সহজে তা বলছ তা কি এতই সহজ রানী? এই বুকের

ভেতরের সংবাদ যে আমি পড়তে পারি গো! তোমার এই রূপ আর তপস্যার তেজে না ভুললে কি আরবের কোন মরুদ্যান থেকে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে তোমাকে তুলে আনি বসরায়? বণিক হেদায়ত-উল্লার কন্যা যুদ্ধ করল ঘোড়ায় চড়ে আমার সঙ্গে থেকে, ইরাকের রাণী হল, এখন আবার যুদ্ধ করে পারস্য জিতে মহারাণী হয়েছে। তাকে কি অবজ্ঞা করতে পারি? রাণী তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছ? পৃথিবীর যত সুন্দরী নারীকেই নিয়ে এসো। আজ ফরিদের কাছে, তোমার কাছে সবাই এখন তারা তৃণবৎ। আমি তোমাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি আর…'

'আর কি রাজা?'

'তোমাকে আমি ভয় করি।'

'ভয় করো, কেন রাজা?'

'তুমি যে সাধিকা। মুখ থেকে অগ্নি উৎপাদন করতে পারো।'

'রাজা, ভয় পেয়ো না। সেটা আর আগামীকাল থেকে বোধ-হয় থাকবে না। কপালে ছিল অভিশাপের এই রাজ্যভোগ, আর কত লোক আমার অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করল! যদি তুমি দিল্লীতে না যেতে, যদি না বন্দী হতে, যদি না বাদশা শাহজাহানের সঙ্গে মৈত্রী হত কান্দাহার বিজয়ের সময়, তাহলে কি পারভেজ ইরাক আক্রমণ করত, না যুদ্ধ করে পারস্যদেশ জয় করার ঘটনা ঘটত?'

'কেন ঘটত না রানী?'

'ঘটত না এইজন্য যে রানী বেদৌরার শরীরে যে আগুন আছে —না, থাক বলব না গোপন কথা।'

'বলো, সোনার পাখি সেই গোপন কথা।'

বেদৌরা নখ খুঁটতে লাগল। তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। তার চোখ থেকে জল গড়াল। ফরিদ বুঝতে পারল না এ কান্না বেদৌরার আনন্দের, না দুঃখের।

ফরিদ উঠল। একটু হেঁটে বেড়াল। রক্ষীদের হুকুম করল তাদের বাসরকক্ষের সব ক'টি দুয়ার-জানালা বন্ধ করে দিতে। ভেতরে গোটা

ঘরের মধ্যে একটি মোটা কালো রঙের পর্দা পড়ে গেল। ছাদ থেকে পাৎলা রেশমের জালের মশারী নেমে এলো।

সারা বাজনা বাজাচ্ছে জলোচ্ছ্বাসের মতো গুরুগর্জন ছন্দে।

বেদৌরা শয্যার মধ্যে আসার পর তার বহুমূল্য হীরা, মুক্তা, নীলা, পান্না, সূর্যকান্তমণি, সোনার জড়োয়া গহনাগুলি খুলে ফেলতে লাগল।

ফরিদ তাকিয়া ঠেস দিয়ে তাকে দেখতে লাগল। কেবলই তার মনে পড়তে লাগল প্রথম রাতে সেই মরুদ্যানে পীরের মাজারে যে বিবর্ণ পোষাকের মাঝ থেকে মুক্ত করা দেহটি দেখিয়েছিল বেদৌরা তার কথা!

বলল, 'আজ তোমার লজ্জা করবে না?'

'তুমি বোধহয় সেই পীরের দবগার কথা ভাবছ?'

'হ্যাঁ। দেখেছি তোমাকে—সেটা স্মৃতি এখন—স্মৃতিই বেঁচে থাকে। আজ যা করছ কাল তা স্মৃতি। তাই যা কবো, ভাল কাজ করো। রানী, তুমি নিজেকে সরিয়ে রাখতে যৌনতা সম্বন্ধে কেনন। মাজারের পবিত্রতার ব্যাপার ছিল। এখন তুমি কি হারাবে? কেন সব ঘটনা ঘটত না, না বললে আবার আমি সরে পড়ব শিরিন বা সারাকে নিয়ে। আবার তুমি পারশ্যদেশেব রানী হয়ে বাজ্য চালাবে। আবার...'

মুখটা চেপে ধরল বেদৌরা। বলল, 'বলো না, তাহলে 'এসম্-আজম' পড়ে এবার নিজেই নিজেব শবীরে ফুঁ দেবো—আর আমি পুড়ে মারা যাব।'

'না না, তা কক্ষণো করো না।'

'তবে এসো! আমি এখন নিবেদিতা!'

ফরিদ দেখল ফেনপুঞ্জের স্তূপের মতো আশ্চর্য সুন্দর নগ্নতা! সে মুগ্ধ হল।

বেদৌরা এই প্রথম তাব নারী জীবনের যৌবন-সুখের শিহরণ-সমুদ্রে ডুবে গেল।

ফরিদ তাকে চুম্বন করতে করতে বলল, 'তুমি আরো সুন্দর, নীলো ফারের চাইতে অনেক ভাল!'

'দুষ্টু! আজ দুটো ব্যাপার তোমাকে বলি। আমার বুকের ওপরে শুয়ে থেকে তুমি শান্ত ভাবে তা শোনো রাজা। আমাকে আর ভয় পাবার কিছু নেই। দৈহিক মিলন হবার পর আমার অগ্নি উৎপাদন করবার শক্তি চলে গেল, সাপের মাথার মানিক ঝরে পড়ে গেল!'

বেদৌরা কাঁদতে লাগল।

ফরিদ তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, বলল, 'তাতে কি, আমি তো আছি। আল্লা আমাদের রক্ষা করবেন।'

'আমরা আগামী বছর দুজনে হজে যাব।'

'হ্যাঁ, দুটো কথার একটা তো জানলাম—দ্বিতীয়টি?'

'দ্বিতীয়টি জানলে তো সবই হয়ে গেল।'

'কি তা রাণী?'

'আমিই তোমার সেই নীলোফার।'

'তুমিই নীলোফার!'

'হ্যাঁ। তুমি আমাকে নীলনদে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর দেখেছিলে কি পীরচেঙ্গি আমাকে আসমানের ওপর দিয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো ওটা স্বপ্নভোর কিন্তু, তুমি যে পীরের মাজারে আবাল্য মানুষ হয়েছিলে, হেদায়তউল্লাহ, বণিকের কন্যা!'

'পীরের মাজার এখন আর খুঁজে পাবে না, সবই পীরচেঙ্গির মায়া! মাজারও ছিল মায়াব, তুমি আমি অভিন্ন। বারে বারে বহু রূপ ধরে আসি, অথবা আমি বেদৌরাই, নীলোফার নয়।'

'পাগলি!' ফরিদ উঠে পড়ল, গোসলখানা থেকে ফিরে এসে দেখল বেদৌরা তেমনি পড়ে আছে। সে হাত বাড়িয়ে আহ্বান করল।

বলল, 'রাগ করো না. দ্বিতীয় কথাটা ঠিক নয়। আমি নীলোফার নই, তবে তুমি তাকে ভুলতে পারছ না বলে তার হয়ে আমি তোমার সুখের মধ্যে স্মৃতি হতে চাইছি।'

'তার দরকার নেই। তুমি অনন্যা, অসাধারণ তোমার লাবণ্য, কমনীয়তা, রূপ-মাধুরী আমার দেহমনকে তৃপ্ত-শান্ত করতে পারবে।'

ফরিদ আর বেদৌরা এরপর রাজ্যশাসন ব্যাপারে কথা বলতে বলতে এক সময় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ল।

ওরা যখন ঘুমে আচ্ছন্ন সারা বাজনা থামিয়ে খুব সন্তর্পণে দুয়ারের কালো পর্দাটার মধ্যে লুকিয়ে থেকে দেখতে লাগল কিছুক্ষণ। হাতে তার খোলা তলোয়ার!

সে ধীরে ধীরে কাছে এলো।

মশারী সরিয়ে তলোয়ার তুলল।

কিন্তু এমন সুন্দর দৃশ্য! দুজনেই প্রায় নগ্ন। কত আরামেই না ঘুমোচ্ছে।

ফরিদকে কেটে ফেললেই কি পারভেজ রাজা হতে পারবে? না সহসেনাপতি মারুফ হাসান সিংহাসনে বসবে শিরিনকে বিয়ে করে? শিরিনের সঙ্গে তার যোগ হয়েছে।

সারা পারল না ফরিদের মুখখানার দিকে তাকিয়ে তাকে খুন করতে। ঐ মুখে ও তাকে কতো চুমো খেয়েছিল। তার বোন নীলোফারকেও চুমো খেত। কিন্তু ঐ বেদৌরাকে না সরাতে পারলে...দুজনে এমন জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে! বেদৌরার হাতটা ধরে টেনে সরিয়ে দিতে যেতেই সে জেগে গেল।

হঠাৎ সে সারার হাতে উদ্যত তলোয়ার দেখে লাফ দিয়ে সরে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে সারাকে ফেলে দিল যখন সারার হাতের তলোয়ারের আঘাত পালঙ্কের খাটের ওপরে আটকে গেছে।

বেদৌরা সহজেই কাবু করে ফেলল সারাকে।

তার হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে এককোপে মুণ্ডুটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকল জোরে চিৎকার করে, 'ফরিদ'— বলে।

ফরিদ জেগে গিয়ে দেখল সারার মুণ্ডু আর ধড় দু'জায়গায় পড়ে আছে। রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে।

বেদৌরা বলল, 'হায়! আমাদের নিয়তি! বেঁচে গেছি আমরা!'

'কি ব্যাপার!'

'খোলা তলোয়ার উদ্যত করেছিল সারা, হঠাৎ আমার হাতটায় টান পড়তে জেগে গেলাম। লাফ দিয়ে আঘাত বাঁচিয়েছি।'

'হায় সারা। নীলোফারের—তার স্মৃতিটারও এবার তাহলে মৃত্যু হল তোমার হাতে? কেন সারা আমাদের মারতে এলো? কি ভাবে এলো? রক্ষীদের তলব করো।'

'রক্ষীরা অনেকে নতুন। ওদেরই প্রাসাদ—কোথায় কি আছে, গোপন পথ সবই সারা জানত। হায় ক্ষুদ্রমনা মেয়েমানুষ!'

'কি চেয়েছিল ও?'

'হয়তো তোমার রাণী হয়ে অথবা দুজনকেই মেরে আবার পারভেজকে এনে রাণী হবে ভেবেছিল।'

'পারভেজকে ও ভালোবাসত না। অসুখী অবস্থায় ওর মন অসুস্থ ছিল।'

ফরিদ উঠে এসে সারার মুখখানা দেখল। দুয়ার খুলে দিল। ঘর পরিষ্কার করে ফেলতে বলল।

ফরিদ বলল, 'একটা সমস্যার সমাধান হল, পারভেজের জন্য আর দয়ার প্রশ্ন আসে না, সে চিরকাল বন্দী থাকবে। হায় নিষ্ঠুর করুণ পৃথিবী! প্রেম-ভালবাসার কোনো দাম নেই। যে সারার মুখে আমি ভালবাসার চুম্বন এঁকে দিয়েছিলাম আজ সে আমার শত্রু হয়ে গোপনে আমাকে হত্যা করতে এসেছিল! হয়তো আমাকে নয়, আমার বেদৌরাকে। আর আমিই তো আসল শত্রু যে তার স্বামীর রাজ্য-পাট কেড়ে নিয়ে তাকে বন্দী করে রেখেছি। হায় আমার প্রিয়তমা শ্যালিকা, ফরিদ ভাবতে লাগল: যদি আমি তোমাকে তোমার বিয়ের আগে নিয়ে চলে যেতাম অন্য কোথাও? গেলাম না কেন? তাহলে শ্বশুর মশায় ক্ষুব্ধ হতেন, আর তখন তাঁর একমাত্র কন্যা ঐ সারা। শ্বশুর মশায় যশস্বী কবি হলেও হয়তো ফরিদের চাইতে যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন শাহাজাদা পারভেজকে,

পারভেজের সঙ্গে সারার বিয়ে দেবার জন্য আরবের বাদশা স্বয়ং নাকি মত দিয়েছিলেন, নইলে পারভেজ আরব আক্রমণ করতে পারে।

সারাকে নিয়ে পালালে পারভেজের সৈন্যবাহিনীর চোখ এড়িয়ে দীন-দুঃখীর মতো কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতাম আজ। আর সারার ওপরে যে পারভেজ বিরক্ত ছিল সেকথা সারা জানালেও কতখানি তা সত্য আজ তাও ভেবে দেখবার বিষয়। একজনের সঙ্গে প্রেম করে, তাকে পবিত্র দেহদান করে আবার একজনের গলায় ঝুলে পড়লে! নারী, তুমি ছলনাময়ী!

কিন্তু বেদৌরা তা নয়, সে সাধিকা, শিশুকাল থেকে যৌবন অবধি সাধনায় কাটিয়েছে। সে অগ্নিসম্ভবা হয়েছে। আজ সে মণিহারা ফণীর মতো কেঁদেছে যৌনতা দানের পর—অগ্নি উৎপাদন করে শত্রু নাশ করার অলৌকিক শক্তি থেকে বঞ্চিত হতে। সেটা কি সত্যি? পরীক্ষা করে দেখতে বলতে হবে।

সারার কবর হল।

পারভেজের কাছে তার বাপের এবং সারার মৃত্যু, ফরিদের পারশ্য-দেশ অধিকারের খবর পাঠানো হল।

পরদিন অভিষেক-কর্ম শুরু হল সকাল থেকেই। রাজ-সিংহাসনে বসে আছে মুকুটধারী রাজদণ্ড হাতে রাজা ফরিদ আর তার পাশে রানী বেদৌরা। দরবারের চারপাশে সান্ত্রী, প্রহরী আর সেনাপতি সহ-সেনাপতিরা। প্রথম সারিতে কয়েকজন পীর, উলামা, গওস, মওলানা, মৌলবী বসে আছেন। তাঁরা পবিত্র কোরআন পাঠ করছেন। সারি দিয়ে মানুষ আসছে নতুন রাজাকে দেখতে, উপঢৌকন, ফুলের মালা দিতে, ইরাকের অভিষেকের মতো রাজা ফরিদ আজ জনে জনে মিলছে না, বসে আছে বিস্ফারিত চোখ মেলে দরবারের মানুষের দিকে তাকিয়ে। যার যা দেবার দিয়ে কুর্নিশ করতে করতে সকলে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। একটানা দুপুর পর্যন্ত এই অভিষেকের কাজ চলল। প্রধান প্রধান নাগরিকদের সঙ্গে আলিঙ্গন করল রাজা ফরিদ। বিকেলে আবার অভিষেক পর্ব। দূর দূর অঞ্চল থেকে আসছে

মানুষরা। চাষীদের বউ-ছেলেমেয়েরা এসেছে। জনস্রোত ফুরোয় না। রাত এগারোটার পর আবার খানাপিনার আসর বসল। নাচ গান হচ্ছে—বাজনা বাজছে। আলোর মেলায় ভাসছে গোটা রাজধানীর সমস্ত প্রাসাদ। সারারাত অভিষেককর্ম চলল।

যখন শেষ হল তখন রাত পার হয়ে ভোরের সূর্য উঠছে পূব-আকাশে। হঠাৎ সন্দেহ হল ফরিদের। বেদৌরাকে বলল, 'এত সময় লাগবে কেন? আমাদের অসুস্থ করে ফেলে হঠাৎ বন্দী বা নিহত করার মতলব নেই তো কারো?'

বেদৌরা হাসল। বলল, 'রাজা, এরা তোমাকে চেয়েছে, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ করছে! বৃদ্ধ রাজা ভয়ানক দাম্ভিক আর অত্যাচারী ছিলেন; রাজকুমারও খামখেয়ালী। সে নাকি চাষীবাড়ির এক বৌকে নিয়ে আসার সময় বেদম মার খেয়েছিল। পরে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গিয়ে চাষীদের গ্রামটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। বাদশা শাহ আব্বাস ছেলের এই দৌরাত্ম্যের কথা শুনেও তার বিচার করেন নি। রাজা, তোমার এখানে কে শত্রু হতে পারে, কাকে তুমি সন্দেহ করো?'

ফরিদ বলল, 'জানি না। উঃ! বড় ক্লান্তি রানী! আমার ঘুমে আর অবসাদে সমস্ত শরীর অবসন্ন।'

সহসা রানী বেদৌরা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'এইবার আপনারা অভিষেক-কর্ম সমাধা করুন। আর রাজার অনুমতি নিয়েই আমি রানী বেদৌরা ঘোষণা করছি আপনারা আর একটি আনন্দ সংবাদ পাচ্ছেন: সহসেনাপতি মারুফ হাসানের সঙ্গে পরলোকগত পারশ্যসম্রাট শাহ আব্বাসের কন্যা রাজকুমারী শিরিন বানুর আজ অপরাহ্ণে সাদী মোবারক সমাধা হবে।'

'জয় সম্রাট ফরিদের জয়।'

'জয় সম্রাজ্ঞী বেদৌরার জয়।'

হাজার হাজার মানুষের জয়ধ্বনির মধ্যে রাজারানী সবাইকে হাত তুলে সালাম জানানোর পর অন্তঃপুরে চলে এলো।

পোষাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলার পর ফরিদ বেদৌরাকে আলিঙ্গন

করে বললে, 'মারুফের সাদীর ব্যাপারটা হঠাৎ তোমার মাথায় এলো কেন গো ?'

'ওদের প্রণয়সংবাদ আমার কানে এসেছে যে! আর শত্রুতা যদি কেউ করে ঐ মারুফ হাসানই তা করতে পারে। সাদীর পর ওদের ইরাকে পাঠিয়ে দাও। এখানে থাক সেনাপতি খালেদ। একজনের হাতে সর্বাবিনায়কের ক্ষমতা দান করা যুক্তিযুক্ত হবে না।'

ফরিদ বলল, 'ঠিক। কিন্তু...'

ফরিদ ভাবতে লাগল। পায়চারি করল কিছুক্ষণ। বলল, 'হুম্! আচ্ছা, শিরিনকে পাবার পর যদি মাথায় আসে তার শ্বশুরের রাজ্য উদ্ধার করবে? মারুফ তো সাদাসিধে বিশ্বাসী ছোকরা। তার মধ্যে কি লোভ আছে ? পরীক্ষা করে দেখবে একটু ?'

'আমি ? কেমন করে ?'

'নারীরা কতই ছল জানে !'

বলে ইংগিতপূর্ণ হাসি হাসল ফরিদ।

বেদৌরা বলল, 'দুষ্টু! আচ্ছা. দেখছি আমি, তুমি মজা দেখবে, কিন্তু আমাকে যেন দোষ দিও না, এই পোষাকেই ডাকব ?'

'এতটা খোলাখুলি পোষাকে ? আচ্ছা, ছাখ তো !'

হঠাৎ মারুফ হাসানোর ডাক পড়ল রানী বেদৌরার ঘরে।

মারুফ হাসান অত্যন্ত খুশী হয়ে তিন লাফ দিয়ে ছুটে এলো। রানীর কক্ষে ঢুকেই সে কুর্ণিশ করার পর আর মাথা তুলল না। বলল, 'বন্দেগী সম্রাজ্ঞী সাহেবা, হুকুম করুন, বান্দা তৈরি আছে।'

'এদিকে এসো, আমার দিকে তাকাও।'

মারুফ হাসান মাথা তুলল একবার, তারপর আবার মাথা নত করল।

বেদৌরা বলল, 'শিরিনকে পাওয়ার সংবাদে তুমি পুলকিত। তার চাইতে বড় আশা করতে পার না ? আমি যদি তোমাকে চাই ? এই রাজ্যপাট সবই পাবে, সিংহাসনে তুমিই বসবে, তোমার হাতে সমস্ত ক্ষমতা—রাজা ফরিদ এখন ক্লান্ত, অবসন্ন, এসো আমার আদেশ

পালন করো সহস্রসেনাপতি। তোমার ভাগ্যকে তুমি কুড়িয়ে নাও।'

বেদৌরা নেমে এসে মারুফের হাত ধরতেই মারুফ হঠাৎ হাত টেনে নিল। বলল, 'ছিঃ! এই আপনি সাধিকা ছিলেন? আপনি না আমার মায়ের মতো। আপনি রানী—মহারানী—সারা দেশের জননী। আর শুনে রাখুন, রাজা ফরিদের একটি লোম স্পর্শ করবে যে শত্রু ভাবে, আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকব এই পৃথিবীতে, তাকে খতম না করে ছাড়ব না। এখন তরবারীর আঘাতে আপনাকে দু'টুকরো করাই আমার উচিত কিন্তু...'

তরবারী তুলেছিল মারুফ হাসান, সহসা ফরিদ বের হয়ে এলো অন্তরাল থেকে। বলল, 'কিন্তু কি মারুফ হাসান?'

'রাজা আপনি একি পরীক্ষা জুড়েছেন এই বোকা নকরটাকে নিয়ে?'

'নকরটাই তো আমার ভাই, বন্ধু, দোসর। যাও তোমার পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ। শিরিনকে নিয়ে সুখে গা ভাসাও গিয়ে।'

মারুফ হাসতে হাসতে লজ্জায় মাথা নিচু করে চলে গেল যখন দেখল রানী বেদৌরাও হাসছে খুব—মুখ নিচু করে।

ফরিদ মারুফ হাসানকে বলল, 'শিরিন খুব সুন্দরী মেয়ে, বেদৌরা নিতান্ত স্নেহ করে বলেই তোমাকে তা দান করে ফেলেছে! তোমার হাতে অনেক ক্ষমতা, তাই হঠাৎ এই অভিষেকের দীর্ঘ সূত্রতার ক্লান্তিতে সন্দেহ এলো, যদি কিছু অমঙ্গলের বীজ এর মধ্যে নিহিত থাকে? কে সেই শত্রু হতে পারে? বেদৌরা তোমাকে সন্দেহ করল। তাই তোমাকে এই মুহূর্তে হঠাৎ ডেকে নিয়ে তোমার লোভ আর লালসাকে পরীক্ষা করে দেখল। ওর অপরাধ নেই, যাও ভাই, তুমি কিছু মনে করো না। শিরিনের সঙ্গে বিয়ের জন্যে তৈরি হও। আর হ্যাঁ শোনো, ইরাকের রাজা হবে তুমি?'

'আবার সেই পরীক্ষা জাঁহাপনা? আমি চিরকাল আপনার দাসানুদাস অথবা অনুজ ভাইয়ের মতো থাকতে চাই।'

'তাই হবে।'

মারুফ ওদের কুর্নিশ করে চলে গেল। ফরিদ বেদৌরাকে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সকালের রোদ-ঝলমল-করা দেবদারু, চেরী আর ঝাউবীথির দিকে তাকিয়ে।

বক্ষলগ্ন হয়ে কিছুক্ষণ থাকার পর বেদৌরা দু-হাতে ফরিদের মুখখানা দেখতে লাগল; ভুরুর ওপর দিয়ে তুলির মতো করে আঙুল টানল, ঠোঁটের নক্সা দেখল; নীলাভ পিঙ্গল চোখ দুটির গভীর দৃষ্টির অতলে ডুবে যেন ডুবুরীর মতো মুক্তা তুলতে চাইল; ললিত গলায় কচি আদুরে মেয়ের মতো বলল, 'রাজা তোমার এই চোখ—এই চোখ আমাকে যাদু করেছে।'

ফরিদ মিষ্টি হেসে বেদৌরাকে চুম্বন করল। বলল, 'আমাদের মোগল রাজ-পরিবারে অনেকেই সুন্দর দেখতে; আমার পিতা বাদশা জাহাঙ্গীরও অপূর্ব সুন্দর চেহারার মানুষ ছিলেন। সম্রাজ্ঞী নুরজাঁহার রূপের খ্যাতি জগৎ জোড়া। তাঁর কোমল রক্তিম অধর, সুন্দর নাসিকা, আর গঠনভঙ্গি দেখলে মুগ্ধ বিমোহিত হয়ে যেতে হত। আমার মতোই বাদশা শাহজাহানের চোখ, মুখ, চেহারা অনেকটা, তবে তার চাইতেও আমি বেশি ফর্সা, বেশি মজবুত। আর চোখের কথা বলছ? শাহরিয়ারের কি অপূর্ব চোখ ছিল গো! খুরম যে পৃথিবীর কোন্ মূল্যের বিনিময়ে, কোন নিষ্ঠুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই মায়াময় সোনার হরিণের চোখ দুটি উপড়ে নিয়ে ফেলে দিল আমি তা ভাবতে গেলে ভয়ে কাঁপতে থাকি! আমার কান্না পায়।'

ফরিদের কণ্ঠস্বর বেদনায় গাঢ় হয়ে এলো। বলল, 'যখন দিল্লীতে গিয়ে আমি শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করি সে যেন হঠাৎ চমকে যায়। তার আয়ত চোখ মেলে স্থির অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। আমি আমার হীরকখণ্ড কোহিনূরটা তার হাতে তুলে দিতে সে তা অবাক হয়ে দেখতে লাগল। খুশী হয়ে বলল, শুনেছি, তুমি ইরাকের রাজা হয়েছ। বলো, তোমার জন্যে কি করতে পারি? কি চাও তুমি? আমি বললাম, আমি

তোমার কাছে কিছু চাই না খুরম ভাই। এসেছি শুধু আমার স্নেহময়ী আম্মাজানকে নিয়ে যেতে! তুমি অনুমতি দাও। খুরম বলল, তোমার আম্মাজান তো ইন্তেকাল করেছেন ভাই। তাঁকে রাজপরিবারের কবরস্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় কবর দেওয়া হয়েছে।'

'স্থির হয়ে বসে রইলাম। আমার দু'চোখ বেয়ে এমনি সেদিন অশ্রুধারা নেমেছিল। মা, আমার চিরদুঃখী মা! আমি কবর জিয়ারত করতে গেলাম। ফেরার পর খুরমের সঙ্গে শেষ দেখা করে যখন ঘোড়ায় চড়ে ফিরছিলাম হঠাৎ কয়েকজন সেনানী আমাকে ঘেরাও করল। আমি তখন মাতৃশোকে বিহ্বল ছিলাম। হতচকিত হয়ে গেলাম। শাহজাহান কার বিনিময়ে কি করছে! পাঁচ লাখ টাকার হীরকখণ্ড ভেট দিয়ে শূন্যহাতে যখন নিজের পিতার ঔরসজাত ভাই ফিরে যাচ্ছে, উচিত ছিল না কি তাকে আদর করা, সান্ত্বনা দেওয়া আর সসম্মানে সৈন্য পাহারায় বিদায় করা। আমি বুঝলাম, খুরম আমাকে ভয় করে—শত্রু আবার রাজ্য পেয়েছে—শক্তিশালী হয়েছে—শত্রুকে বাগে পেলেই তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করো। আমি অসি কোষমুক্ত করলাম। যুদ্ধ করে নিজেকে মুক্ত করলাম। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর চারদিক থেকে অশ্বারোহীরা আমাকে ঘিরে ধরল। রানী আমি যদি তোমার মতো মন্ত্রসিদ্ধ হতাম তো সেদিন অগ্নি উৎপাদন করে নিজেকে মুক্ত করতে পারতাম। বন্দী হয়ে কয়েদখানায় গিয়ে যখন প্রথম প্রায় অন্ধকারে একটি কঙ্কালকে চলতে দেখলাম এবং বলতে শুনলাম, আমার চোখ দুটো কোথায়? কুকুরকে খাইয়ে দিয়েছ! আসফ খাঁ কি ভারতের রাজা? তার হাতের পুতুল শাহজাহান? আমি আমার বাপের রাজ্যে বাস করি। আমার ভাল বিছানা কই, খাবার কই, মশারা কই, জামা-কাপড় কই? আমি নামাজ পড়ব, আমার পীরহান, আচকান নিয়ে এসো। আমাকে গোলাপপানি দিয়ে গোসল করাও। আমাকে মসজিদের মধ্যে থাকতে দাও। আমি রাজ্য চাই না। মদ আর মেয়েমানুষ চাই না। শুধু আল্লার কাছে মোনাজাত

করতে চাই। 'আমি কি রাজ্য-ঐশ্বর্য চেয়েছিলাম? আমার চোখ কোথায়? চোখ এনে দাও...'

বেদৌরা ফরিদের মুখটা চেপে ধরল। আর বলতে দিল না। তার মর্ম ভেদ করল। বলল, 'থাক রাজা, আর বোলো না, আমি শুনতে পারছি না।'

'তাই দুঃখ হয় পারভেজের কথা ভাবলে। সেও তো এক রাজার ছেলে। আজ আমার হুকুমে কারাগারে পড়ে আছে। এই, কই হ্যায়?'

খাস দেহরক্ষী ছুটে এলো, কুর্নিশ জানাল।

ফরিদ বলল, 'যুবরাজ শাহ পারভেজকে ইরাক থেকে সসম্মানে নিয়ে আসতে হুকুম দিলাম।'

'জী আজ্ঞে জঁাহাপনা।'

'এই, তুমি তাকে নিয়ে কি করবে? হঠাৎ খেয়ালী হয়ো না।' বলল বেদৌরা তটস্থ হয়ে।

ফরিদ বলল, 'ঘুম পাচ্ছে রানী। এসো তোমার বুকের ওপর মাথা রেখে আমি ঘুমাই। একা শুতে যেতে এখন ভয় করছে। হঠাৎ এই প্রাসাদের থামগুলো যদি জীবন্ত হয়ে তলোয়ার ধরে? তুমি যদি না জাগ্রত থাকতে তাহলে আমার প্রিয়তমা শ্যালিকার হাতেই হয়তো নিহত হতাম। তুমি জেগে থাকো, ঘুমিও না।'

ফরিদ বেদৌরার নরম বুকের ওপরে মাথা রেখে চোখ বুজল। বেদৌরা তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে গান গাইতে লাগল। ফরিদ সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল অল্পক্ষণের মধ্যে। মধুর সুরে অন্তঃপুরে বেহালা বাজছিল তখন মৃদুমন্দ গতিতে। বেদৌরাও ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

বিকেলে মারুফ হাসানকে নওশা বেশে সাজানো হল। আনন্দ-উৎসবে রাজধানী-নগর মতোয়ারা হল।

শিরিনকে বধূবেশে ফুলের গহনায় অপূর্ব দেখাচ্ছিল। হাজার হাজার দর্শক। নাচ-গান হচ্ছে। বাজনা বাজছে।

সহসা সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেল।

শাহ পারভেজকে বন্দী অবস্থায় আনা হয়েছে। তার কোমরে শিকল বাঁধা, যদিও সে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। শিকলের দু'প্রান্ত দুজন ঘোড়-সওয়ারের হাতে—আর সামনে পিছনে দুজন সৈনিক পারভেজের গলায় পরানো ফাঁস ধরে আছে।

সহসা পারভেজ ঘোড়ার পিঠে উঠে দাঁড়িয়ে তার গলার ফাঁস মাথা গলিয়ে টেনে খুলে ফেলল আর কোমরের শিকল ঝোনা মেরে ছিনিয়ে নিল। কোমরে একটা জড়িয়ে ফেলল আর একটা লম্বা শিকল ঘুরিয়ে সে দুচারজন সৈন্যকে আহত করল। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তলোয়ার কেড়ে নিয়ে সামনে যাকে পেল তার মুণ্ডু উড়িয়ে দিয়ে প্রাসাদের বাগান পার হয়ে বাজারের পথে ছুটল। পাগলা ঘণ্টি বাজতে লাগল চারদিকে থেকে। সৈন্যরা ছুটেছে তার পিছনে। একটা সেতুর ওপরে দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ পারভেজ সৈন্যদের মাথা টপকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কেলেঙ্কারী কাণ্ড! হুড়োহুড়িতে গাড়িঘোড়া উল্টে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে—মানুষ পালাচ্ছে, ছুটোছুটি করছে। বোনের বিয়ের দিন, আচ্ছা আমোদ জুড়েছে তো পাগলা রাজকুমার!

অবশেষে জালের ফাঁদে বন্দী হল পারভেজ। তাকে টেনে আনা হল ফরিদের সামনে। আহত পারভেজের শরীর থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

ফরিদ বলল, 'কি ব্যাপার, একাই একশো যে!'

'আমার রাজ্য আমাকে ফিরে দাও। তুমি কে? বিদেশী মোগল ভারতে ফিরে যাও!'

ফরিদ বলল, 'তাহলে আমার রাজ্য ইরাক আক্রমণ করতে গিয়েছিলে কেন?'

'তুমি না শাহজাহানের হাতে হাত মিলিয়েছিলে?'

'তাতে কি, সে তো আমার ভাই!'

'তোমার চিরকালের শত্রু। কান্দাহার ফিরিয়ে দেবে তোমাকে?'

'সেটা আমাদের ব্যাপার—তার কাছে থাকলেও যা, আমার কাছে থাকলেও তা। আসলে সমগ্র ইরাক, পারস্য, কান্দাহার, ভারতবর্ষ মোগলসাম্রাজ্য এখন। যাকগে, তুমি এখন কি চাও বলো। দুটি জিনিস তুমি পেতে পারো। একটি রাজ্যলোভ ত্যাগ করে ধর্মপরায়ণ হয়ে মসজিদের অভ্যন্তরে পাঁচ বছর নজরবন্দী থাকা, অন্যটি অন্ধকারপ্রায় কক্ষে সুরাপানসহ আজীবন কারাবাস।'

পারভেজ সহসা লাফ দিয়ে পড়ল ফরিদের ওপরে। ফরিদ চকিতে নিজেকে সামলে নিয়ে টেনে গোটা দুই ঘুষি চালিয়ে দিল পারভেজের মুখের ওপরে। বলল, 'এটাকে কারাগারে নিক্ষেপ করো। এ নিজেই নিজের ভাল চায় না।'

পারভেজ শক্ত বাঁধুনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ফরিদ, এই আমার পাপের শাস্তি! সারার গর্ভপাত করে দিয়েছিলাম পদাঘাত করে। তাকে তুমি কেটে ফেলেছ বেশ করেছ। আমি অন্ধকার কারাগারেই থাকব—আমাকে মদ দিও—আর সদয় হলে যুবতী নারী দিও। আমি ধর্ম মানি না। এতো পাপাচার করেছি যে ধর্ম মানলে আমার অনেক ভয়, পরিত্রাণ নেই। তোমরা জানো না, আমি সারাকে এক হাবসীর দ্বারা অত্যাচার করাতাম, এক চাষীর বউকে নষ্ট করার অপরাধে মার খাবার পরে সেই চাষীদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, শিশুপুত্রদের নিজের হাতে আছড়ে মেরেছিলাম, সেসব জানো তুমি?'

'নিয়ে যাও একে।' ফরিদ জোর গলায় হুকুম দিতেই সৈন্যরা পারভেজকে টানতে টানতে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করল কিন্তু সেই সময় বিয়ের কনের বেশ নিয়ে তার বোন শিরিন এসে ফরিদের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, 'জাঁহাপনা, ওকে মুক্তি দিন। ওর সব অপরাধ ক্ষমা করুন।'

ফরিদ শিরিনকে হাত ধরে টেনে তুলল।

শিরিনের ঠোঁট দুটো কাঁপছে। চোখের পাতা উপচে জল নামছে।

মারুফ হাসান হঠাৎ বলে উঠল, 'না জাঁহাপনা—অসম্ভব! পারভেজের মুক্তি অসম্ভব।'

ফারদ চুপ করে ভাবতে লাগল। বেদৌরা বলল, 'পারভেজের বাঁধন খুলে দাও। আর তার দুটো হাত কেটে দাও। এবং এতে যদি শিরিন অশ্রুপাত করে আর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়, তবে তাকেও কারাকক্ষে নিক্ষেপ করো।'

ফরিদ বেদৌরার দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হল এবং হাত তুলে সমর্থন করে উঠে ভেতরে চলে গেল।

পারভেজের বাঁধন খুলে ফেলা হল।

সে তখন বিহ্বল! এ আবার কি কাণ্ড!

বেদৌরা বলল, 'দোওয়া করো যুবরাজ আজ শিরিনের সাদী হচ্ছে সেনাপতি মারুফ হাসানের সঙ্গে।'

পাবভেজ শিরিনের মাথায় হঠাৎ চপেটাঘাত করল, বলল, 'গোল্লায় যা! তুই যদি ভাই হতিস তবু আশা ছিল।'

সান্ত্রীরা টেনে নিয়ে গেল পারভেজকে।

রাজা ফরিদের অনুমতি নিয়ে জল্লাদ পারভেজের হাত দু'খানা কেটে নিল।

মারুফ হাসানের সঙ্গে শিরিনের বিয়ে হয়ে গেল।

শিরিন কান্না চেপে রাখল তার বুকের মধ্যে, এমন আনন্দের দিনে তার ভাইকে বাহুশূন্য করে দেওয়া হল, হায় তার দুর্ভাগ্য!

ফুলশয্যার আসরে বেদৌরা কাছে যেতেই তার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল শিরিন। বেদৌরা মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সান্ত্বনা দিতে লাগল, 'জীবন বড় কঠিন আর জটিল শিরিন। শান্ত হও। সৎপথে চললে আল্লা নিশ্চয় বাঁচাবেন। পারভেজকে আমি ভাই বলেছিলাম অথচ যখন তার কঠিন অপরাধের কথা শুনলাম তার নিজের মুখেই, এছাড়া আর পথ ছিল না। তবু সে বেঁচে থাক, রাজকীয় খানাপিনা পাবে। যদি এরপরও সৎ নাহয় তবে পা দুটোও হারাবে।'

শিরিন পায়ে সালাম করে উঠে দাঁড়াল। বেদৌরা তার নিজের গলার হার খুলে পরিয়ে দিল।

মারুফ হাসানও বেদৌরার পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করল।

বেদৌরা হেসে স্নেহভরে তার মাথায় হাত বুলোল।

রাত্রে একাকী বসে ছবি আঁকছিল ফরিদ। তুলি নিয়ে বেদৌরার কপালে একটা লাল লম্বা টিপ এঁকে দিল। বলল, 'আঁকতে চেয়েছিলাম তুমি আক্রান্ত সৈন্যদের ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছ! সেই ছবি বহুকাল থাকবে—লোকে জানবে সাধ্বী বেদৌরার কথা।'

'আঁকলে না কেন?'

'অনেক কথা ভাবলাম, হয়তো তোমার অনুশোচনা হবে। হায়, কি শক্তি তুমি হারিয়েছ! আবার মনে হয়েছে তোমার পর্বততুল্য শরীর হওয়া চাই। তা করলে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সেই নারীকে মনে হবে হয়তো বা রাক্ষসী, যাদুকরী। কিন্তু তুমি যেমন কঠিন কঠোর তেমনি আবার পুষ্প-কোমল, এই মূর্তি বেশ!'

ফরিদকে তুলে নিয়ে এলো বেদৌরা। প্রাসাদের ছাদের ওপর জ্যোৎস্না-রাতে দুজনে হাতে হাত রেখে বসে রইল। রাতের হিমানী গলে গলে নামছে আসমান থেকে। মাথার ওপরে চাঁদ। ফরিদ গান গাইতে শুরু করল। বেদৌরাও তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

কুড়ি বছর পর।

পারস্যের সুলতান ফরিদ আর সম্রাজ্ঞী বেদৌরা তখন প্রায় প্রৌঢ় হয়ে গেছেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান যুবরাজ ফারুক একদিন এক বৃদ্ধকে হাত ধরে কাছে আনল আর বলল, 'এই বৃদ্ধ বলছেন, ইনি নাকি আপনাকে চেনেন, ভারত থেকে আসছেন। বাদশা শাহ-জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব বাদশা হয়ে তাঁর পিতাকে বন্দী করেছেন, বড়ভাই দারাকে নিহত করেছেন। বৃদ্ধ বাদশা এখন শোকে অধীর, আর জানেন আব্বাজান, পৃথিবীর মধ্যে নাকি শ্রেষ্ঠ এক

সমাধি তৈরি করেছেন বাদশা শাহজাহান তাঁর পরলোকগতা সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগমের—যার নাম তাজমহল।'

বাদশা ফরিদ দেখলেন, যে বৃদ্ধকে যুবরাজ ফারুক হাত ধরে এনেছে তিনি অতিশয় অথর্ব, নিজের গায়ের উত্তরীয় খুলে বিছিয়ে দিয়ে বাদশা ফরিদ তাঁকে বসতে অনুরোধ করলেন।

বৃদ্ধ বললেন, 'ফরিদ আমাকে চিনতে পারছ না? চোখে রাজনীতির মায়াজাল পড়েছে! এবার যে তোমাদের স্বামীস্ত্রীকে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মক্কায় চলে যেতে হবে; আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।'

'হুজুর ক্ষমা করবেন, আমি চিনতে পারিনি। বেদৌরা, ফারুক এসো, সবাই আমরা এই জ্ঞানবৃদ্ধ দরবেশ পীরচেঙ্গির কদমবুসি করি।'

পীরচেঙ্গি বললেন, 'থাক থাক, আল্লা তোমাদের মঙ্গল করুন। ইরাক আর পারশ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে। রাজা ফরিদের খুব নাম হয়েছে প্রজাপালক, সুবিচারক বলে কিন্তু আজই এই সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে কোনো আকাজ্ক্ষা না রেখে। যুবরাজ ফারুক রাজা হবে আজ থেকে।'

বাদশা ফরিদ অবনত মস্তকে বললেন, 'হুজুর আমার ভার লাঘব করবার পরোয়ানা এনে মুক্তি দিলেন। এই রাজমুকুট আর রাজদণ্ড আপনার হাতে তুলে দিলাম। আপনি রাজকুমারকে তা দান করে ধন্য করুন।'

বৃদ্ধ পীরচেঙ্গি রাজমুকুট নিয়ে যুবরাজের মাথায় পরিয়ে দিলেন। রাজদণ্ড দিলেন হাতে।

আনন্দধ্বনি উঠল, 'বাদশা ফারুকের জয়।'

সিংহাসনে বসল ফারুক। চমৎকার সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

সভাসদরা হেঁট মাথায় বসে আছেন।

পীরচেঙ্গি বললেন, 'আর দেরি নয় ফরিদ, এসো বেদৌরা—কোনো কিছুই নিতে পারবে না। রাজপোষাক খুলে ফেলো।'

ফরিদ আর বেদৌরা পরস্পরের দিকে তাকালেন। তাকালেন প্রাসাদের সমস্ত দামী দামী আসবাবপত্রের দিকে।

ফরিদের চোখে জল দেখে বেদৌরা মৃদু হাসলেন, ঠোঁট দুটো তাঁর কাঁপল একটু, অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই সাদা পোষাক পরো, সব মায়া ত্যাগ করে চলো আমরা দুজনে মক্কায় চলে যাই।'

'চলো বেদৌরা, আমাদের যৌবন গেছে, আকাঙ্খা গেছে, এখন মক্কায় গিয়ে একটা হোজরা নিয়ে আল্লার আরাধনা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই।'

দুজনে সাধকবেশে বেরিয়ে এলে পীরচেঙ্গি তাঁদের দুজনের একবার হাত ধরলেন। তারপর চলতে লাগলেন।

রাজা ফারুক সৈন্যসামন্ত নিয়ে সামান্ত এলাকা পর্যন্ত এগিয়ে গেল তাঁদের পিছনে পিছনে। সে কাঁদছে। তার মা বাবা তাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন চিরকালের জন্য। পদব্রজে তাঁরা মক্কায় যাবেন—একটি কপর্দক পর্যন্ত সঙ্গে নেবেন না। কত মরুভূমি, কত পর্বত, অরণ্য পাড়ি দিতে হবে! কত তেষ্টা পাবে! হায়, কি হবে তাঁদের!

কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি মারুফ হাসান বললেন, 'ভয় কি রাজা, পীরচেঙ্গি যাঁদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন তাঁদের যে বড় সৌভাগ্য! তিনি সঙ্গে থাকলে কোনো কষ্ট হবে না। মেঘ ছায়া করবে, মরুভূমির বালুরাশি পুষ্পকোমল হবে, পর্বত মাথা নিচু করবে, সাগর পথ করে দেবে।'

বহুদূরে তিনজন মানুষের চেহারা দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেলে রাজা ফারুক চোখ মুছে ঘোড়ায় উঠে মুখ ফেরালো। হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার ফিরে চলল পারস্যের রাজধানীর দিকে।

———